কাসাসুল কুরআন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আল্লামা হিফযুর রহমান সেওহারবী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কাসাসুল কুরআন

(দ্বিতীয় খণ্ড)

আল্লামা হিফযুর রহমান সেওহারবী

মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কাসাসুল কুরআন (দ্বিতীয় খণ্ড)
মূল ঃ আল্লামা হিফযুর রহমান সেওহারবী
অনু ঃ মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২২৩
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৪৮
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭,১২২৫
ISBN : 984-06-0744-8

প্রকাশকাল
আশ্বিন ১৪১০
শা'বান ১৪২৪
অক্টোবর ২০০৩

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কম্পিউটার কম্পোজ
চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১ ডি আই টি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা

মুদ্রণে ও বাঁধাইয়ে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৫৩.০০ (তেপ্পান্ন) টাকা মাত্র

QSASUL QURAN (Quranic Stories), written by Allama Hifzur Rahman Sheoharby, Translated by Moulana Shamsul Alam Khan into Bengali and Published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. October-2003
Price : Tk. 53.00 Only U. S. Dollar 2.00

মহাপরিচালকের কথা

পবিত্র কুরআন একটি অনবদ্য কিতাব, আল্লাহ্‌র কালাম। এতে যেমন রয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, তেমনি রয়েছে পারলৌকিক বিষয়াবলীও। যেমন রয়েছে বিজ্ঞান-দর্শন, তেমনি রয়েছে আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ। মানব জীবনের যাবতীয় দিক-নির্দেশনা, হুকুম-আহ্‌কাম যেমন এতে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনি বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নবী-রাসূলগণের কথাও। বর্ণিত হয়েছে তাঁদের কর্মমুখর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী এবং সেই সাথে সে নবী-রাসূলগণের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতি-গোষ্টির কৃত আচরণও। প্রত্যেক নবী-রাসূলের আহ্বানে যেমন কিছু সংক্যক লোক তাওহীদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন, তেমনি কোন কোন সম্প্রদায় তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রাসূলগণের সাথে করেছে অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণ; এমনকি কোন কোন সম্প্রদায় তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রাসূলকে হত্যা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এ নবী-রাসূলগণের জীবন ও কর্ম নিয়ে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও উর্দূ সাহিত্যিক আল্লামা হিফযুর রহমান সিউহারবী চার খণ্ডে সমাপ্ত একটি তত্ত্ব ও তথ্যবহুল পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকমহলের জন্য এটি বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পুস্তকটির প্রথম ও চতুর্থ খণ্ড ইতোপূর্বেই প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে বিলম্ব হওয়ায় বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হলো। এর তৃতীয় খণ্ডটিও শীঘ্রই ইনশা আল্লাহ্ প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এ খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান। মোট তেরজন নবী-রাসূলের জীবন-কাহিনী এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

কাসাসুল কুরআনের অপর দু'টি খণ্ডের মত এ খণ্ডটিও সুধী পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আল্লাহ্ আমাদের নেক প্রচেষ্টায় সহায় হোন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

যুগে যুগে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম এবং তাঁর যেসব গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, এর বিবরণী পবিত্র কুরআন মজীদে রয়েছে। তাওহীদের বাণী নিয়ে যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে কুফর-শিরক পরিত্যাগ করে এক আল্লাহ্তে ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যায়-অনাচার পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট আদম সন্তানদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন। প্রতিটি যুগেই কিছু কিছু লোক ঈমান আনলেও আল্লাহ প্রেরিত এ রাসূলগণের বিরোধিতাকারীও কোন যুগেই কম ছিল না। তারা মাসূম এ নবী-রাসূলগণের সাথে দুশমনি করেছে তাঁদের কষ্ট দিয়েছে, এমনকি কোন কোন নবীকে সমকালীন নাফরমানেরা হত্যা পর্যন্ত করেছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এ মহান নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টার বিবরণ তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট উর্দূ লেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা হিফযুর রহামান সিউহারবী তাঁর 'কাসাসুল কুরআন' শীর্ষক পুস্তকে। পুস্তকটি মোট চার খণ্ড। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের উদ্যোগে নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনী ও কর্ম বিষয়ক এ পুস্তকটি বাংলা ভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে পুস্তকটির প্রথম ও চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে বিলম্ব হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্প্রতি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তৃতীয় খণ্ডটিও শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।

কাসাসুল কুরআন দ্বিতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল আলম খান, সম্পাদনা করেছেন সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন এবং প্রুফ দেখেছেন এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম। এবং এ পুস্তকটি প্রকাশনার সাথে জড়িত অন্যান্য সবাইকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বাংলা ভাষী সুধি পাঠকমহলে পুস্তকটি সমাদৃত হলে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ উদ্যোগ কবূল করুন।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

হযরত ইউশা ইব্‌ন নূন আলাইহিস্ সালাম

হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিনিধিত্ব

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বহুল জীবনে হযরত হারূন (আ.)-এর পর তাওরাত কিতাবে হযরত ইউশা (আ.) -এর আলোচনা এসেছে সব চাইতে বেশী। আমরা ইতিপূর্বে দু'তিন জায়গায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। হযরত মূসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় হযরত ইউশা (আ.) ছিলেন তাঁর খাদেম।

অতঃপর হযরত হারূন (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) -এর ওফাতের পর তিনি তাঁদের খলীফা ও নবুওয়াতের স্থলাভিসিক্ত হন। কেনান অঞ্চলের অত্যাচারী মুশরিক জাতিসমূহের অবস্থা জানার জন্য যে দলটি সেখানে গিয়েছিল হযরত ইউশা (আ.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলের সেই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান ও প্রেরণা জাগ্রত করেছিলেন, আর তারা প্রত্যাখান করেছিল; তখন ইউশা'ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বনী ইসরাঈলকে সাহস ও উদ্দীপনা প্রদানের ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য আসার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। আর তিনি দৃঢ়চিত্তে বলেন, "তোমরা যদি জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও, তাহলে বিজয় তোমাদের জন্য অবধারিত"।

তাওরাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর জীবদ্দশায় একথা প্রকাশ করেছিলেন যে, "ইউশা আমার বিশিষ্ট শিষ্য (অনুচর) এবং তাঁরই নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের যুবকগণ কেনান ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে অত্যাচারী মুশরিকদের কবল থেকে পবিত্র করবেন।"

গণনা পুস্তকে আছে ঃ "সদাপ্রভু মূসাকে বললেন, নূনের পুত্র যিহোশূয় (ইউশা) আত্মবিষ্ট লোক, তুমি তাঁকে নিয়ে তাঁর মস্তকে হস্তার্পণ কর এবং ইলিয়াসের যাজকের ও সমস্ত জনমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁকে উপস্থিত করে তাদের

সাক্ষাতে তাঁকে উপদেশ দাও। আর তাঁকে তোমার সম্মানের ভাগী কর যেন ইসরাঈল সন্তানদের সমস্ত জনমণ্ডলী তাঁর আজ্ঞাবহ হয়" (২৭ ঃ ১৯-২০)

ইস্তিস্নাতে (দ্বিতীয় বিবরণে) আছে ঃ "আর নূনের পুত্র যিহোশূয় (ইউশা) বিজ্ঞতার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন। কারণ মোশি (মূসা আ.) তাঁর উপরে হস্তার্পণ করেছিলেন আর ইসরাঈল সন্তানগণ তাঁর কথায় মনোযোগ করে মোশির (মূসা) প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম করতে লাগল"। (৩৪ অনুচ্ছেদ ঃ ৯ শ্লোক)

সুতরাং হযরত মূসা (আ.)-এর পরে তাঁরই নেতৃত্বে চল্লিশ বছর পর বনী ইসরাঈল বংশ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেন এবং (তারা) কেনান সিরিয়া ও পূর্ব জর্দান থেকে সমস্ত অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শক্তিকে পদদলিত করে দিলেন।

কুরআন শরীফে হযরত ইউশা (আ.)-এর বর্ণনা

কুরআন শরীফে হযরত ইউশা (আ.)-এর নামের উল্লেখ নেই; তবে সূরা কাহ্ফের দুই জায়গায় হযরত মূসা (আ.)-এর সফরসঙ্গী যুবকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়টি হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাতের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত এরূপঃ

وَاِذْقَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ

"আর যখন মূসা তাঁর (সাথী) যুবককে বললেন"। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৬০)

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا

"অতঃপর যখন তারা অতিক্রম করলেন তখন তিনি যুবককে বললেন, আমাদের নাশ্তা নিয়ে এস"। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৬২)

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত কুরআন উল্লেখিত উক্ত সাথী যুবকের নাম ইউশা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, যেন কুরআন মজীদেই তাঁর সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান। আহলে কিতাবগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে তিনি নবী ছিলেন। আর তাওরাত কিতাবে ওল্ড টেষ্টামেন্টের যিহোশূয়ের (ইউশা) পুস্তকও স্বতন্ত্র সহীফার মর্যাদা রাখে।

বংশ তালিকা

হযরত ইউশা (আ.) বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বংশধরদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ তাঁর বংশ তালিকা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ইউশা ইবন নূন, ইবন ফারাহিম, ইবন ইউসুফ, ইবন ইয়াকূব, ইবন ইসহাক, ইবন ইবরাহীম (আ.)।

এটা আল্লাহ্ তা'আলার অলৌকিক ক্ষমতার একটি বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাধ্যমে কিনানের সর্বাপেক্ষা অভিজাত বংশ সম্মান ও মর্যাদা এবং শান-শওকতের সাথে সেখান থেকে হিজরত করে মিসরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আর এখন তাঁরই প্রপৌত্র হযরত ইউশা (আ.)-এর নেতৃত্বে সে খান্দানের লক্ষাধিক মানুষ পুনরায় তাদের পিতৃপুরুষদের ভূমি কিনানে সাড়ম্বরে প্রবেশ করছেন। এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, "চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউশা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের এই কাফেলা সাথে নিয়ে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত এলাকার দিকে অগ্রসর হও। আর সেখানকার আ'মালিকা ও অন্যান্য অত্যাচারী জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত কর। আমার গায়েবী মদদ তোমাদের সাথে থাকবে"।

তাওরাতে বর্ণিত আছে ঃ "সদাপ্রভুর দাস মোশির (মূসা আ.) মৃত্যু হলে পর সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় (ইউশা) নামে মোশির খাদেমকে বললেন, আমার দাস মোশির (মূসার) মৃত্যু হয়েছে, এখন উঠ, তুমি এ সমস্ত লোক নিয়ে এ জর্ডান নদী পার হও এবং তাদের অর্থাৎ ইসরাঈল সন্তানদের আমি যে দেশ দিতেছি, সে দেশে যাত্রা কর। যে সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করবে, আমি মোশিকে যেমন বলেছিলাম, তদনুসারে সে সকল স্থান তোমাদের দিয়েছি। প্রান্তর ও লেবানন থেকে মহানদী ফোরাত পর্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ এবং সূর্যের অস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের সীমা হবে। তোমার সমস্ত জীবনকালে কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমি যেমন মোশির সহবর্তী ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহবর্তী থাকব। আমি তোমাকে ছাড়ব না তোমাকে ত্যাগও করব না " (৫ ঃ ১)। (যিহোশূয়ের ইউশা পুস্তক, অনুচ্ছেদ ৫ ঃ ১)

পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ

অনন্তর হযরত ইউশা (আ.) বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্‌র তা'আলার বাণী শুনালেন। আর তারা সিনাই উপত্যকা থেকে বের হয়ে কিনানের প্রথম শহর আরীহার দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তারা শত্রুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুললেন। শত্রুরাও বেরিয়ে এসে শক্তিমত্তার সাথে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলল; কিন্তু পরিশেষে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো এবং সেখানেই ধ্বংস হলো। আর বনী ইসরাঈল লাভ করলো মহাবিজয় ও আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য। আর এভাবেই হযরত ইউশা (আ.) ও বনী ইসরাঈল ধীরে ধীরে লড়াই করতে করতে গোটা পবিত্রভূমি দখল করতে সক্ষম হলো। অতঃপর অত্যাচারী মুশরিকদের হাত থেকে সে ভূমি পবিত্র করার পর পুনরায় তারা

পিতৃভূমির শাসন ক্ষমতার অধিকারী হলো। তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে, বনী ইসরাঈল যখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে প্রতিশ্রুত সিন্দুক (তাবূতে সাকীনা) তাদের সাথেই ছিল। এই সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল হযরত মূসা (আ.)-র লাঠি, হযরত হারূন (আ.) এর জামা এবং মান্না ও সালওয়া ভরা বাটি। তাছাড়া অন্যান্য বরকতময় পবিত্র বস্তুও তাতে ছিল। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (মূসা ও হারুন)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা মান্না ও সালওয়া সংরক্ষণ করে রাখো, যাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও তা প্রত্যক্ষ করতে পারে যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কত অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল।

ইব্‌ন আসীর (র) বলেন যে, হযরত মূসা (আ) তাঁর জীবনকালেই পবিত্রভূমিতে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত ইউশা (আ)কে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেছিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের সিপাহসালারদের নামও উল্লেখ করেছিলেন। কাজেই হযরত মূসা (আ)-এর সেনাপতি হিসেবে ইউশা (আ)-এর নিয়োগ লাভের ব্যাপারটি ছিল হুবহু হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)-এর নিয়োগের অনুরূপ। কেননা নবী করীম (সা) তাঁর জীবনকালেই সিরিয়া অভিযানের জন্যে হযরত উসামা (রা) কে সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র হাতেই সেই অভিযানের পতাকা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী যুদ্ধের ময়দানে রওনা হবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন) অতঃপর হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে উসামার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীকে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করা হয়। অবশেষে এ গুরুত্বপূর্ণ অভিযানই রোম, ইরান ও ইরাক বিজয়ের অগ্রণী হিসেবে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.) পবিত্র ভূমিতে সেচ্ছাচারী শাসকদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইউশা (আ.) কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও কৌশল তিনি নিজেই সম্পন্ন করেন। কিন্তু সেনাবাহিনী গন্তব্যে রওনা হওয়ার পূর্বেই তিনি জান্নাতবাসী হন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউশা (আ.) কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেন। পরিশেষে তাঁরই মাধ্যমে মুশরিক ও সেচ্ছাচারী শাসকদের করাল গ্রাস থেকে পবিত্র ভূমি মুক্ত হয়। আর আরীহার সফল বিজয় অভিযানই সমস্ত পবিত্র ভূমি বিজয়ের অগ্রণী হিসেবে পরিগণিত হয়।

হযরত ইউশা (আ.) সর্বপ্রথম কোন শহর জয় করেছিলেন– কুরআন মজীদে অবশ্য তার নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং قرية (জনপদ) শব্দটি ব্যবহার করে বিষয়টি অস্পষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে। কেননা উক্ত ঘটনা বিবৃত করার মধ্যে যে তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যে নিহিত ছিল জনপদের নাম নির্দিষ্ট করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কথা হলো এই যে, হযরত ইউশা (আ.) কর্তৃক সর্বপ্রথম বিজিত শহর ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস যা জেরুযালেমে অবস্থিত। আরীহা সম্পর্কিত তথ্যটি এজন্যে সঠিক নয় যে, এই শহরটি বনী ইসরাঈলের অভিযানের রাস্তায় অবস্থিত ছিল না তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে এ শহর সম্পর্কে কোন ওয়াদা করেন নাই, বরং বায়তুল মুকাদ্দাস সম্বন্ধে ওয়াদা দিয়েছিলেন।

তবে আমাদের কাছে ইব্‌ন কাসীর (র.) কর্তৃক বর্ণিত জনপদটি বায়তুল মুকাদ্দাস বলে ধরে নেওয়া সঠিক। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে যেসব দলীল পেশ করেছেন তা সঠিক নয়। কারণ বাস্তবিকপক্ষে এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, বনী ইসরাঈল সিনাই প্রান্তর থেকে সোজাপথ ধরে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে অভিযাত্রা করে থাকলে স্থলপথে কিনান অঞ্চলই প্রথমে তাদের সামনে পড়ত আর আরীহা হলো সেই দেশের শহর। মানচিত্র সামনে রেখে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যাবে যে, সে যুগে কেউ যদি সিনাই প্রান্তর পেরিয়ে স্থলপথে জেরুযালেম যেতে ইচ্ছা করত তাহলে একমাত্র কিনানের রাস্তা দিয়েই তাকে যেতে হতো। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তো বনী ইসরাঈলকে এই ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের ভূমিতে ফিরিয়ে নেবেন। আর একথা তো স্পষ্ট যে তাদের পূর্বপুরুষদের স্বদেশ বলতে শুধু বায়তুল মুকাদ্দাসই ছিল না, বরং কিনানও ছিল তাদের পিতৃভূমি। সেখান থেকেই তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমলে হিজরত করে মিসরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং ইব্‌ন কাসীর (র.) এর পেশকৃত দু'টি প্রমাণই দুর্বল এমনকি বাস্তব সত্যের বিপরীত। তবে তিনি 'কারইয়া' (জনপদ) শব্দের অর্থ যে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' করেছেন তা এজন্য সঠিক যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশেই হযরত ইউশা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সর্বপ্রথম 'আরীহা' জনপদে আমালিকা সম্প্রদায়কে পরাজিত করেন এবং তারপর কিনান দেশ জয় করেন। এরপর ফিলিস্তিন উপনীত হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন। যেহেতু এ স্থানটিই ছিল তাদের বিজয় অভিযানের কেন্দ্রভূমি এবং একমাত্র প্রধান লক্ষ্যস্থল, তাই যখন এ স্থানটিও দখলে এসে গেলো, ঠিক তখনি আল্লাহ্ তা'আলা পরম বিজয় মুহূর্তে তাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কুরআনুল করীমে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যকে উপেক্ষা করা

কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে যখন সফলতা দান করলেন এবং তারা বিজয়ী বেশে শহরে প্রবেশ করতে লাগল, তখন তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা অহংকারী ও দাম্ভিকদের ন্যায় প্রবেশ করো না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার শোকরগুযায় বান্দাদের ন্যায় অত্যন্ত বিনয়ী ও তাওবা ইস্তিগফার করতে করতে প্রবেশ করো। যাতে আল্লাহ্‌র শোকরগুযায় বান্দা ও ধোঁকাবাজ বিদ্রোহীদের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। কিন্তু সাহায্য ও বিজয় লাভের পর বনী ইসরাঈল আনন্দোল্লাসে মত্ত হয়ে এতই আত্মহারা হয়ে পড়ল যে, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করলো না। তারা স্বেচ্ছাচারী অহংকারী ও দাম্ভিকদের ন্যায় জনপদে প্রবেশ করলো। সদর্প পদক্ষেপে উদ্ধত শিরে ও বিলাসিতা দেখাতে দেখাতে নগরে প্রবেশ করলো। তাওবা-ইস্তিগফার ও বিনয়ের পরিবর্তে তারা হঠকারী ও ধৃষ্টতাপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করলো। আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি কৌতুক ও বিদ্রুপ করার জন্যেই যেন তারা এভাবে প্রবেশ করলো। অবশেষে মহান আল্লাহ্‌র মর্যাদাবোধে ক্রোধ সৃষ্টি হলো এবং কর্মফল প্রদানের চিরাচরিত নিয়ম মোতাবেক আল্লাহ্‌র আযাব তাদের পাকড়াও করলো।

কুরআন মজীদের দু'জায়গায় (সূরা বাকরা ও সূরা আ'রাফে) এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ - فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ -

"স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, এই জনপদে প্রবেশ কর যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দ্যে আহার কর, দ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল-ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবো এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করবো। কিন্তু যারা সীমালংঘন করেছিল, তারা তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বললো। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ তারা সত্য প্রত্যাখান করেছিল।" (সূরা বাকারা ঃ ৫৮-৫৯)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ- وَادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْلَكُمْ خَطِيْئٰتِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ- فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَالَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ -

"স্মরণ কর, যখন তাদের বলা হয়েছিল, এ জনপদে বাস কর ও যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল, ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর নতশিরে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো আর সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল, তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। সুতরাং আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম, যেহেতু তারা সীমালংঘন করেছিল।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬১-১৬২)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে حِطَّةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ কি? এছাড়া এ শব্দের পরিবর্তে বনী ইসরাঈল কোন্ শব্দ ব্যবহার করেছিল ? এ দু'টি প্রশ্ন আলোচনা সাপেক্ষে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, حِطَّةٌ এর অর্থ مَغْفِرَةٌ اِسْتَغْفِرْ। অর্থাৎ 'মার্জনা ও ক্ষমা ভিক্ষা কর'। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, حِطَّةٌ -এর অর্থ اَحْطُطْ عَنَّاخَطَايَانَا। অর্থাৎ, "আমাদের গোনাহসমূহ মিটিয়ে দাও"। এ দু'টো ব্যাখ্যারই মূলকথা হলো তোমরা এই দু'আ করে জনপদে প্রবেশ করো, "হে আল্লাহ্! আমাদের মার্জনা করো এবং গোনাহসমূহ মিটিয়ে দাও"। এই শব্দটি যেন একটি দীর্ঘ বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ।এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল بسمله - بالله এর لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ রূপ সংক্ষেপে حوقله এবং لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰه সংক্ষেপে هلله বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) বলেন, বনী ইসরাঈল حِطَّةٌ শব্দের পরিবর্তে حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ অর্থাৎ 'যবের দানা' বলতে শুরু করে। মোটকথা তোমরা এই বলে প্রবেশ করে যে "খোশার ভেতরে সংরক্ষিত শস্যদানা আমাদের প্রয়োজন।" এ রকম হঠকারীতা ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলে তারা যেন আল্লাহ্র নির্দেশের সাথে বিদ্রুপ করছিল। আর অবনত শিরে প্রবেশ করার পরিবর্তে তারা নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চলছিল। মোটকথা তারা يزحفون على استاهم অর্থাৎ 'পাজরের উপর ভর দিয়ে হেঁচড়িয়ে চলছিল'।

বুখারী শরীফে বর্ণিত এ বাক্যের অর্থ দ্বারা সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈল নিতম্বের ভর দিয়ে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলছিল। কিন্তু এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে অহমিকা ও দাম্ভিকতাপূর্ণভাবে চলার এরকম পদ্ধতি কোথাও প্রচলিত ছিল না, এমন কি তা বোধগম্য বা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া এভাবে তো নিজেকেই হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করা হয়, অন্যকে বিদ্রুপ করা বুঝা যায় না। সুতরাং, হাদীসের বর্ণিত বাক্যাংশের সঠিক ব্যাখ্যা উক্তিতে বিদ্যমান। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈল শহরে প্রবেশ করার সময় অবনত শিরে চলার পরিবর্তে সদম্ভ পদক্ষেপে, ঔদ্ধত্যপূর্ণ মস্তকে চলছিল অর্থাৎ যেভাবে কোন স্বৈরাচারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি সদর্পে উদ্ভটভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে এবং নিতম্ব দেশ হেলিয়ে দুলিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায় পথ চলে থাকে। বনী ইসরাঈলগণ ঠিক সেভাবেই নিতম্বকে উত্থিত ও আন্দোলিত করে প্রবেশ করছিল।

যাহোক আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতগুলোতে তাঁর সত্যবাদী বিনয়ী ও নিবেদিত প্রাণ বান্দা আর অহংকারী-দাম্ভিক মানুষের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। কেননা তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল ও বিনয়াবনত কোন ব্যক্তি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও উচ্চাকাঙক্ষা পূরণ করার জন্য কারো বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না, বরং তারা আল্লাহ্‌র শত্রু ও বিপযর্য় সৃষ্টিকারী সেচ্ছাচারীদের নিঃপীড়ন স্বৈরাচার ও দুষ্কৃতকারীকে সমূলে বিনাশ করার উদ্দেশ্যেই সংগ্রাম করে ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যাতে করে আদল ও ইনসাফ ভিত্তিক শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র বিধান সমুন্নত হয়। আর সে তো মনেপ্রাণে এ কথা বিশ্বাস করেই যুদ্ধ করে যে, اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ। "বিপর্যয় সৃষ্টি করা ও ফিতনা ফাসাদ ছড়ানো হত্যার চাইতেও মারাত্মক" । (সূরা বাকারা ঃ ১৯১) সুতরাং যখনই তারা কাফিরদের উপর বিজয় ও সাফল্য লাভ করে, তখন তারা অহমিকা ও দাম্ভিকতার সাথে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে না; বরং আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়ী ও নম্র হয়ে সিজ্‌দাবনত শিরে আনন্দ প্রকাশ করে। আর যখন তারা বিজিত অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন কৃতজ্ঞতা ভাজন মানুষের মতই প্রবেশ করে। সুতরাং মহানবী (সা.) মক্কা শরীফকে যখন মুশরিকদের কবল থেকে পবিত্র করলেন, তখন উপর দিক থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময় তাঁর নম্রতা ও বিনয় প্রকাশের অবস্থা এরূপ ছিল যে, উটনীর পিঠে বসে থেকেই মাথা এতই অবনত করেন যে, তাঁর দাড়ি মুবারক হাওদার গদি স্পর্শ করছিল। অতঃপর তিনি যখন হারাম শরীফে প্রবেশ করেন, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ে আট রাক্'আত 'সালাতুশ্ শোকর' আদায় করেন। সাহাবায়ে কিরামদের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ।

হযরত উমার (রা.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন এবং হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) ইরান জয় করেন, তখন এ দু'জন মহান বিজয়ী দাম্ভিক রাজাদের ন্যায় বিজিত অঞ্চলে প্রবেশ করেননি; বরং আল্লাহ্‌র প্রতি অতিশয় বিনয়ী, নিরহংকার ও একান্ত অনুগত বান্দাদের মতই প্রবেশ করেন। হযরত উমর (রা.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র চত্বরে এবং হযরত সা'দ (রা.) যখন পারস্যের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখন তাঁরা সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হয়ে শোকরানা নামায আদায় করেন এবং স্বীয় আমলের মাধ্যমে নিজেদের দাসত্ব, ইবাদত ও বিনয়ের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁরা যখন লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন, তখন সিংহ শার্দুলের মত বীরবিক্রমে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর যখন তাঁরা বিজয় ও সাফল্য লাভ করতেন তখন বিনয় ও কোমলতার সাথে আল্লাহ্‌র শোকের আদায় করতেন এবং আল্লাহ্‌র মাখলূকাতের জন্য দয়া ও করুণার বাস্তব প্রতীকরূপে প্রমাণিত হতেন।

মোটকথা বনী ইসরাঈলরা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ও আল্লাহ্‌র গযবের উপযুক্ত প্রমাণিত হলো। তাদের উপর পতিত শাস্তি কিরূপ ছিল এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বিস্তারিত কিছু বলা হয় নি। শুধু رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ "আকাশ হতে শাস্তি" নাযিলের কথা বলে অস্পষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

সূরা আ'রাফের উদ্ধৃত فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ "তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল, তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বললো"। আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায় যে, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতার এ রকম নিন্দিত ও ঘৃণিত কাজটি বনী ইসরাঈলের সমস্ত লোকের দ্বারা সংঘটিত হয় নি; বরং তাদের মধ্যে এমন একটি দলও বিদ্যমান ছিল যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের পূর্ণ আনুগত্য করেছিল এবং আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের ক্ষেত্রে হযরত ইউশা (আ)-এর সঙ্গীগণও ছিলেন।

উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়

১. হযরত ইউশা (আ) ও বনী-ইসরাঈলের এসব ঘটনার মধ্যে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় তা হলো এই, যখন কোন মানুষ কোন বিপদ থেকে নাজাত পায় অথবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, তখন তার মানবিক কর্তব্য হলো সে যেন কোনক্রমেই অহংকার ও দাম্ভিকতার বেড়াজালে আটকে গিয়ে এরূপ ধারণা না করে বসে যে, এ সাফল্য তো তার স্বকীয় যোগ্যতা ও সাধনার ফসল, বরং সে মুহূর্তে তার

উচিত মহান আল্লাহ্‌র প্রতি শোকর স্বরূপ সালাত আদায় করা এবং নিজের অপারগতা ও অক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করে তাঁরই সামনে অবনত শিরে ঝুঁকে পড়া। তাহলেই মহান আল্লাহ্ তাঁর রহমতের ছায়াতলে ও করুণার ছায়াতলে তাকে স্থান দেবেন। আর সে দুনিয়ার মত আখিরাতের ও সফলকাম হবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

২. কঠিন থেকে কঠিনতর নিরাশার পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌র রহ্‌মত থেকে মানুষের হতাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা সে যদি অত্যাচারিত ও নিঃপীড়িত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে সে বঞ্চিত হবে না যদিও কোন সূক্ষ্ম রহস্য ও অদৃশ্য কল্যাণের কারণে সে অনুগ্রহ দেরীতে লাভ করে।

৩. যে জাতির ওপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ ও নি'আমত দয়া ও করুণা প্রকাশ্য নিদর্শনের আকারে বর্ষিত হয়, সে জাতি যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে, তাহলে অনতিবিলম্বে সে আল্লাহ্‌র কঠিন পাকড়াও-এর শিকার হবে এবং ভয়ংকর শাস্তিতে পতিত হবে। কেননা সে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচারণ করেছে। ফলে সন্দেহাতীতভাবে সে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে।[১]

১ তারিখে ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২

হযরত হিযকীল আলাইহিস্ সালাম

ভূমিকা

হযরত মূসা (আ.)-এর পরবর্তী বনী ইসরাঈলী নবীদের পরস্পর ধারাবাহিকতা অনেক দীর্ঘ। যা হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। বহু শতাব্দীর এই দীর্ঘ সময়ে কতজন নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, তার সঠিক হিসাব একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। কুরআন শরীফে তাঁদের মাত্র কয়েকজনের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কারো বিবরণ আছে বিস্তারিতভাবে আর কারো সংক্ষিপ্তভাবে। কতজনের তো শুধু নামই উল্লেখ করা হয়েছে। তাওরাতে অবশ্য কুরআনে বর্ণিত তালিকাসূচির চাইতে আরো কিছু বেশী নবীর আলোচনা আছে, আছে তাঁদের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর বর্ণনা।

এসব ইসরাঈলী নবীগণের মাঝে ঐতিহাসিক ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। আমরা ইব্ন জারীর তাবারী (র) প্রমুখের বিন্যাসকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করি। সুতরাং তাঁর সাজানো বিন্যাস অনুসারেই আমরা নবীদের সম্পর্কে আলোচনা করব।

তাওরাত ও ইতিহাস এ বিষয়ে একমত যে, হযরত ইউশা (আ.) হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর পর নবুওয়াতী মিশনের দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁর পরে হযরত মূসা (আ.)-এর অপর এক সাথী কালেব ইব্ন ইউহান্না এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তিনি ছিলেন মূসা (আ.)-এর সহোদরা মরিয়ম বিন্ত ইমরানের স্বামী। তবে ইব্ন কাসীর (র.)-এর মতে নবী ছিলেন না।[১]

তাবারী (র.) বলেন, তাঁরপর যিনি বনী ইসরাঈলকে আধ্যাত্মিক ও দ্বীনি নেতৃত্ব ও হেদায়েত দানের দায়িত্ব পালন করেন তিনিই হযরত হিয্কীল (আ.)।

নাম, বংশ তালিকা ও নবুওয়াত

তাওরাতে আছে, তিনি (হিযকীল আ.) ছিলেন বুযী নামক গণকের ছেলে তাঁর নাম ছিল হিয্কী-ঈল। ইবরানী (ইয়াহূদীদের প্রাচীন ভাষা) ভাষায় আল্লাহ্র একটি নাম হল 'ঈল' আর হিযকী শব্দের অর্থ শক্তি বা সামর্থ্য। সুতরাং আরবী

১ তারীখে ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩

ভাষায় এই নামের সমন্বিত অনুবাদ হল 'আল্লাহ্র কুদ্রাত'। কথিত আছে যে, হযরত হিযকীল (আ.)-এর শৈশবকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন এবং যখন তাঁর নবুওয়াতের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাঁর মা ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধা ও দুর্বলা। এ জন্যেই ইসরাঈলী কিংবদন্তীতে তিনি 'ইবনুল আজুয' বা 'বৃদ্ধার ছেলে' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন।[১]

হযরত হিযকীল (আ.) দীর্ঘকাল ব্যাপী বনী ইসরাঈলের মাঝে সত্যের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালাতে থাকেন এবং তাঁদের মাঝে দীন-দুনিয়ার পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন।

কুরআন মজীদ ও হযরত হিযকীল (আ.)

কুরআন শরীফে হযরত হিযকীল (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয় নি, তবে সূরা বাকারাতে বর্ণিত একটি ঘটনা সম্পর্কে প্রাচীন আলিমগণ (সালফে সালিহীন) যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাতে বুঝা যায় যে, উক্ত ঘটনাটি ছিল হযরত হিযকীলের সাথেই সম্পৃক্ত।

তাফসীর গ্রন্থসমূহে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং আরো কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের বাদশাহ অথবা তাদের উপর প্রেরিত নবী হযরত হিযকীল (আ.) যখন তাদের মধ্যে বৃহৎ একটি দলকে বললেন, অমুক দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। আর আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার দায়িত্ব পালন করো। তখন তারা এরূপ বিশ্বাস করলো যে, এখনকার মত জিহাদ থেকে বিরত থাকতে পারলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কাজেই তারা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে দূরবর্তী একটি উপত্যকায় গিয়ে বসবাস শুরু করলো। অতঃপর হয় তাদের এই পালায়নকে নবী (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধিতা ও তাক্দীরের ফায়সালার পরিপন্থী কাজ মনে করে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের জন্য বদ্দু'আ করেছেন, অথবা স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে তাদের এই আচরণ অপসন্দ হয়েছে। যাহোক তাঁর গযবের কারণে তাদের উপর নেমে এলো মৃত্যুর আযাব; আর তারা সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। সপ্তাহ খানেক পর হযরত হিযকীল (আ.) সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের এই অবস্থা দেখে আফসোস করলেন এবং এই বলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন, 'হে রাব্বুল আলামীন! মৃত্যুর আযাব থেকে এদের নাজাত দিন, যাতে তাদের ফিরে পাওয়া জীবন তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়। নবী (আ.)-এর দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবূল হলো এবং তাদের জীবিত হয়ে উঠার ব্যাপারটি একটা উপদেশ ও শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হলো।

১ তাফ্সীরে ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০ তাফ্সীরে কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

তাফসীরে ইব্‌ন কাসীরে উল্লেখ আছে যে, বনী ইসরাঈলের এ দলটি 'দাদরোয়া' নামক উপত্যকার অধিবাসী ছিল। এ স্থানটি ওয়াসেত শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত সে যুগের একটি বিখ্যাত জনপদ ছিল। সেখান থেকে তারা পালিয়ে 'উনীহ' নামক উপত্যকায় যাওয়ার পর মৃত্যুর আযাব নাযিল হয়েছিল।

কুরআন মজীদে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে এ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ اِنَّ اللّٰه لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ - وَلٰكِنْ اَكْثَرَالنَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ -

"তুমি কি তাদের দেখ নাই যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল ? অতঃপর আল্লাহ্ তাদের বলেছিলে তোমাদের মৃত্যু হোক। তারপর আল্লাহ্ তাদের জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৩)

জিহাদ থেকে পলায়ন করা

ইসলামী শরী'আতে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা (আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করার পরই) কবীরা গোনাহ হিসেবে পরিগণিত। বাস্তবিকপক্ষে অবস্থাটাও এরূপ যে, মানুষ যখন ঈমান আনার পর তার জান-মাল আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দেয়- আর এই সমর্পণের নামই তো ইসলাম। তখন এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে নিজের প্রাণ বাঁচানোর চিন্তা করার অধিকারও সে রাখে না। ভীরুতা ও কাপুরুষতা ইসলামী আদর্শের সাথে একত্রিত হতে পারে না। আর সত্যের পথে টিকে থাকার জন্য বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলামের মহান বৈশিষ্ট্য। এ ভাবে মানুষের ধারণা-বিশ্বাস যখন দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়ে যে, ভালো-মন্দ, জীবন-মৃত্যু এসব কিছুই তো বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের আওতায় পরিচালিত, তখন ক্ষণিকের জন্যেও সে এরূপ কল্পণা করতে পারেনা যে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফায়সালার ব্যাপারে সে তাড়াহুড়া করবে এবং কোনো বাহানা সেই ফায়সালাকে পরিবর্তন করতে পারবে। এ ছাড়া এরূপ কল্পণাও সে করতে পারেনা যে, কোনো এক ব্যাপার আল্লাহ্‌র বিধান তাক্‌দীর প্রযোজ্য আর অন্যসব ব্যাপারে সে এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাক্‌দীরের দর্শন হচ্ছে এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করাটাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বিশ্বাস করবে।

যদিও সেই হুকুম পালনের মধ্যে প্রাণের ভয় কিংবা সম্পদ ধ্বংসের আশংকা থাকে, সে ব্যাপারে তার কোনো ইখতিয়ার নেই। যদি আল্লাহ্ তা'আলা সেই মুহূর্তে জান-মাল ধ্বংসের ফায়সালা করেই থাকেন, তাহলে এমন কারণের উদ্ভব ঘটবে, যাতে মহানিয়ন্তার সেই ফায়সালা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। এরূপ বিশ্বাসই মানুষকে বীর ও মহাপুরুষে পরিণত করে এবং ভীরতা ও কাপুরুষতা থেকে দূরে রাখে। তখন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় কর্তব্য পালন ও দায়িত্ববোধ। সে তখন পরম স্রষ্টার নির্ধারিত বিধান ও তাঁর ফায়সালাকে তার ক্ষমতার উর্ধ্বে মনে করে এবং নিজের ক্ষমতার প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়।

তাক্দীর বলতে ইসলামে কখনো এরূপ কথা বুঝানো হয়নি যে, হাত-পা গুটিয়ে চেষ্টা-সাধনা ও কর্মতৎপরতা পরিহার করে কেবল গায়বী সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকবে এবং সকল কর্তব্য পালন ও কর্মকাণ্ড পরিহার করবে। কেননা চিরাচরিত বিধানও অমোঘ ফায়সালা অনুযায়ী যা কিছু হওয়ার তা হবেই। মোটকথা এই ধারণা থেকেই ভীরুতা ও কাপুরুষতা জন্ম নেয়, যা মানুষের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রধান অন্তরায়। এ ভাবে উক্ত ধারণা কর্মহীন সহজ জীবনের দাওয়াত দিয়ে মানুষকে গ্লানিকর পরিস্থিতির মাঝে নিক্ষেপ করে।

বক্তব্যের সমর্থনে জিহাদের আয়াত

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এর পরেই জিহাদের আয়াত আসার কারণে বুঝা যায় যে, এটা উক্ত বক্তব্যের জোরালো সমর্থন। এতে মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলা হয়েছেঃ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ। "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৪)

যেহেতু জিহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রাণ নিয়ে খেলা ও আত্মোসর্গের দিকে আহ্বান করা এবং অন্তর থেকে মৃত্যুর ভয় দূর করা। এ জন্যে বনী ইসরাঈলের এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করা উপযোগী মনে করা হচ্ছে যে, জিহাদের ভয়ে পলায়নকারীদের উপর মৃত্যুর শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়েছিল। যাতে তারা যেন এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের অন্তরে বীরত্ব ও সাহসিকতার উৎসাহ সৃষ্টি হয় আর ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে তারা ঘৃণা করতে শিখে।

মৃতকে জীবিত করা

এ ঘটনার যাবতীয় বিবরণ জমহুর আলিমদের মতামতের ভিত্তিতেই লিখা হয়েছে। ইব্‌ন কাসীর (র.) বলেন, যে সব লোক কিয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষের সশরীরে একত্রিত (হাশর) হওয়ার বিষয়টিকে অবিশ্বাস করে তাদের উপদেশ

দেওয়ার জন্যই মৃতকে জীবিত করার নির্দশনটি সংঘটিত হয়েছে। কেননা বনী ইসরাঈলের ভেতর এমন একদল মুশরিক ছিল, যারা সশরীরে হাশ্‌র হওয়াকে অবিশ্বাস করত।

আমরা ইতিপূর্বে যদিও এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তবুও এ পর্যায়ে আরো কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করি। আধ্যাত্মবাদ বিশেষজ্ঞদের (Spiritualism) কাছে এটা একটা গবেষণালব্ধ বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, 'আত্মা' শরীর থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মৌলিক উপদানসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বিনাশ হয়ে গেলেও আত্মা জীবিত থাকে। অধিকন্তু এটা তো যুক্তিযুক্ত ও স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যিনি কোন বস্তুর সমন্বয় সাধন করেন- অতঃপর সেই সমন্বিত বস্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তিনি তা একত্রিত করতে পারেন। সুতরাং আত্মার জীবন ও বিচ্ছিন্ন অংশের পুনর্বার একত্রিত হওয়ার বিষয়টি যৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারটি অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। যা কোন কোন সময় বিশেষ পরিস্থিতির কারণে নবী-রাসূলদের সত্যবাদীতার প্রমাণ ও সমর্থনের জন্য এই ধরাধামে মু'জিযা হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর যেসব সুধী পাঠক প্রথম খণ্ডে বর্ণিত মু'জিযা সম্পর্কিত আলোচনা পাঠ করেছেন, তিনি তো অবশ্যই এ সংশয়ের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন যে, পার্থিব জগতের সাধারণ নিয়মানুযায়ী যদি ও পুনর্জীবন লাভ করা যায় না এবং কিয়ামতের দিন সশরীরে হাশ্‌র সংঘটিত হবে; কিন্তু তবু বিশেষ কোন কারণে কোন রহস্য ও কল্যাণের জন্য এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া যে সম্ভব, এটা শুধু যুক্তিযুক্তই নয় ; বরং বাস্তবেও এরূপ ঘটছে।

তবে জমহুর আলিমদের ভিন্ন মতপোষণকারী বিখ্যাত তাবিঈ মুফাস্‌সির ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, এই আয়াতগুলোতে যা কিছু বলা হয়েছে, সেটা তো একটা উপমা মাত্র। জিহাদের ভয়ে পলায়নকারীদের উপদেশ ও শিক্ষা প্রদানের জন্যেই এ উপমা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এমন কোন ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়নি, যা বনী ইসরাঈলের প্রাচীন ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমাদের কাছে জমহুর আলিমদের অভিমতই নির্ভুল। কেননা কুরআনের বাক্যবিন্যাস থেকে অবহিত হওয়া যায় যে, এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর তালাক সম্পর্কিত কিছু হুকুম বর্ণিত হয়েছে। এখানে জিহাদ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই নেই; তবে এর পরেই এসেছে জিহাদের আয়াত। সুতরাং জিহাদের এ আয়াতগুলো যদি শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত উপমা হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে অলংকার শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী প্রথমেই আসত জিহাদের নির্দেশ। অতঃপর জিহাদ থেকে আত্মগোপনকারীদের

জন্য উপমা হিসেবে এ তথ্য প্রকাশ করা হত যে, জিহাদ থেকে পলায়নকারীদের হাশ্‌র অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার বর্ণনাদী সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ প্রথমে উপমা পেশ করা হয়েছে এবং তারপর জিহাদের আয়াত।

অতএব এর সঠিক ব্যাখ্য এই যে, উক্ত আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে জিহাদের নির্দেশের দিকে ধাবিত হওয়ার পূর্বেই বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোন এক জাতি জিহাদ থেকে পলায়ন করে আল্লাহ্‌র আযাবে পড়েছিল। এ পরেই কুরআন পাঠকদের সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হও। এ ধরনের বর্ণনা পদ্ধতির একটি স্বকীয় প্রভাব রয়েছে। কেননা এরূপ নির্দেশকে অমান্য করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠে এবং এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়, কুমন্ত্রণা ও দ্বিধা সংকোচের যত জঞ্জালই হৃদয়ের মাঝে ভিড় জমায় না কেন, তা শান্তচিত্তে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী ব্যক্তির সামনে থেকে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে যায়, আর সে তখন সত্যের পথে জান কুরবান করার জন্য সৎসাহস লাভ করে।

উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়

আয়াতের আলোকে যে সব উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. শান্ত স্বভাব ও দৃঢ়প্রত্যয়ের অধিকারী মানুষকে হেদায়েত ও উপদেশ প্রদানের জন্য একবারমাত্র তার চিন্তা শক্তি ও মনমগজকে সত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলেই যথেষ্ট। অতঃপর তার মনুষ্যত্ব নিজে নিজেই সহজ-সরল পথের অনুসন্ধানী হয়ে উঠে এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি বাহ্যিক কোনো কারণে স্বভাব-প্রকৃতিতে বক্রতা এবং নৈতিকতা অবক্ষয় দেখা দেয়, তাহলে তাকে সমতল করার জন্য যদিও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বারংবার আহ্বান করে জাগ্রত করা হয়; তবু জাগ্রত হওয়ার পরই তার যোগ্যতায় ও প্রতিভা আবারো নিদ্রিত হয়ে যায় বরং পূর্বের চাইতে অধিক গাফ্‌লতীতে নিমজ্জিত হয়। অবশেষে তার শক্তি -সামর্থ ও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন তার অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে পৌছে যে, সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন ঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কানের উপর মোহর করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ"। (সূরা বাকারা ঃ ৭)

সুতরাং তার উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হয় এবং সে সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও গযবে পতিত হয় এবং আল্লাহর এ ঘোষণার উপযোগী পাত্রে পরিণত হয় যে,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ -

"তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের প্রাত্র হলো"। (সূরা বাকারা ঃ ৬১)

সুতরাং বনী ইসরাঈলের এ ধরনের উপর্যোপরি সত্যদ্রোহিতা এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতায় বিরামহীন অবাধ্যতা তাদের বক্রতাকে সেই ভিন্ন পথে অর্থাৎ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এমনকি হযরত হিযকীল (আ.)-এর যুগেও তারা কুপথে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। তবে তাদের একটি ক্ষুদ্রদল সব সময় নবীদের দিক নির্দেশনা ও হিদায়েতের সামনে মাথা নত করতে ছিলেন এবং পদস্খলন ও ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো রকমে সত্যপথের সন্ধান লাভ করেছিলেন।

২. জিহাদ যদিও জাতির কিছু সংখ্যক লোকের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে এবং পার্থিব স্বাদ-আহ্‌লাদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে। কিন্তু তারা দেশ ও জাতির জন্য অমর ও অমূল্য রত্নে পরিণত হয়।

আর জাতীয় স্থায়ী নিয়ম শৃঙ্খলার জিম্মাদার হয়ে যায় এবং সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া ব্যক্তিবর্গের জন্য নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে অমরত্ব দান করে থাকে। এ রকম মৃত্যুর দর্শনই তো এটা যা মুসলমানদের অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিল। কেননা আল্লাহ্‌র বাণীকে যারা সমুন্নত করতে চান, তারা যদি পার্থিব জীবনে সফল হন তাহলে তাঁরা গাযী ও মুজাহিদ নাম অলংকৃত করেন। আর মৃত্যুর শরবত যদি পান করেন তাহলে শহীদ নামে হন বিভূষিত। তাই তো মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ -

"আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাদের মৃত বলো না তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৪)

এ জন্যেই যারা এরূপ মহৎ জীবন লাভ করা থেকে আত্মগোপন করতে চায় তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ -

"সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্র বিরাগ-ভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট!" (সূরা আনফাল ঃ ১৬)

৩. ইসলাম তো বীরত্বকে সৎচরিত্র আর ভীরুতাকে অসৎ চরিত্র মনে করে। একটি হাদীসে নবী করীম (সা.) বিভিন্ন বদ্ আমলের হিসাব দিতে গিয়ে বলেন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পদস্খলন ও অপরাধজনিত কারণে এসব বদ্ আমল করা সম্ভব। কিন্তু ইসলামের সাথে ভীরুতা কোন অবস্থাতেই একত্রিত হতে পারেনা। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো উপর অনর্থক ক্ষমতার দাপট দেখানোকে বীরত্ব বলা হয়না; বরং সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে দণ্ডায়মান হওয়া এবং বাতিলের বিরুদ্ধে নির্ভীক হওয়ার নাম বীরত্ব।

হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম

ভূমিকা

বিগত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর পর তাঁদের প্রাথমিক স্থলাভিষিক্তদের নাম কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়নি। তবে ইউশা (আ) সম্পর্কে দু' জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। তার এক জায়গায় (সূরা মায়িদায়) হযরত ইউশা এবং কালেব ইব্‌ন ইউহান্না সম্পর্কে فَتًى যুবক অর্থাৎ মূসা (আ.)-এর সাথী বলে আর অপর জায়গায় (সূরা মায়িদায়) হযরত ইউশা এবং কালেব ইব্‌ন ইউহান্না رَجُلَانِ অর্থাৎ দু' ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর জমহুর আলিমদের বর্ণনানুযায়ী হযরত হিযকীল (আ) সম্পর্কিত বর্ণনা কেবল একটি কাহিনীর আওতায় স্থান পেয়েছে। তবে উল্লেখিত আয়াতে তাঁর কোন বিশিষ্ট গুণ বা বিবরণী বিবৃত হয়নি। হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) এর পর সর্বপ্রথম যে নবীর নাম কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে তিনি হযরত ইলিয়াস (আ)। তিনি হযরত হিযকীল (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং বনী ইসরাঈলের মাঝে ঈলীয়া নামে খ্যাত ছিলেন।

নাম ও পরিচয়

পবিত্র কুরআনে তাঁকে ইলিয়াস নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর ইউহান্না রচিত ইঞ্জীলে তাঁকে ইলিয়াহ্ নবী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইলিয়াস ও ইদ্রীস (আ) একই নবীর দু'টি নাম। তবে এ তথ্য সঠিক নয়। কেননা–

প্রথমত

এসব হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মন্তব্য হচ্ছে যে, এ গুলো গ্রহণযোগ্য তথ্য নয়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭-২৩৯)

দ্বিতীয়ত

কুরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গীতে এ ধরনের হাদীস পরিত্যক্ত প্রত্যাখ্যাত হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা সূরা আন্'আম ও আস সাফ্ফাত-এর দু' জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আ)-এর যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে এমন কোন ইশারা-ইঙ্গিত নেই যে, তাঁকে ইদ্রীস নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। সূরা আম্বিয়ায় যে আয়াতে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর বর্ণনা আছে, তাতেও এমন কোন ইশারা পাওয়া যায় না যে, উল্লেখিত দু'জন নবীর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্য সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে, যাতে সে সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা একজন মাত্র ব্যক্তিকেই বুঝানো যাবে।

এ ছাড়া বংশবিশারদগণ হযরত ইদ্রীস (আ)-এর যে বংশ তালিকা পেশ করেছেন, তাও হযরত ইলিয়াস (আ) সম্পর্কিত বংশ তালিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উভয়ের মাঝে বহু শতাব্দীর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এ দু'টি নামের নবী যদি এই ব্যক্তিই হতেন, তাহলে অবশ্যই কুরআনে এর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকত। আর বংশ বিশারদ ঐতিহাসিকগণ যে কোনভাবে তথ্য প্রমাণসহ তাঁদের বংশতালিকা একীভূত করে পেশ করতেন। কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, হযরত ইদ্রীস (আ.) ছিলেন হযরত নূহ্ (আ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর মধ্যবর্তী যুগের একজন নবী। আর হযরত ইলিয়াস (আ.) ছিলেন ইসরাঈল বংশীয় অপর একজন নবী। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত মূসা (আ)-এর পরবর্তী সময়ে। এ পর্যায়ে আবূ জাফর তাবারী (র.) বলছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত আল্ ইয়াস্আ' (আ)-এর চাচাতো ভাই এবং হযরত হিয্কীল (আ) এর পরবর্তী প্রেরিত নবী।

বংশ তালিকা

অধিকাংশ বংশবিশারদ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত ইলিয়াস (আ) হযরত হারূন (আ)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ইলিয়াস (আ.) পিতা-ইয়াসীন, পিতা-ফাখ্খাস, পিতা-ইয়াজার, পিতা-হারূন (আ.)। মতান্তরে ইলিয়াস (আ) পিতা-আযের, পিতা-ইয়াজার, পিতা-হারূন (আ.)।

কুরআন শরীফ ও হযরত ইলিয়াস (আ)

কুরআন শরীফে সূরা আন'আম ও সূরা আস্ সাফ্ফাত-এর দু' জায়গায় হযরত ইলিয়াসের কথা উল্লেখ আছে। সূরা আন'আমে তাঁকে শুধু নবীদের

তালিকাসূচিতে পরিগণিত করা হয়েছে আর সূরা আস্ সাফ্ফাতে তাঁর নবুওয়াত ও জাতিকে তাঁর হিদায়েত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা	আয়াত	সংখ্যা
আন'আম	৮৫	১
আস্ সাফ্ফাত	১২৩-১৩২	১০

নবুওয়াত

হযরত ইলিয়াস (আ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে তাফসীর শাস্ত্রবিদ ও ইতিহাসবিদগণ একমত যে, তিনি সিরিয়াবাসীদের হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, আর বা'লাবাক' নামক বিখ্যাত শহর ছিল তাঁর রিসালাত ও হিদায়েতের কেন্দ্রস্থল।

হযরত ইলিয়াস (আ)-এর জাতি 'বা'আল' নামক বিখ্যাত মূর্তির পূজারী ছিল এবং তাওহীদ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিমুখ হয়ে শিরকে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ্র প্রেরিত নবী তাদের বুঝালেন এবং হিদায়েতের রাস্তা দেখালেন। মূর্তিপূজা ও নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে ওয়াজ নসীহত করলেন এবং নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে তাদের দাওয়াত দিলেন।

ইলিয়াস (আ)-এর জাতি এবং বা'আল মূর্তি

বা'আল ছিল প্রাচ্যের অধিবাসী সাম জাতির কাছে বিখ্যাত ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দেবতা। এটা পুরুষ দেবতা বলে তাদের ধারণা ছিল; আর এর বিপরীত লিঙ্গের দেবীর নাম ছিল 'যুহল' বা মুশতারী। বিশেষ করে ফীনেকী, কিনানী, মুওয়াবী ও মাদইনী গোত্র হযরত মূসা (আ)-এর সময় থেকে এর পূজা করতেছিল। সুতরাং সিরিয়ার বিখ্যাত শহর 'বা'লাবাকের' নামকরণ করা হয় এ মূর্তির সাথে সম্পর্ক রেখেই। মাদাইনে হযরত শু'আয়ব (আ) কে ও এ বা'আল পূজারীদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, হিজাযের বিখ্যাত মূর্তি 'হোবল' ও মূলত এ বা'আল মূর্তিরই নামান্তর।

সে সমাজে বা'আল দেবতার এতই প্রাধান্য ও প্রভাব ছিল যে, তাকে বিভিন্ন দয়া-অনুগ্রহ ও প্রতিপালনের মূলকাজ মনে করে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হতো। সুতরাং তাওরাত কিতাবে সাম জাতির পূজ্য দেবতা বা'আল এ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাকে বা'লে ব্রীছ ও বা'লে ফাগুর নামে উল্লেখ কর হয়। আকরুনীয়দের কাছে কিছুটা বাড়িয়ে 'বালায বুব' নামে পরিচিত ছিল। কালদানীদের ভাষায় বি'আল অর্থাৎ ب অক্ষরে যের দিয়ে ডাকা হতো। প্রায়শই তারা একে বেল ও বেলুস অথবা বি'আল ও বিলুস বলেও ডাকত।

সেমিটিক ও হিব্রু ভাষায় বা'আল শব্দের অর্থ হলো- অধিপতি, সর্দার, বিচারক ও প্রভু। এ জন্যেই আরববাসীরা স্বামীকে ও বা'আল বলে থাকে। তবে বা'আল শব্দের সাথে যখন আলিফ লাম যুক্ত হয়ে 'اَلْبَعْل' রূপ নেয় অথবা কোন বস্তুর দিকে সম্বন্ধ করা হয় তখন এর অর্থ শুধু দেবতা বা পূজনীয় বলে ধরা হয়।

ইয়াহূদী অথবা প্রাচ্যের ইসরাঈলীদের মাঝে বা'আল দেবতার পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ঋতুতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালনের রীতি বিদ্যমান ছিল। এ উদ্দেশ্যে বিরাট আকারে পূজামণ্ডপ ও বিশাল বেদী নির্মাণ করা হতো। যাজক এসে দেবতার উদ্দেশ্যে তাতে ধূপ জ্বালাত এবং বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি ছড়াত। কখনো কখনো দেবতার উদ্দেশ্যে উপঢৌকন হিসেবে মানুষ বলী দেয়া হতো। (দায়িরাতু মা'আরিফ, ৫ম খণ্ড)

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বা'আল দেবতার মূর্তি ছিল স্বর্ণ নির্মিত। বিশ গজ উঁচু বিরাট মূর্তির মুখ ছিল ৪টি আর এর সেবায় নিয়োজিত থাকত চারশ' খাদেম। (রুহুল মা'আনী, ২৩ খণ্ড, পৃ. ৬২৭)

হযরত ইলিয়াস (আ)-এর যুগেও ইয়ামান ও সিরিয়াতে এ মূর্তিটি তাদের প্রিয় দেবতা ছিল। হযরত ইলিয়াসের জাতি অন্যান্য মূর্তির পাশাপাশি বিশেষ করে এ মূর্তির পূজাই করত। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ - اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ - اللّٰهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ - فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ - اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ - وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ - سَلٰمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ، اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ -

"ইলিয়াস ও ছিল রাসূলদের একজন। স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কি সাবধান হবেনা ? তোমরা বা'আলকে ডাকবে আর পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা-আল্লাহকে যিনি প্রতিপালক তোমাদের পূর্বপুরুষদের কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলে, কাজেই তাদের অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত হতে হবে। তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ ভাবে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।" (সূরা আস্ সাফ্ফাত ঃ ১২৩-১৩২)

তাফসীর গ্রন্থের সূক্ষ্ম আলোচনা

সূরা আন'আমের যেসব আয়াতে হযরত ইলিয়াসের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে হযরত নূহ্ (আ) ও হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি বংশীয় নবী রাসূলদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাসূচি প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسَى وَهٰرُوْنَ - وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

"এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, পূর্বে নূহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশীয়, দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে ও আর এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনের অন্তর্ভুক্ত। আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল আল ইয়াস'আ, ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে।" (সূরা আন'আম ঃ ৮৪-৮৬)

কুরআনে পাকের এ তালিকাসূচিতে নবী-রাসূলদের তিনটি পৃথক পৃথক স্তর বিভক্ত করা হয়েছে। এর রহস্য কি ? অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছেন। এ সব বক্তব্যের মধ্যে 'আল-মানার' নামক তাফসীর গ্রন্থের লেখকের বক্তব্য প্রনিধাণযোগ্য।

যার সারসংক্ষেপ এই মহান আল্লাহ্ উক্ত আয়াতগুলোতে নবী-রাসূলদের তিনটি পৃথক দলে উল্লেখ করেছেন এ জন্য যে, বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে বনী ইসরাঈলী নবী-রাসূলদের তিনটি শ্রেণী ছিল। কতক নবী ছিলেন সিংহাসন ও মুকুটের মালিক অথবা মন্ত্রীত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী। কতক নবীর জীবন ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁরা অনাড়ম্বর ও সংসার বিরাগী জীবন যাপন করেছেন। অপর আরেকটি দলের নবীগণ না ছিলেন মুকুট সিংহাসনের অধিপতি আর না ছিলেন খাঁটি সংসার বিরাগী, রবং তাঁরা একদিকে ছিলেন জাতির পথপ্রদর্শক নবী আর অপর দিকে মধ্যবর্তী শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত সংসারী মানুষ। কাজেই কুরআন মজীদে যখন এসব নবীদের আলোচনা এসেছে, তখন তাঁদের নবুওয়াতী যুগ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থেকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে। তবে তাঁদের মর্যাদার স্তর বিন্যাসের প্রতি

লক্ষ্য রাখা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম তালিকাসূচীতে হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তাঁরা নবী-রাসূল হওয়া ছাড়াও রাজত্বের মালিক ছিলেন। তারপর হযরত আইউব ও হযরত ইউসুফ (আ)-এর নাম এসেছে। এরা যদিও রাজত্বের মালিক ছিলেন না কিন্তু প্রথমোক্তজন তো ছোট খাট নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন আর দ্বিতীয়জন মিসরের মন্ত্রীও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ছিলেন। তারপর হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর নাম এসছে। যাঁরা না ছিলেন তেমন বড় রাজত্বের মালিক আর না ছিলেন ছোট নেতৃত্বের অধিকারী অথবা কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রী বা নেতা। বরং তাঁরা ছিলেন তাঁদের জাতির পথপ্রদর্শক নবী ও তাঁদের দলনেতা। দ্বিতীয় তালিকাসূচিতে সে সব নবীদের আলোচনা এসেছে, তাঁরা সারাজীবন কাটিয়েছেন অনাড়ম্বর ও সংসারের প্রতি উদাসীনভাবে। তাঁরা মাথা গুচার জন্য না কোন বাড়ী ঘর নির্মাণ করেছেন আর পানাহারের জন্য না কোন বিষয় বৈভব যোগাড় করেছেন। তাঁরা দিনভর হকের দাওয়াত দিয়ে বেড়াতেন আর রাতভর আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল থাকতেন। অতঃপর যেখানেই এতটুকু জায়গা পেতেন, হাতকে বালিশ বানিয়ে মাথার নিচে বিছিয়ে পড়তেন। হযরত ইয়াহ্য়াহ্, যাকারিয়া, ঈসা ও ইলিয়াস (আ)-এ শ্রেণীভুক্ত হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তৃতীয় আলোচ্যসূচিতে সে সব নবীর নাম স্থান পেয়েছে, তাঁরা না কোন রাজত্ব ও নেতৃত্ব করেছেন আর না খাটি সংসার বিরাগী ছিলেন।

বরং তাঁরা এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে সত্য প্রচার এবং নেতৃত্ব করেছেন। সুতরাং হযরত ইসমাঈল, আল্ ইয়াসাআ', ইউনুস ও লূত (আ) এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

শিক্ষণীয় উপদেশ

হযরত ইলিয়াস (আ) তাঁর জাতির ঘটনা বা বর্ণনা যদি ও কুরআন শরীফে সংক্ষিপ্তকারে করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ থেকে এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে যে, বনী ইসরাঈলী ইয়াহূদীদের মেধাশক্তি এতই লোপ পেয়েছিল যে, দুনিয়াতে এমন কোন খারাপ বা অন্যায় কাজ ছিলনা যা তারা করতে লোভ করে নাই, আর এমন কোন ভাল কাজ ছিল না যার প্রতি তাদের হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল আর নবী-রাসূলদের আগমনের দীর্ঘ ও উপর্যুপরি ধারাবাহিকতা থাকা-সত্ত্বেও মূতিপূজা, জড়পূজা, নক্ষত্রপূজা মোটকথা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য দেবদেবী পূজার এমন কোন শাখা ছিল না, যার পূজারী তারা হয়নি। সুতরাং কুরআন পাকে সেখানেই বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত এসব বর্ণনায় তাদের দুর্ভাগ্য ও বক্রতা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে, সেখানেই আমরা এমন উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করতে

পারি যে, আজ যেহেতু নবী-রাসূলদের আবির্ভাব বন্ধ হয়ে গেছে আর সর্বশেষ নবীর নবুওয়াত এবং কুরআন শরীফের সর্বশেষ বাণী- এ ধারাবাহিকতাকে সমাপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন ! কাজেই আমাদের একান্ত উচিত বনী ইসরাঈলের স্বভাব প্রকৃতি ও মেধাশক্তির বিলুপ্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং তাদের মত বক্রতা ও ধর্মদ্রোহিতা করে আল্লাহ্‌র বিরোধিতার দুঃসাহস না দেখানো, আমাদের স্বভাব ও চাল্-চলন হওয়া উচিত নির্ভেজাল আত্ম সম্পর্ক যাতে থাকবে না কোন অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান ও অবাধ্যতার ছাপ। আর ইসলামের প্রকৃত অর্থই তো এটা, শুধুই এটা।

হযরত আল্ ইয়াসা' আলাইহিস্ সালাম

নাম ও বংশ তালিকা

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) রচিত ইসরাঈলী বর্ণনাতে উল্লেখ আছে যে, তাঁর নাম ছিল আল্ ইয়াসা আর তাঁর পিতার নাম খুতুব। ইব্ন ইসহাকও এ মত গ্রহণ করেছেন। ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আল ইয়াসা' হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। ইব্ন আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আল্ ইয়াসার বংশ পরিচয় সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূবের বংশধর আর তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আল্ ইয়াসা' পিতা-আদী, পিতা-শাওতাম, পিতা-আফরায়েম, পিতা-ইউসুফ,- পিতা-ইয়াকুব, পিতা-ইসহাক, পিতা-ইব্রাহীম (আ.)। তাওরাতে বর্ণিত হয়েছেঃ ইয়াসইয়া নবী আর হযরত আল্ ইয়াসা যদি একই ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর পিতার নাম আমূস বর্ণিত হয়েছে।

নবুওয়াত

হযরত আল ইয়াসা' (আ.) হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর প্রতিনিধি ছিলেন প্রথম জীবনে তিনি তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর মৃত্যুর পর বনী ইসরাঈলের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আল্ ইয়াসা'কে নবুওয়াত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। তিনি হযরত ইলিয়াসের অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী বনী ইসরাঈলকে হিদায়েত করেন। হযরত আল্ ইয়াসা (আ.) কত বছর বয়স জীবিত ছিলেন এবং দাওয়াতের কাজ কত বছর চালিয়েছেন তা জানা যায়নি।

কুরআন শরীফে হযরত আল্ ইয়াসা'র বর্ণনা

কুরআন শরীফে তাঁর সম্পর্কে বেশী আলোকপাত করা হয়নি। তবে সূরা আন'আম এ ও সূরা সাদ এ শুধু এতটুকুন আলোকপাত করা হয়েছে ঃ

হযরত শামাবীল আলাইহিস্ সালাম

বনী ইসরাঈলের অতীত ইতিহাসের প্রতি এক পলক দৃষ্টি

হযরত ইউশা (আ.)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীন অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাদের মাঝে সে অঞ্চলটি বন্টন করে দেন। তারা যেন সেখানে সুখ-শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করতে এবং দ্বীনে হকের দাওয়াতের জন্য উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করতে পারে। তাওরাতে ইউশো পুস্তক ২৩ অধ্যায়ে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

ইউশা (আ.) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের পর্যবেক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি তাদের যাবতীয় ব্যাপার লেন-দেন এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহের মীমাংসার জন্য বিচারকমণ্ডলী নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে নিজেদের মাঝে যেন অনুরূপ ব্যবস্থা চালু থাকে সে ব্যাপারে তাদের উপদেশ প্রদান করেন। ফলে হযরত মূসা (আ.)-এর ইন্তিকালের পর থেকে প্রায় সাড়ে তিন'শ বছর পর্যন্ত এ ব্যবস্থাটি একইভাবে চালু ছিল। বংশ ও গোত্রসমূহের সর্দারগণ তাদের উপর রাজত্ব করতেন আর তাদের পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ, লেন-দেন ইত্যাদির ফায়সালার ভার ছিল কাযীদের উপর। নবী-রাসূলগণ তাঁদের সমুদয় কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সাথে সাথে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব পালন করতেন। কখনো কখনো স্বর্গীয় অনুগ্রহে নিয়োজিত কাযীদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করা হতো। উল্লেখিত সময়ে বনী ইসরাঈলের জন্য না কোন বাদশাহ ছিল আর সকলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে না কোন রাষ্ট্রনায়ক ছিল। যে কারণে প্রতিবেশী জাতিসমূহ প্রায়শ তাদের উপর আক্রমণ করে বসত আর বনী ইসরাঈল হতো তাদের লক্ষ্যবস্তু। কখনো আমালেকা জাতি আক্রমণ করত, আবার কখনো ফিলিস্তীনী অথবা মাদায়েনী, কখনো বা আরামী জাতি। সে সব আক্রমণকারীদের কোন জাতি যদি কখনো পরাজিত হত, তাহলে তারা লুকিয়ে থেকে লুটতরাজ

শুরু করে নিত। এভাবে উপর্যুপরি অত্যাচার চালাতে চালাতে অনেক সময় তারা বিজয়ী হত, আবার কখনো আক্রান্ত ইসরাঈলীগণ চূড়ান্ত জয়লাভ করত। (বিচার পুস্তক, অধ্যায় ২; শ্লোক ৭-৬ ২১; শ্লোক ২৫)

খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংশ ছিল আয়লী কাহেনের যুগ। সে সময় গাযা অঞ্চলের ফিলিস্তীনী জাতির 'আশদুদ হাওয়ালী' গোত্রের লোকেরা বনী ইসরাঈলের উপর ভীষণ আক্রমণ পরিচালনা করে এবং তাদের পরাজিত করে বরকতময় সিন্দুক 'তাবুতে সাকীনা' টি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সিন্দুকের ভেতরে তাওরাতের মূলকপি, হযরত মূসা ও হারূনের লাঠি, জামা এবং মান্না ও সালওয়া ভর্তি বাসন সংরক্ষিত ছিল। ফিলিস্তীনীরা সেটা নিয়ে তাদের বিখ্যাত মন্দির 'বায়তে দাজুন'-এর ভেতর রেখে দেয়। দাজুন ছিল তাদের সর্ববৃহৎ দেবতা। এরই নামে মন্দিরটির নাম করা করা হয়েছিল। উক্ত দেবতার মুখাকৃতি ছিল মানুষের মত আর দৈহিক কাঠামো ছিল মাছের মত। মন্দিরের মাঝখানে একে স্থাপন করা হয়েছিল। 'নাজ্জার মিসরী' নামক জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, ফিলিস্তীনের বিখ্যাত 'রামলা' অঞ্চলের নিকটে 'বায়তে দাজুন' নামে একটি বসতি অঞ্চল এখনো পাওয়া যায়। অধিক নির্ভরযোগ্য ধারণা মতে তাওরাতে উল্লেখিত দাজুন মন্দিরটি এখানেই অবস্থিত ছিল। সে কারণে এর সাথে সম্পর্ক রেখে বসতির নাম রাখা হয়েছে 'বায়তে দাজুন'। (কাসাসুল আম্বিয়া)

নাম

আয়লী কাহেনের যুগ প্রায় শেষ। এ সময় তাঁর নিয়োজিত কাযীদের মধ্য থেকে শামাবীল নামক জনৈক কাযীকে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়। তিনি তখন থেকে বনী ইসরাঈলকে হিদায়েত করার জন্য আদিষ্ট হন। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত আল্ ইয়াসা নবীর ইন্তিকালের পর জালূত নামক জনৈক অত্যাচারী শাসক বনী ইসরাঈলকে পরাজিত করে এবং সে অঞ্চল দখল করে নেয়। তাদের অনেক সর্দার ও গোত্রের সম্মানিত লোকদের ধরে নিয়ে যায়। জালূত ছিল মিসর ও ফিলিস্তীনের মধ্য স্থলে (পারস্য) রোম সাগরের তীরে বসবাসকারী আমালেকা জাতির রাজা। সে তাদের অনেককে বিধ্বস্ত করে এবং রাজস্ব চাপিয়ে দেয়। এছাড়া তারা তাওরাত কিতাবের ক্ষতি সাধন করে। এ সময়টা ছিল ইসরাঈলের জন্য অত্যন্ত নাজুক ও সংকটপূর্ণ। কেননা তাদের মাঝে তখন না কোন নবী-রাসূল বিদ্যমান ছিলেন, আর না ছিলেন কোন সর্দার বা আমীর। নবীর বংশে একমাত্র গর্ভবতী মহিলা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এ কঠিন দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় আল্লাহ্ অনুগ্রহ ও রহমতের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন। সে গর্ভবতী মহিলা প্রসব করল

একটি ছেলে সন্তান। তাঁর নাম রাখা হল শামাবীল। বনী ইসরাঈলের জনৈক বুযুর্গ তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন। শামাবীল তাঁর কাছে তাওরাত মুখস্থ করেন এবং দ্বীনি শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেন। যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈলের মাঝে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সত্তারূপে প্রতিভাত হন। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়েত ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করেন। (রূহুল মা'আনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২) ঐতিহাসিকগণ বলেন, শামাবীল (আ.) ছিলেন হযরত হারূনের অধঃস্তন পুরুষ। (খাযেন, ২য় খণ্ড)

বংশ তালিকা

শামাবীল (আ.) পিতা হেন্না, পিতা আকের (রূহুল মা'আনী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২) তাঁর উপর ধাপ উল্লেখ নেই। মুকাতিল (র.)-এর বর্ণনামতে এটা অতিরিক্ত। তিনি বলেন, শামাবীল পিতা বালী, পিতা-আলকামা, পিতা-ইয়ারখাম, পিতা-ইয়াহু, পিতা- তাহু, পিতা-সউফ, পিতা-আলফামা, পিতা-মাহিছ, পিতা-আমুস, পিতা- আযায়া। (তারীখে ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড)

ইশমাবীল শব্দটি ইবরানী। আরবীতে এর অনুবাদ ইসমাঈল বা আল্লাহ্র বান্দা। অধিক ব্যবহারের কারণে ইশামাবীল শব্দটি শামাবীল হয়ে গেছে। যা হোক, শামাবীলের আমলেও আমালেকা জাতির অনধিকার হস্তক্ষেপ, নিঃপীড়ন ও দৌরাত্ম পূর্বের মতই চলতেছিল। তখন বনী ইসরাঈল তাঁর কাছে আবেদন করে বলল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন, যার নেতৃত্বে আমরা অত্যাচারী জাতির মোকাবেলা করতে পারি এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে শত্রুদের সৃষ্ট সংকট ও বিপদের অবসান ঘটাতে পারি।

তাওরাতে আছে, বনী ইসরাঈল তাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করার আবেদন পেশ করে। কারণ, শামাবীল যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন বনী ইসরাঈলের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ছেলেদের নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রথম ছেলের নাম ছিল ইয়াওয়ায়েল আর দ্বিতীয়টির নাম আবিয়াহ। তাঁরা উভয়েই বীরে সাব'আ অঞ্চলের কাযী ছিলেন। কিন্তু তারা শামাবীলের নীতি অনুসরণ না করে ঘুষ, দুর্নীতি ও লোভের পথে পা বাড়াল। ন্যায়বিচারের পরিবর্তে পক্ষপাতিত্ব করতে শুরু করল। তখন বনী ইসরাঈলের প্রধানগণ একত্রিত হয়ে শামাবীলের কাছে সব ঘটনা খুলে বলতে মনস্থ করল। অবশেষে তারা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শামাবীলের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এদিকে আপনার ছেলেরা আপনার নীতি-আদর্শ মেনে চলছে

না। সুতরাং আমাদের জন্য এমন একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যিনি অন্যান্য জাতির মতই আমাদের উপর রাজত্ব করতে পারেন। (শ্যামুয়েল পুস্তক, অধ্যায়, ৮ শ্লোক ২৮-২৬)

তাদের এ প্রস্তাব প্রথমে শামাবীলের পসন্দ হয়নি। তিনি বলেন, তোমাদের উপর কাউকে বাদশাহ নিযুক্ত করা হলে তিনি তোমাদের সবাইকে তার সেবক ও দাসে পরিণত করবেন। কিন্তু এ দাবীর স্বপক্ষে বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ির কারণে পরিশেষে শামাবীল আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে বনী ইয়ামীন গোত্রের সুঠাম দেহের অধিকারী, সুপুরুষ ও শক্তিশালী তালূতকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। তালূতের বংশতালিকা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক সা'লাবী বলেন, তালূত (সাউল) পিতা-কয়েশ, পিতা- আফীল, পিতা-সারু, পিতা-তাহুরত, পিতা- আফিয়া, পিতা- আনীস, পিতা- বনী ইয়ামীন, পিতা- ইয়াকূব, পিতা- ইসহাক, পিতা- ইব্‌রাহীম (আ.)। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬)

বনী ইসরাঈলের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত শামাবীল (আ.) যে জবাব দিয়েছেন, কুরআন শরীফে তা ভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বনী ইসরাঈলে স্বভাব ও চিরাচরিত অভ্যাসের সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। কুরআন বলছে, বনী ইসরাঈল যখন শামাবীলের কাছে বাদশাহ নিযুক্ত করে দেয়ার আবেদন পেশ করল, তখন তিনি তাদের জবাবে বলেন, যখন তোমাদের উপর কাউকে বাদশাহ নিয়োগ করা হবে আর তিনি তোমাদের শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদের নির্দেশ দেবেন, তখন তোমরা ভীরু প্রমাণিত হবে এবং জিহাদে যেতে অস্বীকার করবে বলে আমার ভয় হচ্ছে। বনী ইসরাঈল অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে উত্তর দিল, শত্রুরা আমাদের অপমানিত লাঞ্ছিত করছে, আমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে, আমাদের সন্তানদের হত্যা না হয় বন্দী করছে, এটা নিশ্চিতভাবে জানার পর আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতে অস্বীকার করব, কিভাবে তা সম্ভব হতে পারে? হযরত শামাবীল (সা.) তাদের সাথে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের পর আল্লাহ্‌র দরবারে তা পেশ করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, বনী ইসরাঈলের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। তোমাদের মধ্যে জ্ঞান ও দৈহিক শক্তির মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত তালূতকে তোমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলাম। বনী ইসরাঈল এ নাম শুনে মুখ ভেংচিয়ে অনীহা প্রকাশ করল এবং বলল, এ লোকটি তো নিঃস্ব, সহায়-সম্পদহীন। সে কেমন করে আমাদের বাদশাহ হাত পারে? বস্তুত বাদশাহী করার মত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি তো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং আমাদের কাউকে এ দায়িত্ব নিয়োগ করা হোক। ঐতিহাসিকগণ বলেন,

বনী ইসরাঈলের লাদী গোত্রে নবুওয়াতের ধারা এবং ইয়াহুদা গোত্রে শাসক ও নেতৃত্বে ধারা দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছিল। এবার শামাবীলের নির্দেশ অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ পদটি যখন বনী ইয়ামীন গোত্রে স্থানান্তরিত হতে চলেছে, তাই নেতা সর্দারদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং তারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল। প্রথমে কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করা এবং সময় সাপেক্ষে তা অস্বীকার করার মত গুরুতর কার্যকলাপ বনী ইসরাঈলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। এ ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রথমে তারা অনুধাবন করে নিয়েছিল যে, শামাবীল নিশ্চয়ই আমাদের মধ্য থেকে কাউকে বাদশাহ নিযুক্ত করবেন। কিন্তু যখন দেখল যে অপ্রত্যাশিত বনী ইয়ামীন গোত্রের একজন নিঃস্ব গরীব; কিন্তু শক্তিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে সে পদে নিয়োগ করেছেন, তখন তাদের হিংসার আগুন জ্বলে উঠল এবং সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ শুরু করল। হযরত শামাবীল তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা ও সমালোচনাকারী সর্দারদের বললেন, আমি আগে থেকেই জানতাম, তোমাদের হীনমন্যতা ও কাপুরুষতা তোমাদের সাময়িক উদ্যম, উত্তেজনা ও বুদ্বুদের মত চেতনাকে অটল-অবিচল থাকতে দেবে না। সময়ের ব্যবধানে তোমাদের উত্তেজনার উষ্ণতা ঠাণ্ডা বরফে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং এখন তোমরা টালবাহানা শুরু করেছ। রাজত্ব পরিচালনার যোগ্যতার জন্য ধন সম্পদের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের আধিক্যের যে মানদণ্ড তোমরা ধারণা পোষণ করছ; তা সম্পূর্ণ ভুল ও আগাগোড়াই ভ্রান্ত। এ বাস্তব সত্যকে তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত। মহান আল্লাহর কাছে রাজত্ব পরিচালনার জন্য মৌলিক গুণাবলীর মধ্যে জ্ঞান শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কেননা এ দু'টি গুণ সুকৌশল, বিশুদ্ধ চিন্তা, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রধান উৎস ও পৃষ্ঠপোষক। বস্তুত উক্ত গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে তালূতই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কুরআনের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রকৃত সাক্ষী ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا- قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا - فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ

بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ - قَالَ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ - وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

"তুমি কি মূসা (আ)-এর পরবর্তী সময়কার বনী ইসরাঈলের সর্দারদের দেখ নাই, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একজন রাজা নিযুক্ত করুন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি জিহাদের বিধানে প্রবর্তন করা হলে, তোমরা তো অবিলম্বে সে জিহাদে যাবেনা। তারা বলল, যখন আমরা স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হতে বহিস্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে কেন জিহাদ করব না? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের বিধান দেয়া হলো। তখন তাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। আর আল্লাহ্ যালিমের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। এবং তাদের নবী তাদের বলেছিলেন, আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের রাজা বানিয়েছেন। তারা বলল, আমাদের উপর তার কর্তৃত্ব কিরূপে হবে, যখন আমরা তার চাইতে কর্তৃত্বের অধিক হকদার, আর তাকে তো প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয় নাই। (নবী) তিনি বললেন, আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় প্রজ্ঞাময়"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৩-২৪৭)

এসব আয়াতে যে নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনিই হযরত শামাবীল (আ.)

তাবূতে সাকীনা

বনী ইসরাঈল হযরত শামাবীলের সাথে চরম অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তালূতের নিযুক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে কিনা এটা জানার আবেদন জানিয়ে তাকে বলল, আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই এর সমর্থনে আল্লাহর কোন নির্দশন দেখাতে হবে। হযরত শামাবীল (আ.) বললেন, তোমরা যদি আল্লাহ্র ফায়সালার সত্যতা যাচাই করতে চাও, তাহলে এর সমর্থনে সবচেয়ে সেরা প্রমাণ দেয়া হবে। সেই বরকতপূর্ণ সিন্দুক (তাবূতে সাকীনা) তোমাদের হাতছাড়া হয়েছিল, তাতে সংরক্ষিত আছে তাওরাত, হযরত মূসা ও হারুনের তাবাররুক (জামা লাঠি)। তালূতের মাধ্যমে সে সিন্দুকটি তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় তোমাদের চোখের সামনে ফিরিশ্তারা তা বহন করে নিয়ে আসবে এবং পুনরায় তোমাদের হস্তগত হবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

"আর তাদের নবী তাদের বলেছিল, তাঁর কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত আসবে যাতে তোমদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে, ফিরিশ্তাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৮)

অবশেষে হযরত শামাবীল (আ.)-এর উক্ত সুসংবাদ বাস্তবে রূপায়িত হয়। আল্লাহর ফিরিশ্তাগণ বনী ইসরাঈলের সামনে তাবূতে সাকীনা (চিত্ত-প্রশান্তির সিন্দুক) এনে তালূতকে প্রদান করেন। এরূপে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তারা যদি হযরত শামাবীলের ওহী প্রদত্ত সিদ্ধান্ত কবূল করে তাহলে সফলতা ও কৃতকার্যতা তাদের জন্য সুনিশ্চিত। তাবূতে সাকীনা ফিরে আসা সম্বন্ধে তাওরাতে একটি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ ঃ

'শ্যামুয়েলের যাত্রা' পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, তাবূতে সাকীনা যখন বায়তে দাজুনে স্থাপন করা হয় তারপর থেকে ফিলিস্তীনীরা একটা দৃশ্য প্রতিদিনই দেখত। প্রত্যূষে তারা যখন দাজুন দেবতার পূজা উপলক্ষে মন্দিরে যেতো তখন দাজুনকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেত। সকালে তারা মূর্তিটিকে যথাস্থানে দাঁড় করে রেখে আসত। রাত পোহাবার পরদিন সকালে আবার গিয়ে দেখত যে, তা আগের মতই উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তারা নতুন আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করল যে, সারা শহরে অসংখ্য ইদুঁর সৃষ্টি হচ্ছে, যারা তাদের সমুদয় উৎপন্ন দ্রব্য ধ্বংস করতে লাগল। এছাড়া আরো বিশেষ এক ধরনের ফোঁড়া মহামারী আকারে তাদের উপর আপতিত হয়ে মারাত্মক প্রাণহানি ঘটাতে শুরু করল। ফিলিস্তীনীর যখন কোনো উপায়েই এসব বিপদ থেকে মুক্তি পায়নি, তখন তারা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর বলতে লাগল আমাদের তো মনে হয় যে আপতিত যাবতীয় বিপদাপদের মূল কারণ হলো এই সিন্দুক। সুতরাং এটাকে এ অঞ্চল থেকে বের করে দাও।

এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ফিলিস্তীনীরা তাদের গণক ও জ্যোতিষীদের একত্রিত করে সমুদয় ব্যাপার খুলে বলল এবং এর আশু সমাধান জানতে চাইল। গণক-জ্যোতিষীরা বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিন্দুকটিকে এখান থেকে বের করে দেয়াই এসব কিছুর একমাত্র চিকিৎসা ও বাস্তব সমাধান। তবে সিন্দুক বের করার নিয়ম হবে এরূপ: প্রথমে সোনা দিয়ে সাতটি ইদুঁর ও সাতটি ফোঁড়া বানাতে হবে এবং সেগুলো একটি গাড়ির মধ্যে সিন্দুকের সাথে রাখতে হবে। অতঃপর দু'টি দুগ্ধবতী গাভীকে গাড়ির সাথে জুড়ে দিয়ে জনপদের বাইরে নিতে হবে এবং সড়কে চলা অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। অতঃপর সিন্দুক নিয়ে গাভী দু'টি যেদিক ইচ্ছা সেদিক বলে যাবে।

ফিলিস্তীনীরা গণকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করলো। আল্লাহ্র কুদ্রতে গাভী দু'টো এমনি এমনি বনী ইসরাঈল জনপদের দিকে ধাবিত হল। অবশেষে চলতে চলতে সেটা এমন একটি ক্ষেতের পাশে গিয়ে উপস্থিত হল যেখানে ইসরাঈলীগণ তাদের ফসল কাটতেছিল। তারা সিন্দুক দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল এবং দৌড়ে গিয়ে 'বায়তে শাম্স' নগরে সংবাদ পৌছাল। অতঃপর বায়তে ইয়া'রীম গোত্রের ইয়াহূদীরা এসে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সিন্দুক নিয়ে গেল এবং সুউচ্চ টিলার উপর অবস্থিত 'ইন্দার' এর ঘরে যত্ন সহকারে রেখে দিল। (শ্যামুয়েল পুস্তক, অধ্যায় ৬-৭, শ্লোক ঃ ২১)

আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার এ বর্ণনা থেকে চয়ন করেছেন যে, তাবূত সাকীনা সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ। (ফিরিশ্তাগণ সেটা বহন করে আনবে) উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, গাভীগুলো কোন চালক ছাড়াই ফিরিশ্তাদের পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু উক্ত বিষয়ে কুরআন ও বাইবেলের মাঝে সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্য এ ব্যাখ্যাটি যদিও যথাযথ মনে হয়। তা সত্ত্বেও তাবীল বা মনগড়া ব্যাখ্যা বাতিল এবং কুরআনী বিধান তাবীলকে প্রত্যাখান করে। কেননা কুরআনের ভাষ্যের মর্মকথা হচ্ছে এই যে, তালূতের বাদশাহী পাওয়ার ব্যাপারে সিন্দুক ফিরে আসার মধ্যে আল্লাহ্র নিদর্শন বিদ্যমান। যা শামাবীলের হাতে মু'জিযা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আর আল্লাহ্র ফিরিশ্তাগণ বনী ইসরাঈলের চোখের সামনেই তালূতের পাশে তা রেখে দেয়। কিন্তু তাওরাতের বর্ণনায় বুঝা যায়, দু'টো গাভীকে সিন্দুক বহনকারী গাড়ির সাথে জুড়ে দিয়ে বায়তে শামসের সড়কে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তারা অবশ্য ডানে-বামে না গিয়ে সোজা পথে চলতে থাকে। অবশেষে বায়তে শামস জনপদের সর্বশেষ প্রান্তের ফসলের ক্ষেতের পাশে গিয়ে উপস্থিত

হয়। এটা ছিল ফিলিস্তীনী সীমার শেষ প্রান্ত এবং ইসরাঈলী সীমার প্রথম অংশ। সে বর্ণনায় আরো ব্যক্ত হয়েছে যে, ফিলিস্তীনীরা গাড়ির পেছনে পেছনে বায়তে শামস জনপদের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছিল। অতঃপর গাড়িটি যখন 'বায়তে শামস' এর পরবর্তী ক্ষেতের পাশে পৌছায় তারা তখন ফিরে চলে যায়।

তাওরাতে আছে, অতঃপর গাভী দু'টো ডানে-বামে না গিয়ে বায়তে শামস্ জনপদের প্রধান সড়ক দিয়ে সোজা পথে চলতে থাকে। ফিলিস্তীনী লোকজন গাড়ির পেছনে পেছনে বায়তে শামস্-এর শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছিল। তখন সেখানকার অধিবাসীগণ উপত্যকায় গম কাটতেছিল। কাজের মধ্যে উপর দিকে তাকিয়ে সিন্দুকটি দেখতে পায়।" (শ্যামুয়েল পুস্তক ঃ ১ অধ্যায় ৬, শ্লোক-১২)

এ পদ্ধতিতে সিন্দুক লাভ করে থাকলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটা কোন মু'জিযা বা নিদর্শন নয়। বিশেষ করে তাওরাতে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, বায়তে দাজূনের গণক ও জ্যোতিষীরা গাড়ির পিছে পিছে ইসরাঈলী সীমার ক্ষেত পর্যন্ত এসেছিল। তাছাড়া কুরআন পাকও এত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করত না যে, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ। "নিশ্চয়ই এর মাঝে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা বাকারা : ২৪৮) অধিকন্তু কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য যার মধ্যে ন্যূনতম আগ্রহও বিদ্যমান, সে অতি সহজেই জানতে পারবে যে, সিন্দুকটি যদি বাইবেলের এ বর্ণনানুযায়ী লাভ করা হয়ে থাকে, তাহলে কুরআনে এ সম্পর্কে تَحْمِلُهُ الْمَلَٰئِكَةُ। (ফিরিশ্তাগণ তা বহন আনবে) শব্দমালা ব্যবহার করত না; বরং এ জায়গায় تَهْدِي بِهِ الْمَلَٰئِكَةُ। (ফিরিশ্তাগণ এর পথ দেখাবে) অথবা এ ধরনের এমন বাক্য ব্যবহার করত, যার দ্বারা বুঝা যেত যে, সিন্দুকটি ফিরিশ্তাদের দেখানো পথে গন্তব্য স্থলে পৌছবে।

আর তাওরাতের এ বর্ণনাকে যদি সঠিক বলে ধরেও নেয়া হয়, তাহলেও এর সারকথা হবে এরূপঃ বায়তে দাজূনে যখন সিন্দুকটি রাখা হয়েছিল তখন প্রতিদিন দাজূন মূর্তিটি উপুড় হয়ে পড়ে থাকত আর উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই দাজূন ভূখণ্ড থেকে সিন্দুকটি বের করা হয়। যাহোক, এটাও ছিল একটা মু'জিযা যা নিদর্শন, যা বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই দাজূন মন্দিরে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নির্ভুল ও সঠিক বলে মেনে নিতে প্রস্তুত, তারপক্ষে تحمله الملئكة। আয়াতাংশের পরিষ্কার ও স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায় এর স্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ্র ফিরিশ্তাগণ সবার চোখের সামনে সিন্দুকটি বহন করে নিয়ে আসবে।

তালূত ও জালূতের মাঝে যুদ্ধ ও বনী ইসরাঈলের পরীক্ষা

তালূতকে নেতা হিসেবে মেনে না নেয়ার জন্য বনী ইসরাঈল অনেক কুটিল যুক্তি ও বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করেছে। তাদের সব বাধাছিন্ন করে হযরত শামাবীল (আ.) ওহীর ভিত্তিতে তালূতকে তাদের বাদশাহ নিয়োগ করেন। তালূত নেতৃত্ব গ্রহণ করে বনী ইসরাঈলের মাঝে সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, শত্রুদের মোকাবেলার জন্যে সবাইকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। তারা তালূতের নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। এবারও তাদের পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল; কেননা তালূত ভাবলেন, যুদ্ধ একটি জটিল বিষয়। যুদ্ধের সময় এমন কতগুলো মুহূর্ত আসে, যখন একজন লোকের ভীরুতা বা মুনাফেকী আচরণ সমস্ত বাহিনীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে। সুতরাং বনী ইসলাঈলের এ দলটিকে যুদ্ধের পূর্বেই ভালভাবে পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। তাদের মধ্যে কতজন নেতার নির্দেশ পালন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারে আর কতজন এসব গুণাবলীর অধিকারী নয়। তাছাড়া দুর্বলচিত্ত ও ভীরুদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া যাবে। কর্তব্য পালনের পূর্বেই এসব উপাদান চিহ্নিত ও পৃথক করে ফেলা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তুমুল যুদ্ধের মুহূর্তে ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল,আনুগত্য ও নিষ্ঠা প্রতিটি সদস্যের জন্য অপরিহার্য বিষয়। কাজেই যারা সাধারণ পিপাসায় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে পারবে না, যুদ্ধের ভয়াবহ ও জটিল মুহূর্তে তারা কিভাবে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অটল থাকবে?

সুতরাং বাহিনী যখন একটি নদীর তীরে উপস্থিত হলো তালূত তাদের জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ এ নদীর পানির দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। তোমরা কেউ পূর্ণ তৃপ্তির সাথে এ নদীর পানি পান করবে না। অতএব কেউ যদি এ নির্দেশ অমান্য করে তাহলে আল্লাহ্র এ বাহিনী থেকে তাকে বের করে দেয়া হবে। আর যে নির্দেশ পালন করবে সে দলভূক্ত থাকবে, তবে তীব্র পিপাসার অবস্থায় এক চুমুক পানি পান করে গলা ভেজানোর অনুমতি দেয়া হলো। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ تَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ -

"অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলো সে তখন বলল, আল্লাহ্ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার

দলভুক্ত। এছাড়া যে কেউ তার হাতে এক অঞ্জলি পানি গ্রহণ করবে সেও (দলভুক্ত)। অল্প সংখ্যক ছাড়া তারা তা থেকে পানি পান করল।" (সূরা বাকারা, ঃ ২৪৯)

মুফাস্সিরীনদের মতে এ পরীক্ষার ঘটনা ঘটেছিল জর্দান নদীর তীরে। (আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, বারা ইব্ন আযিব (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কতিপয় সাহাবী বলাবলি করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ আর তালূতের সৈন্যবাহিনীর সংখ্য ছিল সমান সমান। [বুখারী, আল-মাগাযী অধ্যায়)

অতঃপর সৈন্যবাহিনী নদী পার হয়ে যখন অপর পাড়ে সমবেত হলো, তখন তাদের মধ্য থেকে যারা নির্দেশ অমান্য করে পানি পান করেছিল তারা বলতে শুরু করলো জালূতের ন্যায় দুর্ধর্ষ, শক্তিশালী ও তার বিরাট ক্ষমতাশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা নেতার আদেশ পালন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রমাণ দেখাতে পেরেছে, তারা বলল আমরা অবশ্যই নির্ভিকচিত্তে শত্রুর মোকাবিলা করব, কেননা আল্লাহ্র অপার কুদ্রতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রবাহিনী সুবিশাল বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়ে থাকে, তবে এর জন্য পূর্বশর্ত হলো আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ঈমান, আন্তরিক নিষ্ঠা ও যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় মনোবল নিয়ে অটল অবিচল থাকা।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

"সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই; কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বলল, আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৯)

অতঃপর তালূত বাহিনী অগ্রসর হয়ে শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় সারিবদ্ধ হলো। শত্রুবাহিনীর নেতা জালূত ছিল দানবাকৃতির একজন শক্তিমান পুরুষ আর তার সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল বিপুল। মুজাহিদীন আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে বলল, হে আল্লাহ্! আমাদের মনোবল দৃঢ় করে দাও,

শত্রুদের মোকাবিলায় যেন অটল থাকতে পারি এবং শত্রুদের পরাজিত করে সফলতা ও বিজয় লাভ করতে পারি।

তাওরাত ও বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে আছে, জালূতের অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতা বনী ইসরাঈলের মনে এতই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল যে, তার মোকাবিলায় যুদ্ধের আহ্বানে দাঁড়ানোর মত শক্তি তাদের কারো নেই বলে ধারণা করত, এমনকি তার সামনে নিজেদের কাপুরুষ ভাবত।

হযরত দাউদ (আ.)-এর বীরত্ব

তালূতের বাহিনীতে এমন একজন যুবক ছিলেন, যিনি প্রকাশ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করতেন না আর বীরত্ব ও সাহসিকতার বিশেষ কোন খ্যাতিও তাঁর ছিল না। তাঁর নাম ছিল দাউদ। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন তাঁর পিতার সর্বকনিষ্ঠ ছেলে। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে আসেননি বরং তাঁর পিতা তাঁকে ভাইদের ও অন্যান্য ইসরাঈলীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, জালূত বীরত্বের সাথে আহ্বান করছে তাঁর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য আর এদিকে ইসরাঈলী সৈন্যরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ তালূতের কাছে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যাতে তাঁকে জালূতের আহ্বানের জবাবে তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে সুযোগ দেয়া হয়। তালূত বললেন, তুমি তো এখনো অনভিজ্ঞ বালক মাত্র। কাজেই এত বড় ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তোমাকে দেয়া যেতে পারে না। কিন্তু অবশেষে দাউদের পীড়াপীড়ির কারণে তালূতকে অনুমতি দিতেই হলো। দাউদ অগ্রসর হয়ে জালূতকে উত্তেজিত করলেন। জালূত একজন উঠতি বয়সের যুবককে সামনে দেখতে পেয়ে অবজ্ঞাভরে তাকে তেমন পাত্তাই দিল না। কিন্তু পরে যখন দু'জনের মাঝে চরম পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল, তখন জালূত বুঝতে পারল যে, দাউদ একজন অনন্য বীর ও অপ্রতিরোধ্য সাহসী যোদ্ধা। দাউদ নিজেকে যথাসাধ্য সামলিয়ে কৌশলে আক্রমণ করতে লাগলেন। এভাবে হঠাৎ করে একের পর এক তিনটি ভারী পাথর সজোরে জালূতের মাথায় নিক্ষেপ করলেন যে, তার মাথা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। তিনি অগ্রসর হয়ে তার গর্দান কেটে ফেললেন। জালূতে হত্যার পর যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ইসরাঈলগণ পরাভূত হতে যাচ্ছিল আর এখন তারা প্রতিআক্রমণ জোরদার করল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাগূতী শক্তি পরাজিত হলো। বনী ইসরাঈল বিজয়ী ও সফলকাম হয়ে ফিরে এলো। এ ঘটনার পর হযরত দাউদের বীরত্ব ও সাহসিকতা শত্রুমিত্র সবার মনে এত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, সবার কাছেই তিনি মর্যাদাবানও প্রিয়পাত্রে পরিণত হলেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হতে লাগল।

কুরআন শরীফ এসব বিবরণকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে উপেক্ষা করে গেছে অথবা বাস্তবিকপক্ষে বিবরণগুলো যথাস্থানে সঠিক নয়। কিন্তু কুরআন ও তাওরাত এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত দাঊদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন। আর এ হত্যার ফলেই বনী ইসরাঈলের বিজয় ও শত্রুদের পরাজয় সম্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ - فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ-

"তারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো তারা তখন বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্যদান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান কর। সুতরাং তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদের পরাভূত করল, আর দাঊদ জালূতকে হত্যা করল, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হিক্মত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছে করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫০-২৫১)

কিছু সংখ্যক ইসরাঈলী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জালূতের দুর্ধর্ষ শক্তিমত্তা ও তার মোকাবেলায় যাবার ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের কাপুরুষতা দেখে তালূত ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করতে পারবে তাঁকে আমার মেয়ের সাথে বিয়ে দেব এবং রাজত্বের অংশীদার বানাব। সুতরাং দাঊদ যখন জালূতকে হত্যা করল তখন তালূত তাঁর অঙ্গীকার পালন করতে গিয়ে তাঁর কন্যা মীকালের সাথে দাউদের বিয়ে দিলেন এবং তাঁকে রাজত্বের অংশীদার বানালেন। (শ্যাময়েলের পুস্তক; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮-৯)

একটি ইসরাঈলী বর্ণনার পর্যালোচনা

তাওরাতের শ্যামুয়েল পুস্তকে তালূত ও দাঊদ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ উপাখ্যান পাওয়া যায়। উক্ত উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

"তালূত যদিও দাঊদের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তার দেয়া ওয়াদা পালনের জন্য স্বীয় কন্যার সাথে দাঊদের বিয়ে দেন; কিন্তু বনী ইসরাঈলের সাথে তার আন্তরিকতা ও হৃদ্রতাপূর্ণ সম্পর্ক এবং তার অসাধারণ বীরত্বকে তালূত ভাল চোখে দেখেননি। তার অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে। কিন্তু অতি সংগোপনে তা মনের মাঝে লালন করতে থাকেন। ভিতরে ভিতরে তিনি এমন ষড়যন্ত্র ও যোগসাজশ আঁটতে থাকেন, যাতে দাঊদের কাহিনী মুছে যায় অর্থ্যাৎ তাকে হত্যা

করে শেষ করে দেয়া যায়। কিন্তু তালূতের পুত্র-কন্যা ছিল পিতার বিরুদ্ধে দাউদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও গোপনে সংবাদ সরবরাহকারী। যে কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে তালূতের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরিশেষে বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে তালূত প্রকাশ্যভাবেই দাউদের বিরোধিতা শুরু করে। দাউদ তাঁর শ্বশুরের এহেন কর্মকাণ্ড দেখে স্ত্রী ও শ্যালককে নিয়ে পালিয়ে যান এবং ফিলিস্তীন জনপদে গিয়ে তালূতের শত্রুদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসরাঈলীদের আত্মকলহের সুযোগে শত্রুরা উপকৃত হয়। তারা বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং তাদের ভীষণভাবে পরাজিত করে"।

উপাখ্যানের এক জায়গায় সুদ্দীর বর্ণনা ও তাওরাতের বর্ণনার মাঝে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাওরাত বলছে, সে যুদ্ধে তালূত নিহত হন। আর সুদ্দী বলছেন যে, তাঁর বাহিনীর পরাজয়ের গ্লানিকর দৃশ্য দেখে তালূত স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে থাকেন। অবশেষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে সে যুগের শ্রেষ্ঠ কাহেন, বুযুর্গ ও মনীষীর কাছে গিয়ে আরজ করেন যে, আমার তাওবা কবূল হওয়ার জন্য কোন রাস্তা বের করুন। তাঁরাই সবাই তাঁর আবেদন প্রত্যাখান করেন। কিন্তু জনৈকা তাপসী মহিলা তাঁকে হাঁ সূচক আশ্বাস বাণী শুনান এবং আল্-ইয়াসা নবীর কবর পাশে নিয়ে গিয়ে দু'আ করেন। অতঃপর হযরত ইয়াসা (আ) করব থেকে উঠে তাঁকে বলেন, তোমার তাওবা কবূলের জন্য একটি মাত্র পথ খোলা আছে। তুমি তোমার রাজত্ব দাউদের হাতে অর্পণ কর এবং খান্দান সহ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাও। অতঃপর তিনি সেই পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেন। আর এভাবেই অন্য কারো অংশীদারিত্ব ছাড়াই সমস্ত রাজত্ব দাউদের হাতে চলে আসে, আর তালূত তাঁর খান্দান সহ শাহাদতের সুধা পান করেন।

এ পুরো উপাখ্যানটি শ্যামুয়েল পুস্তক থেকে চয়ন করা হয়েছে; কিন্তু অনেক জীবনীকার সুদ্দীর বরাত দিয়ে এ উপাখ্যানকে ইসলামী বর্ণনার মতই লিপিবদ্ধ করেছেন। এমন কি হযরত দাউদের প্রশংসাসূচক যেসব আয়াত সূরা বাকারায় বিদ্যমান, সেগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে তারা উক্ত ইসরাঈলী উপাখ্যানকে জুড়ে দিয়েছেন। জানিনা কি কারণে যে ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো অতীতে এত আগ্রহ সৃষ্টি করত? ইয়াহূদীরা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাস জোরদার করার জন্য সুকৌশলে যেসব উপাখ্যান তৈরি করেছে, ইসলামী বর্ণনার সাথে সেগুলোকেও শামিল করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি। ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থের বেলায় তো দূরের কথা, তাফসীরে কুরআনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেও এসব বাজে কল্প কাহিনী থেকে মুক্ত থাকতে দেয়া হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

কুরআনে পাকের বক্তব্য তো আমরা শুনেছি যে, শামাবীল (আ.) যখন বনী ইসরাঈলের দাবী অনুযায়ী তালূতকে তাদের বাদশাহ নিয়োগ করেন তখন তারা তাঁর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের ব্যাপারে পূর্বের দেয়া অঙ্গীকার সত্ত্বেও তালূতকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়। পরিশেষে তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র নিদর্শন এসে যখন তাদের লা জবাব করে দেয়, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তালূতকে সর্বাধিনায়করূপে মেনে নেয়। সুতরাং ইয়াহূদী পণ্ডিতরা ভাবতে শুরু করে যে, আমাদের অপরাধ প্রবণ স্বভাব ও অভ্যাসগুলোর তালিকার সাথে এটাও একটা অতিরিক্ত সংযোজন। কেননা আমরা আল্লাহ্র অদিষ্ট ব্যক্তি তালূতকে অনুপযুক্ত বানিয়ে প্রথমে তাঁকে বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলাম। কাজেই এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উচিত যাতে প্রমাণিত হয় যে, তালূত সম্পর্কে নেতৃত্বের অনুপযুক্ত বলে ইতিপূর্বে আমরা যে দাবী উত্থাপন করেছিলাম সেটা ছিল যথার্থ ও নির্ভুল। আর আমরা দুনিয়ার মানুষের সামনে বড় গলায় বলার সুযোগ পাবো যে, আমরা তো পূর্বে থেকেই অন্তঃদৃষ্টি ও দূরদর্শিতাপূর্ণ বিচক্ষণতার মাধ্যমে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। পরিশেষে তালূতের অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা বাস্তবে প্রমাণিত হল। এটা ছিল তাদের অপরাধকে লঘু করা এবং নিজেদের অশালীন স্বভাবের উপর ঘোমটা দেয়ার একট হীন প্রচেষ্টা, যা শ্যামুয়েলের পুস্তকে 'তালূত ও দাঊদের মাঝে সংঘর্ষ' শিরোনামে পরিদৃষ্ট হয়।

কিন্তু আমাদের কিছু সংখ্যক জীবনীকার ও মুফাস্সিরদের জন্য আফসোস! কেননা তাঁরা এসব বিষয়ের প্রকৃত রহস্য ও সূক্ষ্ম দুরভিসন্ধি উপলব্ধি না করেই সরল মনে নিজেদের জীবনী গ্রন্থে ও তাফ্সীরের কিতাবে সংকলন করেছেন। তাঁরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি, যাকে (তালূত) কুরআন শরীফে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আর যার বরকতে তাবূতে সাকীনা (বা চিত্ত প্রশান্তির সিন্দুক) পুনরায় বনী ইসরাঈলকে প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ যাকে زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ "তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন"। জ্ঞান ও বীরত্ব সূচক সম্মানিত উপাধি দিয়ে অলংকৃত করেছেন। আমরা কোনো জোরালো দলীল ও স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কিভাবে এমন মহান ব্যক্তিকে ঘৃণ্য ও গুরুতর আচরণের ধারক বলে ভর্ৎসনার উপযুক্ত বলে স্বীকার করে নেব ? কুরআন শরীফ থেকে এরূপ আশা করা নিঃসন্দেহে সুদূর পরাহত ; কেননা যে ব্যক্তির জীবনের বিরাট অধ্যায় অন্যায় ও নাফরমানীর কাজে অতিবাহিত হয় এবং গোনাহের কাজে থাকে লিপ্ত, তার জীবনের এ অধ্যায়কে স্পষ্টভাবে তুলে না ধরে কেবল তার জীবনের গুণাবলী ও প্রশংসা

সম্পর্কে আলোকপাত করবে, এ ধরনের কাজ কুরআন থেকে অন্তত আশা করা যায় না। কাজেই কুরআনে যেহেতু তালূতের গুণকীর্তন ও প্রশংসা ছাড়া তার দোষ ত্রুটির ব্যাপারে কোন শব্দই উচ্চারিত হয়নি, এমনকি সেদিকে ইংগিত পর্যন্ত করা হয়নি; সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে তথাকথিত তাওরাতের বাজে ও উদ্ভট উপাখ্যানকে নির্ভুল হিসেবে মেনে নেয়া কিভাবে জায়িয হতে পারে? এটা কখনই হতে পারে না। এ কারণেই বিখ্যাত গবেষক আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত বিবরণ সংকলন করার পর লিখেছেন ঃ

وَفِىْ بَعْضِ هٰذَا نَظْرٌ وَنَكَارَةٌ

"উক্ত বর্ণনার কিছু কিছু অংশ ভাসাভাসা ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"

এছাড়া তিনি আরো বলেন, উক্ত উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা তাপসী মহিলা আল্‌-ইয়াসা' নবীর কবর পাশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মৃত অবস্থা থেকে জাগ্রত করেন। এ বক্তব্যটি পূর্ণ ঘটনাকে মিথ্যা ও ভুল প্রমাণের জন্য উত্তম দলীল। কেননা এরূপ মু'জিযা নবী-রাসূলদের দ্বারা কখনো কখনো প্রকাশিত হয়েছে ঠিক কিন্তু কোন আবেদা তা তাপসী মহিলার দ্বারা সম্ভব নয়। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃ. ৯)।

সুতরাং এ কারণেই ইব্‌ন কাসির (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখার জন্য উক্ত বর্ণনার দিকে মোটেই মনোযোগ দেননি আর নিঃসন্দেহে এটা মনোযোগের উপযুক্তও নয়।

এই সময় পরিক্রমায় হযরত শামাবীল (আ.) ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শিক্ষণীয় ও প্রজ্ঞার বিষয়

হযরত শামাবীল (আ.) তালূত ও দাঊদ (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনাবলীতে অসংখ্য শিক্ষণীয় ও প্রজ্ঞার বিষয় বিদ্যমান। তন্মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিন্তার উপযোগী বলে তুলে ধরা হলো ঃ

১. মহান আল্লাহ্ বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বভাব প্রকৃতিতে কতগুলো বিশেষত্ব দান করেছেন। যেমন, যখন কোন জাতির স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয় এবং কোন যালিম বাদশাহ্ দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাদের উপর অত্যাচার নিঃপীড়ন চালায়, তখন তারা তাদের স্বাধীনতা রক্ষা ও যালিমের যুলুম প্রতিরোধ করার জন্য আত্মকলহ, বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় শক্তির পাশে একতাবদ্ধ হবে এবং নিজেদের স্বার্থে

একজন যোগ্য, প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ নেতা অনুসন্ধান করবে; যাতে সেই অবিসংবাদিত নেতা তাদের অধঃপতনকে ঠেকাতে পারে এবং শক্তিমত্তার সাথে তা পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং বনী ইসরাঈল হযরত শামাবীলের কাছে তাদের জন্য একজন সেনানায়ক তথা বাদশাহ্ নির্বাচনের জন্য যে দাবী উত্থাপন করেছিল, সেটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষত্বের প্রতিফলন।

২. স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণের এ চেতনা জ্ঞান ও পূর্ণতার স্তর অনুসারে জাতি ও সম্প্রদায়ের বিশেষ কিছু লোকের মাঝে প্রথম সৃষ্টি হয়, অতঃপর ধীরে ধীরে তা সর্বসাধারণের মাঝেও বিস্তৃতি লাভ করে। কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ লোকের সংখ্যা যত বেশী থাকবে, সে জাতির চেতনা তত শীঘ্র ব্যাপ্তি লাভ করে।

৩. যখন কোন জাতির বিশেষ লোকদের মাঝে নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র রক্ষা এবং শত্রুর প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেতান খুব বেশী উন্নতি লাভ করে তখন তা জাতির সর্বসাধারণ ও অপরিণত জনতার মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করে। আর তখন শোষোক্ত জনগোষ্ঠি ধারণা করতে শুরু করে যে, আমাদের এ চেতনা ও জাতির উদ্দীপনা বিশেষ শ্রেণীর চেতনার চাইতে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু তাদের এ ধারণার সীমা অতিক্রম করে যখন কাজে পরিণত ও বাস্তবায়িত হবার ময়দানে উপনীত হয়, তখন তাদের অক্ষমতা ও অপরিপক্কতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর কিছু সংখ্যক সত্যবাদী ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোক ছাড়া ময়দানে আর কারো উপস্থিতিই তখন চোখে পড়ে না। সুতরাং এ বাস্তবতার পেক্ষিতেই কুরআনে উচ্চারিত হয়েছে এ শাশ্বত বাণী ঃ

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ –

"অতঃপর যখন তাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেয়া হলো, তখন তাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতিত সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৬)।

৪. জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন জাহেলী প্রথা ও কুসংস্কার, অমূলক ধারণা ও ভ্রান্ত আকীদা বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে এটা একটা ধ্বংসাত্মক ধারণা যে, সে ব্যক্তি নেতা বা বাদশাহ হবার একমাত্র উপযুক্ত যার প্রচুর ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য আছে, আছে অর্থ-সম্পদের খ্যাতি ও বংশ মর্যাদার আভিজাত্য। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে এ ধারণাটি এতই ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, তাহ্যীব তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধিতে যেসব জাতি আজ সবার

সেরা বলে বিবেচিত ও এসব বিষয়ের পতাকাবাহী, তারাও উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়ে মূর্খতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। এমনকি তার সাথে তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির রঙ মিশিয়ে জাহেলী যুগের চাইতেও ভ্রান্ত বিশ্বাসের অধিক প্রবক্তা সেজে বসেছে। বনী ইসরাঈলের চিত্র এ ভ্রান্ত আকীদা ও কুসংস্কারের রঙ থেকে মুক্ত ছিল না। এ কারণেই তারা তালূতের নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বলেছিল। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ –

"আমরা তার অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হক্‌দার এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয় নাই।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৭)

৫. তবে ইসলাম তাদের এহেন জাহেলী আকীদার বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, নেতৃত্ব ও রাজত্বের সাথে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের কোন সম্পর্ক আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃত নয়। আর বংশ গৌরব ও আভিজাত্যের উপরও এটা নির্ভরশীল নয়। বরং জ্ঞান ও দৈহিক শক্তির জন্য এমন দাবী করার অধিকার আছে যে, রাজত্ব নেতৃত্বের জন্য জ্ঞান ও শক্তি থাকা প্রধান শর্ত। কেননা অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সৎকর্ম ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য শর্ত। এগুলো ধনসম্পদ ও বংশীয় আভিজাত্যের দ্বারা সৃষ্টি হয় না বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টি হয়। তদ্রুপ বীরত্ব ও সৎসাহসিকতা রাষ্ট্র পরিচালনা ও নেতৃত্বের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। بَسْطَةً فِى الْجِسْمِ বাক্যের মাঝে এ সত্যটাই নিহিত আছে। কেননা بَسْطَةً فِى الْجِسْمِ কথার দ্বারা এরূপ বুঝানো হয়নি যে, ভাল ভাল প্রোটিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে চর্বিযুক্ত মোটাতাজা হয়েছে। বরং এর দ্বারা সেই দৈহিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে, তা জিহাদের ময়দানে শত্রুবাহিনীর সামনে ভীতি প্রদর্শনের কারণ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা ও দৃঢ় মনোবলের গুণে গুণান্বিত হতে পারে। কুরআন-শরীফ আরো বলেছে যে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কে বেশী হক্‌দার এ বিষয়টি দ্বীনের হকের একটি স্বতন্ত্র বিষয়। আর সব সময় জাহেলী ও ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সে বিষয়টি জাতির সামনে পুনঃপুনঃ তুলে ধরা হয়েছে। তারা যখনি এরূপ ভ্রান্তির মাঝে নিমজ্জিত হতো তখন তাৎক্ষণিকভাবে কোন নবী বা রাসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধিবর্গ সে জাতির ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিত এবং হিদায়েতের রাস্তা দেখাত। সুতরাং বনী ইসরাঈল যখন জাহেলী ধারণার বশবর্তী হয়ে তালূতের বিরুদ্ধে পূর্বে বর্ণিত ভুল দলীল পেশ করেছিল, তখন শামাবীল (আ.) অবিলম্বে তাদের সামনে প্রকৃত ব্যাপার তুলে ধরলেন।

এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَه بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ -

" আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৭)

৬. সত্য ও মিথ্যার মাঝে যখন সংঘাত সৃষ্টি হয় আর সত্যের সপক্ষে একদল নিষ্ঠাবান, উৎসর্গীকৃত প্রাণ ও প্রেরণায় উজ্জীবিত লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের ভেতর আত্মনির্ভরশীলতা ও আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত থাকে, তখন বিজয় ও সাফল্য তাদের সংখ্যাল্পতা ও সংখ্যাধিক্যের মানদণ্ডে নির্ণীত হয় না, বরং তখন অল্প সংখ্যক লোক বিপুল সংখ্যক বাহিনীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সংখ্যায় অধিক থাকা বিরোধী দল অল্প সংখ্যার হাতে পরাজিত হতে বাধ্য হয়। এর বাস্তবতা সম্পর্কে কুরআন শরীফ আলোকপাত করেছে এভাবে ঃ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ -

"আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৯)

হযরত দাঊদ আলাইহিস্ সালাম

বংশ তালিকা

বিগত আলোচনায় হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে হযরত দাঊদ (আ.) জালূতকে হত্যা করার পর তাঁর অসম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রকাশ পায়। ফলে বনী ইসরাঈলের মনের মণিকোঠায় দাঊদের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ মুদ্রাংকনের মতই স্থায়ীভাবে গেড়ে বসে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ.) পরবর্তীতে আল্লাহর মনোনীত রাসূলের মর্যাদা লাভ করেন। বনী ইসরাঈলের হিদায়েতের জন্য তিনি রাসূল আর তাদের সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য খলিফা নিযুক্ত হন। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত দাঊদের বংশ বালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

দাঊদ পিতা- এইশাকব এইশী, পিতা-আউবাদ, পিতা-আবের, (অথবা আবেয) পিতা- সালমুন, পিতা-নাহশুন, পিতা-উআইনাযেব, পিতা- আরম, পিতা-হাসরুল, পিতা-ফারেস, পিতা- ইয়াহুদা, পিতা-ইয়াকূব, পিতা-ইসহাক, পিতা- ইব্রাহীম (আ.)। উক্ত তালিকায় যেসব নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলো ইব্ন জারীর (র) থেকে সংগৃহীত। সা'লাবী (র) তাঁর 'আরাইসুল বায়ান' গ্রন্থে কোন কোন নামের জায়গায় অন্য নাম উল্লেখ করেছেন। তবে সবাই এ ব্যাপারে একমত যে হযরত দাঊদ (আ.) ইসরাঈলী গোত্রে ইয়াহুদার বংশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। (তারীখ ইব্ন কাসীর , ২য় খণ্ড, পৃ. ৯)

তাওরাতে বর্ণিত আছে, এইশা বা এইশির অনেকগুলো ছেলে ছিল। দাঊদ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ ছেলে। (শ্যামুয়েলের পুস্তক)

দৈহিক গঠন ও আকৃতি

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, দাউদের দৈহিক উচ্চতা ছিল মধ্যমাকৃতির হাল্‌কা নীলাভ চোখ, শরীরে অল্প অল্প লোম। আর তার চেহারা মুবারকে নির্মল অন্তর ও পুত পবিত্র স্বভাবের আভা প্রস্ফুটিত হত। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০)

পবিত্র কুরআনে দাউদের বর্ণনা

কুরআনে শরীফের নিম্নে বর্ণিত সূরাসমূহে হযরত দাউদ (আ.)-এর আলোচনা বিদ্যমান। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, বনী ইস্‌রাঈল, আম্বিয়া, নাম্‌ল, সাবা ও সূরা সাদ। উক্ত সূরাসমূহে ১৬টি জায়গায় তাঁর নাম উল্লেখ আছে। কতগুলোতে সংক্ষিপ্তভাবে আর কতক স্থানে বিস্তারিতভাবে তাঁর ঘটনা, অবস্থা এবং হিদায়েত দানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে নিম্নের ছকটি উপস্থাপন করা হলো ঃ

সূরা	আয়াত	সংখ্যা
বাকারা	১০২,২৫১	২
নিসা	১৬৩	১
মায়িদা	৭৮	১
আন'আম	৮৪-৯০	৭
বনী ইসরাঈল	৫৫	১
আম্বিয়া	৭৮-৮২	৫
নাম্‌ল	১৫-৪৪	২৯
সাবা	১০, ১৪	২
সাদ	১৭-২৬	১৯
সর্বমোট–	৩০-৪০	৬৭

নবুওয়াত ও রিসালত

হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের গভীর ভালবাসার ফলে তালূতের জীবদ্দশায় অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর রাজত্বের চাবি দাউদের হাতে এসে যায়, সাথে সাথে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবুওয়াত ও রিসালতের

মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। হযরত দাউদের পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব ও নবুওয়াত বনী ইসরাঈলের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে প্রদানের প্রথা চালু ছিল। সে সুবাদে ইয়াহুদার অধঃস্তন গোত্রে নবুওয়াতের ধারা এবং আফরাহীমের গোত্রের রাজত্বে ধারা। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০)

হযরত দাউদ (আ.) প্রথম ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ দু'টি নিয়ামত একত্রে প্রদান করেন। তিনি একাধারে আল্লাহ্র নবী ও রাসূল এবং সাথে সাথে সিংহাসন ও মুকুটধারী সম্রাট। সুতরাং কুরআন শরীফে দাউদের মর্যাদা সম্পর্কে এ আয়াতগুলো প্রনিধাণযোগ্য ঃ

اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ

"আল্লাহ্ তাঁকে কর্তৃত্ব ও হিক্মত দান করেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ –

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি।" (সূরা সাদ ঃ ২৬)

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا

"তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৯)

নবী-রাসূলদের মধ্যে হযরত আদম (আ.) ব্যতিত একমাত্র দাউদকে কুরআন শরীফে খলীফা (প্রতিনিধি) উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করা হলে হযরত দাউদের এহেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণ হিসেবে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বিষয় সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে, বনী ইসরাঈলের মাঝে স্থায়ীভাবে চালু শতাব্দীকালের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে হযরত দাউদ (আ.)কে যখন নবুওয়াতের সাথে রাজত্ব একত্রে প্রদান করা হয়। তখন তাঁকে এমন একটি উপাধিতে সম্বোধন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যার মধ্যে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্র জ্ঞান ও কুদরতী গুণাবলী প্রকাশিত হয়। এটা সর্বজনবিদিত যে, বর্ণিত গুণাবলীর প্রেক্ষিতে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় 'খলীফা' শব্দের চাইতে মানানসই শব্দ দ্বিতীয়টি নাই। মোটকথা হযরত দাউদ (আ.) বনী ইসরাঈলের হিদায়েত ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্বের পাশাপাশি তাদের সামাজিক জীবনের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করতেন।

বিশাল রাজত্ব

পবিত্র কুরআন, তাওরাত ও ইসরাঈলী ইতিহাস এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বীরত্ব, সাহসিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত, চিন্তা-গবেষণা ও কর্মদক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত দাঊদ (আ.) ছিলেন একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যার ফল বিজয় ও সাফল্য সবসময় তাঁর পদচুম্বন করত। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর উপর এতই বর্ষিত হত যে, শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় তাঁর বাহিনী যত ক্ষুদ্রই থাকত না কেন, বিজয়ের মালা তাঁরাই ছিনিয়ে আনত। যে কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন ও পূর্ব জর্দানের সমগ্র অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈলা (আকাবা উপসাগর) থেকে শুরু করে ফুরাত নদীর তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চল এমনকি দামেশ্ক পর্যন্ত তাঁর অধীনে ছিল। হিজায অঘোষিতভাবে তাঁরই রাজ্যাধীন ছিল। এটাকেও তাঁর রাজত্বের অংশ ধরা হলে অংশীদারহীন দাউদের বিরাট রাজ্যসীমাকে সাম জাতির সর্ববৃহৎ একক সামাজ্য ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। আধুনিক ইতিহাসের জাতি তত্ত্বের দর্শন অনুযায়ী দাউদের সাম্রাজ্যকে একক আরব জাতি তত্ত্ব বা তার চাইতেও প্রশস্ত একক সাম জাতি তত্ত্বের সাম্রাজ্য বলা চলে। তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী, সাম্রাজ্যের আয়তনের ব্যাপকতা ও প্রশস্ততার পাশাপাশি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর মর্যাদা তাঁর মহত্ত্ব, সম্মান ও পরাক্রমশালীকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। প্রজা সাধারণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, যদি দাউদের সামনে কোন সমস্যা পেশ করা হয় কিংবা কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় অথবা মিথ্যার রঙে রঞ্জিত কোন বানোয়াট বিষয় উপস্থিত করা হয়, তাহলে তিনি ওহীর মাধ্যমে তার সমাধান কিংবা বাস্তব ঘটনা উপলব্ধি করবেনই। কাজেই জ্বিন বা মানুষ কারো পক্ষে তাঁর ফায়সালার বিরোধিতা বা অমান্য করার সাহস ছিল না। এ পর্যায়ে ইব্ন কাসীর (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেনঃ একদা দু'জন লোক একটি ষাড়ের মালিকানা নিয়ে মুকাদ্দমা পেশ করতে দাউদের কাছে আসে। উভয়ে দাবী করে যে, এটা আমার ষাড়, অপর ব্যক্তি তা আমার কাছ থেকে লুট করে নিয়ে যেতে চায়। হযরত দাঊদ (আ.) তাদের মুকাদ্দমার ফায়সালা দেবার জন্য পরদিন আসার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় দিন তিনি বাদীকে বলেন, তোমাকে হত্যা করার জন্য রাতের বেলা আল্লাহ্ আমার কাছে ওহী পাঠিয়েছে। সুতরাং তুমি সত্য ঘটনা খুলে বল। বাদী বলল, আপনি সত্যিই আল্লাহ্র নবী। ষাড়ের ব্যাপারে আমার দাবী অকাট্য সত্য ও যথার্থ। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি বিবাদীর পিতাকে প্রতারণা করে হত্যা করেছি। এ কথা শুনে হযরত দাঊদ (আ) কিসাস স্বরূপ তাকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন। (তারীখে ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২) বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর প্রজ্ঞাময় কর্তৃত্বের কারণে

হযরত দাঊদ (আ.)-এর শাসন ক্ষমতা ও মহানুভবতার সামনে সবাই বিনীত ও অনুগত থাকত। কুরআন শরীফের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে হযরত দাঊদ (আ.) এর মহান শাসন ব্যবস্থা, প্রজ্ঞাময় বিচারবুদ্ধি ও নবুওয়াত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ -

"আর আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা। (সূরা সাদ ঃ ২০)

এ আয়াতেও পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে হিক্‌মত শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। এ প্রশ্নটি মুফাস্‌সিরদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচনা সাপেক্ষ। আমাদের মতে পূর্ববর্তী মনীষীদের ব্যাখ্যানুযায়ী এর সারকথা হলো, হিক্‌মত বলতে এখানে দু'টি অর্থ বুঝানো হয়েছে। প্রথমত, নবুওয়াত, দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার বিশেষ স্তরকে বুঝানো হয়েছে। যার বদৌলতে কোন ব্যক্তি সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথকে কখনোই বেছে নিতে পারে না। কতক আলিম আলিম হিক্‌মত শব্দ দ্বারা যাবূরকে বুঝিয়েছেন। অনুরূপভাবে فصل خطاب দ্বারা দু'টো বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

১. ভাষণ ও বক্তৃতার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণদক্ষতা ছিল। তিনি যখন ভাষণ দিতেন তখন শব্দগুলোকে পৃথকভাবে স্পষ্ট করে এত সাজিয়ে গুছিয়ে বলতেন, যার অর্থ ও মর্মবাণী সবার আয়ত্তে এসে যেত। তাঁর বক্তৃতার ভাষা খুবই বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও উচ্চাঙ্গের ছিল।

২. সত্য ও মিথ্যার মাঝে তিনি যে হুকুম ও ফায়সালা পেশ করতেন, সেগুলো সত্য ভাষণের ও বাগ্মিতার রূপ পরিগ্রহ করত।

যাবূর

বনী ইসরাঈলকে হিদায়েত করার জন্য তাওরাত ছিল মৌলিক ও প্রধান উৎস ও উপাদান। কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময় পরিবর্তনের কারণে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হযরত দাঊদ (আ.)-এর উপর যাবূর অবতীর্ণ হয়। তাওরাতের মূলনীতি ও বিধিমালা অপরিবর্তিত রেখে ইসরাঈলদের হিদায়েতের জন্যেই যাবূর প্রেরিত হয়। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর শরী'আতকেই নতুনভাবে সঞ্জীবিত করেন বনী ইসরাঈলকে সঠিক পথের সন্ধান দেন। তিনি ওহীর আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে আল্লাহর মারিফাতের তৃষ্ণার্তদের পিপাসা নিবারণ করেন। যাবূর ছিল আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা গীতিতে ভরপুর। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ)-কে সুমধুর ও সুললিত কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন।

তিনি যখন তাঁর যাদুকরী অনন্য মধুর কণ্ঠে যাবূর পাঠ করতেন তখন জ্বিন-মানুষ এমনকি পশু পাখি পর্যন্ত (আল্লাহ্র উপস্থিতি বুঝে) বিমোহিত হয়ে পড়ত। যে কারণে আজো হযরত দাঊদ (আ)-এর 'সুমধুর কণ্ঠ' কথাটি প্রবাদ বাক্য হিসেবে পরিচিতি। বিখ্যাত লেখক আবদুর রায্যাক (র) তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-র মধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে বলতেন, মহান আল্লাহ্ আবূ মূসাকে দাঊদের অনুরূপ কণ্ঠস্বর দান করেছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১)

'যাবূর' শব্দের আভিধানিক অর্থ পারা বা অংশ বিশেষ। যেহেতু তাওরাতের পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে যাবূর নাযিল হয়েছিল। সুতরাং যাবূর তাওরাতেরই একটা পারা বা অংশ বিশেষ। যাবূর ছিল কতগুলো ছন্দময় কবিতার সমষ্টি। সে গীতি কবিতাগুলো আল্লাহ্র হামদ ও প্রশংসা, মানবীয় দাসত্ব ও অপরাগতার স্বীকারোক্তি, উপদেশ নসীহত ও জ্ঞানগর্ভ শিক্ষণীয় বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল। মুসনাদে আহ্মাদে বর্ণিত আছে যে, "যাবূর নাযিল হয়েছিল রমযান মাসে, আর সেটা ছিল ওয়ায নসীহত ও জ্ঞানগর্ভ কাব্যগীতিতে পরিপূর্ণ।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২)

এছাড়া যাবূরে ভবিষ্যদ্বাণী ও কিছু কিছু সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল। কাজেই কোন কোন তাফসীরকার বলেন, নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে যাবূর সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা মূলত নবী করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে সুসংবাদ।

এ আয়াত তাঁর সুস্পষ্ট প্রমাণ আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ -

"আমি উপদেশের পর যাবূর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাওরাত, ইনজীল ও যাবূরকে আল্লাহ্র ওহী এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এরূপ ঘোষণাও দেয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল দেখেশুনে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে আল্লাহ্র কিতাবগুলোকেই পরিবর্তন করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের মর্জি মাফিক বিকৃতি করেছে। অবশেষে সেগুলোর প্রকৃত বিষয়ের উপর এতবেশী আবরণ পড়েছে যে, মৌলিক ও কৃত্রিমের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা খুব কঠিন, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ –

"কতক ইয়াহূদী বাক্যগুলোকে তার স্থান থেকে বিকৃত করে।" (সূরা মায়িদা : ৪১)

সুতরাং তাওরাত ও ইনজীল ছাড়াও এ ব্যাপারে যাবূর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও জীবন্ত সাক্ষী। বর্তমান যাবূরে বিভিন্ন বিকৃত অধ্যায়ের সংখ্যা ১৫০ টি। আহলে কিতাবের পরিভাষায় এগুলোকে 'মাযবুর' বলা হয়ে থাকে। এসব অধ্যায়ের শিরোনাম থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এর মধ্যে সবগুলো হযরত দাউদ (আ)-এর 'মাযবুর' নয়। কেননা এদের কতগুলোতে দাউদের নাম বিদ্যমান আর কতগুলোতে আছে সঙ্গীত বিশারদ উস্তাদ কাউরাহর নাম। এছাড়া কতগুলোতে শুশিনামের নাম, আসেফের নাম ও গাতীতের নাম রয়েছে। আর কতগুলোতে কোন নামই নাই। আবার অনেকগুলো মাযবুর হযরত দাউদ (আ)-এর কয়েক শতাব্দী পরে রচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি মাযবুর নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

"হে সদাপ্রভু! এ জাতির লোকেরা তোমার অধিকারে ঢুকে পড়েছে। তারা তোমার পবিত্র মন্দিরকে অপবিত্র করেছে আর জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে।" (মাযবুর ঃ ৭৯ -৮৪)

কুখ্যাত বনু কদরযর বা বুখতে নসর বনী ইসরাঈলের উপর ভয়াবহ আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। উক্ত মযবুরটি সেই ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে রচিত। আর এ বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট যে, বুখতে নসরের জেরুজালেম ধ্বংসের ঘটনা সংঘটিত হয় হযরত দাউদ (আ)-এর কয়েক শতাব্দী পরবর্তী সময়ে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর উপর যাবূর নাযিল করেন এবং তাঁর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে হিদায়েতের বাণী শোনান। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

"আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি, দাউদকে আমি যাবূর দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫)

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا "আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছি।" (সূরা নিসা ঃ ১৬৩)

বুখারী শরীফে 'কিতাবুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ.) পূর্ণ যাবূর অতি অল্প সময়ে তিলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি যখন ঘোড়ার গদি আটাতে শুরু করতেন সাথে সাথে তিলাওয়াত শুরু করতেন। এ কাজ শেষ হবার সাথে যাবূর তিলাওয়াত শেষ হয়ে যেত।

হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কে কুরআন ও তাওরাত

হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারে কুরআন ও তাওরাতের মাঝে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কুরআন শরীফ হযরত দাঊদ (আ.)-কে একাধারে পরাক্রমশালী ও খ্যাতনামা বাদশাহ্ বলে স্বীকার করে সাথে সাথে তাকে একজন সম্মানিত রাসূল হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তাওরাত তাঁকে শুধু কিং দাঊদ বা সম্রাট দাঊদ হিসেবেই স্বীকার করে, রাসূল হিসেবে নয়। মূলত তথাকথিত তাওরাত হচ্ছে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা ও ভিত্তিহীন কথার সমষ্টিমাত্র। যা এমন কতগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী, যেগুলোর সম্পর্কে বহুবার প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে এসব ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

হযরত দাঊদ (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য

মহান আল্লাহ্ সব নবী-রাসূলকেই বিশেষ মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন এবং তাদের অসংখ্য নিয়ামত ও অনুগ্রহ দিয়ে বিভূষিত করেছেন। তদুপরি সম্মান-মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের স্তর অনুসারে তাঁদের মাঝেও যথেষ্ট পার্থক্য রেখেছেন। আর এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের স্তরই একজনকে অন্যজন থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"এই রাসূলগণ, তাঁদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৩)

সুতরাং কুরআন শরীফে হযরত দাঊদ (আ.)-এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র রাসূলকে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে সমাসীন করেছেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূলদের বৈশিষ্ট্য বুঝাতে গিয়ে এমন তর্কশাস্ত্রীয় তথ্য বুঝানো হয়নি যে, এসব গুণাবলী অন্য কারো মাঝে আদৌ পাওয়া যাবে না; কিংবা এগুলো কেবলমাত্র বর্ণিত ব্যক্তিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। বরং এক্ষেত্রে তাঁদের বৈশিষ্ট্য বলতে সেসব গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে যেগুলো তাঁদের মাঝে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। আর উক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা শুনলেই মস্তিষ্ক অবিলম্বে সেই ব্যক্তির প্রতি নিবিষ্ট হয়; যদিও কোন কোন অবস্থায় বিশেষ গুণটি অন্য কোন নবীর মাঝেও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

পাহাড় পর্বত ও পশু পাখি বশীভূত এবং তাদের তাসবীহ্ পাঠ

হযরত দাঊদ (আ.) আল্লাহ্র গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় খুব বেশী মশগুল থাকতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মধুর। তিনি যখন যাবূর পাঠ করতেন অথবা আল্লাহ্র তাসবীহ্-তাহ্লীলে মশগূল হতেন তখন তাঁর অস্তিত্ব বিলীনকারী মধুর সুর ধ্বনিতে কেবলমাত্র মানুষই নয় বরং পশুপাখি পর্যন্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে যেত এবং তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে প্রশংসা গীতি শুরু করত। সুরেলা কণ্ঠে ও হৃদয় উজাড় করা কলধ্বনিতে দাঊদের প্রশংসাগীতির সাথে সমবেত সবাই সুর মিলাত। শুধু তাই নয় বরং পাহাড় পর্বত ও আল্লাহ্র প্রশংসায় প্রতিধ্বনিত হত। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ.)-এর এ বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে কুরআনের সূরা আম্বিয়া, সাবা ও সাদে আলোকপাত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ –

"আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন তারা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আর আমিই ছিলাম এসব কিছুর কর্তা।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৯)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ –

"আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং আদেশ করেছি, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকেও!" (সূরা সাবা ঃ ১০)

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَهٗ اَوَّابٌ –

"আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এবং সমবেত বিহংগকুলকেও সকলেই ছিল তার অনুগত।" (সূরা সাদ ঃ ১৮-১৯)

কোন কোন মুফাস্সির এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পশু-পাখির ও পাহাড় পর্বতের তাসবীহ্-তাহ্লীল ছিল প্রকৃতির ভাষায়। বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর টিকে থাকা, এর সংযোজন এবং ক্ষুদ্রমৌলিক কণাগুলো যেন আল্লাহ্র সর্ব-শক্তিমত্তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর এ প্রাকৃতিক পরিবেশটাই তার তাসবীহ্ ও প্রশংসাগীতি। যদিও আপেলের প্রাকৃতিক ভাষা নেই আর বাকশক্তি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এর সুগন্ধ ও কোমলতা এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা পৃথক

পৃথকভাবে ডেকে বলছে ঃ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ "কল্যাণময় আল্লাহ্ কত সুন্দর স্রষ্টা।' (আল-কুরআন)

ইমাম রাযী (র.) এ মত পোষণ করেছেন এবং একে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন দার্শনিক তত্ত্ব ও দলীল উপস্থাপন করেছেন যা যুক্তি ও শরঈ দলীল উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত জোরালো। (তাফসীরে কাবীর, ৫ম খণ্ড, সূরা বনী ইস্‌রাঈল দ্রষ্টব্য)

আমাদের কখনই এ বাস্তব সমাজকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, কুরআন পাকের দলীল পরিবেশন পদ্ধতি কোন দার্শনিক খুঁটিনাটির অধীনস্থ নয়। যা কেবলমাত্র ধারণা ও আনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে গ্রীক দর্শনের অনুমানভিত্তিক কোন মূলনীতি যদি দাঁড় করান হয়। অতঃপর কুরআনের সুস্পষ্ট ও সরল বিষয়-বস্তুকে সে দর্শনের ছাঁচে পরখ করা হয়, তাহলে এরূপ প্রচেষ্টাকে কুরআন মেনে নেবে না।

এ ধারণার বিপরীত মুহাক্কিক আলিমদের অভিমত এই যে, প্রাণীজগত উদ্ভিদ জগত ও জড়জগত বাস্তবিকই তাসবীহ্-তাহ্‌লীল করে। তাদের তাসবীহ্ তাহ্‌লীলের মানে এই নয় যে, তাদের স্বাভাবিক ভাষার মাধ্যমে প্রজ্ঞাশীল স্রষ্টার প্রমাণ করবে আর এটাই তাদের তাসবীহ্। কেননা কুরআন পাকে সূরা বনী ইস্‌রাঈলের সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যা তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

এ আয়াতে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করা যায়- ১. বিশ্বের প্রতিটি বস্তু তাসবীহ্ পাঠ করে। ২. মানুষ ও জ্বিন তাদের তাসবীহ্ উপলব্ধি করতে পারেনা। কাজেই আল্লাহ্ যেহেতু আসমান যমীন সহ বিশ্বের সমুদয় সৃষ্টি-প্রাণী জগত, উদ্ভিদ ও জড়জগতের প্রতি তাসবীহ্ পাঠের সম্বন্ধ করেছেন। সুতরাং এদের সৃষ্টি স্বভাবেই তাসবীহ্ অপরিহার্য। এ বার পরবর্তী বাক্যকে এর উপর প্রয়োগ করা হলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, জ্বিন ও মানুষ তাদের তাসবীহ্ বুঝতে বা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তবে এ জায়গায় তাসবীহ্ শব্দের মূল অর্থ না নিয়ে যদি স্বভাবগত পরিবেশের

ভাষায় ও তাসবীহ্ গ্রহণ কর হয়, তাহলে কুরআনের এ আয়াত وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (আর তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পারনা) যথার্থ হবে কি ভাবে?

কেননা বিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র কণা পর্যন্ত এক আল্লাহ্র অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে, কোন নাস্তিক যদি এটা নাও বুঝে; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মানুসারী বিশেষ করে মুসলামান মাত্রই তা বুঝতে পারে নিঃসন্দেহে। কেউ যদি কখনো স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে তখন সে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করেই চিন্তা করে যে, বিশ্বজগতের প্রতিটি কণা তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করছে এবং প্রতিটি বস্তুর টিকে থাকাই বিশ্ব স্রষ্টার সঠিক সন্ধান দিচ্ছে।

ইব্ন হাযম (র) তাঁর রচিত 'আল-ফাসল' নামক গ্রন্থে এ খানে একটি সন্দেহের অবতারণা করেছেন, আর সেটা হলো এই, যদি প্রাণী উদ্ভিদ ও জড়গতের তাসবীহ্কে মূল অর্থেই তাসবীহ্ বুঝানো হয়, তাহলে স্বভাবতই এ অভিযোগটি উত্থাপিত হতে পারে যে, একজন নাস্তিক সেও সৃষ্টবস্তুর অন্তর্ভুক্ত ; আয়াতের অর্থ দ্বারা সাধারণকে বুঝানো কিরূপ যথার্থ হবে ?

ইব্ন হাযমের অভিযোগটি খুবই সাধারণ মানের। কেননা এ অভিযোগ উত্থাপনের সময় কুরআনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করা থেকে তাঁর মস্তিষ্ক উদাসীন ছিল বলে অনুমিত হয়। এ ছাড়া তিনি আয়াতের মূল আলোচ্য বিষয়ের পূর্বাপর সম্বন্ধেও চিন্তা করেন নাই। কুরআন শরীফ উক্ত আয়াতের পূর্বে মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা করার পর মুসলমানদের সম্বোধন করে বলছে যে, মুশরিকরা নিজেদের নিবুর্দ্ধিতা ও ভুল বুঝাবুঝির দরুন আল্লাহ্র সাথে বাতিল মাবূদদের শরীক করছে। কিন্তু তাদের এ কাজটিকে কুরআন যতই ভ্রান্ত বলে আলোকপাত করত এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করত; তারা ততই নসীহতের বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিত এবং পূর্বের চাইতে অধিক ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ শুরু করত। অথচ এটাতো বাস্তব সত্য যে, মুশরিকরা যেসব বাস্তবকে আল্লাহ্র দিকে সম্বন্ধ করে তিনি সে সব বাতিল সম্বন্ধ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান। অতঃপর কুরআন বলছে যে, একমাত্র মানব জাতিই এ ধরনের শিরকের ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, নতুবা সাত আসমান যমীনের মাঝে যত সৃষ্টবস্তু রয়েছে সবাই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে এবং শিরক থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। কিন্তু মানুষ তাদের তাসবীহ্ অনুধারণ করতে অপারগ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সহনশীল ও ক্ষমাশীল।

৫—

অতঃপর মুশরিকদের বাতিল আকীদার পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা) যখন কুরআন পাঠ করেন তখন আমি (আল্লাহ্) তাঁর ও মুশরিকদের মাঝে একটা আবরণ সৃষ্টি করে দিই।

অর্থাৎ তারা যেহেতু কুরআনকে আল্লাহ্র বাণী হিসেবে স্বীকার করছে না ; সেহেতু আপনাকেও তারা রাসূল বলে মেনে নিচ্ছে না। ফলে আপনার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আখিরাতের পরিণাম থেকে ও তারা অমুখাপেক্ষী হচ্ছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلاَّ نُفُوْرًا- قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لاَّبْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلاً سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ - وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا- وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

"এই কুরআনে বহু বিষয় আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। বল, তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে আরো ইলাহ্ থাকত তবে তারা আরশ অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। সপ্ত আসমান, পৃথিবী এবং এদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না, তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই"। (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ৪১-৪৫)

কুরআন শরীফের এ বিবরণ ও পূর্বাপর আলোচনা পাঠ করলে ইবন হাযমের পক্ষে সন্দেহ পোষণ করার কোন ক্ষেত্রই অবশিষ্ট থাকত না। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সাথে শরীক করার মত অপবিত্র ধৃষ্টতা কেবল মানব জাতিই প্রদর্শন করছে; কেননা মানুষ হলো পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির সমষ্টি। একমাত্র মানব জাতি ব্যতীত বিশ্বজগতের সমুদয় সৃষ্টি আল্লাহ্র সামনে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলার ঔদ্ধত্য দেখায় না, আর তাই তারা সর্বদা তাঁর পবিত্রতাই

বর্ণনা করছে, তাসবীহ্ তাহলীল করা তাদের চিরাচরিত একমাত্র অভ্যাস। শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (র.) মুহাক্কিক আলিমদের অভিমতকে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণিক দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম (সা.) ২টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, কবরবাসীদের আযাব হচ্ছে। সুতরাং তিনি একটি গাছের সবুজ শাখাকে দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করে উক্ত কবর দু'টিতে রোপণ করে দিয়ে বললেন, যতদিন পর্যন্ত এ ডালগুলো না শুকাবে ততদিন কবরবাসীর আযাব থেকে মুক্ত থাকবে।" সুতরাং আলিমগণ এ আয়াত وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ "এমন কোন পদার্থ নাই যা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে না"। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "প্রতিটি জীবিত বস্তুই আল্লাহ্র প্রশংসা করে। আর সব স্তর স্তর অনুযায়ী জীবন আছে। উদ্ভিদ জগত যতদিন সবুজ থাকে ততদিন জীবিত আর শুকিয়ে গেলে মৃত বলে ধরে নিতে হয়। পাথর (কঠিন জড় পদার্থ) যতদিন অক্ষত ও নিরাপদ থাকে ততদিন জীবিত আর টুকরো টুকরো হয়ে গেলে মৃত সে। উক্ত আয়াতের এ সাধারণ অর্থই মুহাক্কিক আলিমগণের অভিমত। তবে এসব পদার্থ বাস্তবিকই তাসবীহ পাঠ করে নাকি তাদের স্ব স্ব অবস্থায় স্রষ্টার প্রমাণ দেয়াই তাদের তাসবীহ, এ ব্যাপার মতভেদ আছে। মুহাক্কিক আলিমদের অভিমত হচ্ছে এই যে, পদার্থগুলো বাস্তবিকই তাসবীহ পাঠ করছে। আর যেহেতু যুক্তিশাস্ত্র এটাকে অসম্ভব মনে করেনা, শরী'আতের দলীল ও স্পষ্টত এর সপক্ষে বক্তব্য পেশ করছে; সুতরাং মুহাক্কিকদের অভিমত গ্রহণ করাই উচিত।" (আইনী শারহে বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭৪)

কুরআনের দলীল তো সামনেই আছে, কিন্তু যুক্তিশাস্ত্র এটাকে অসম্ভব বলে মনে করে কেন ? যুক্তিশাস্ত্র থেকেই এর রায় নেয়া উচিত। আধুনিক যুগের যুক্তিবাদীগণ এ ব্যাপার একমত যে, কথাবার্তার জন্য ভাষার দরকার নেই। যদি কোন পদার্থের মাঝে প্রাণ ও শব্দ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার পক্ষে কথাবলার সম্বন্ধ সঠিক। সুতরাং গ্রীক দার্শনিকগণ বলেন, প্রাণীজগতের মাঝে প্রাণ আছেই, ক্ষুদ্রকণার ভেতরেও অনুভূতিশক্তি আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে উদ্ভিদের মাঝে যে প্রাণ ও অনুভূতি আছে এটা তো প্রদর্শন করা হচ্ছে। এমনকি অনুকণার বিভাজন ও আজ গবেষণায় এসেছে। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করা মাত্রই ম্লান হয়ে মিলিয়ে যায় এবং হাত পৃথক করলেই পুনরায় সজীব হয়ে উঠে। 'মানুষ খেকো গাছ'- এর কাছে কোন মানুষ কিংবা পশু আসলে সে উপলব্দি করতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ ডালপালা প্রসারিত করে তাকে আকড়ে ধরে এবং নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসে। এ দৃশ্য তো বর্তমানে হরহামেশাই দেখা যায়। বিখ্যাত

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী মিঃ বসু কলকাতায় একটি বাগান তৈরী করেছেন। সেখানে আল্লাহ্‌র অপার কুদ্‌রত প্রদর্শন করা হয়। কিভাবে গাছ অসুস্থ হয় আবার কিভাবে সুস্থ হয়ে উঠে। কোন কোন গাছ অন্য গাছকে ঘৃণা করে, আর কতক গাছ অন্য গাছকে তার দিকে আকৃষ্ট করে তাও প্রদর্শিত হয়। এমনকি অনেক বিজ্ঞানী আজ দাবী করছেন যে, জড় পদার্থের ভেতরও অতিসূক্ষ্ম, দুর্বল ও অনুভূতিশীল প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে প্রাণের তত্ত্বাবধানেই সে বেড়ে উঠে।

মোটকথা যুক্তি ও দলীল প্রমাণ উভয় দিক থেকেই কুরআনের এ বাণী "বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রশংসা করছে", যথার্থভাবেই প্রমাণিত। সুতরাং তাসবীহ্ পাঠের সাথে পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত কথাটি লাগিয়ে ব্যাখ্যা করা বাহুল্য মাত্র। তবে তাদের তাসবীহ্-তাহ্‌লীলকে মানুষের সাধারণ অনুধাবণ ক্ষমতার বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নবী-রাসূলগণ তাঁদের তাসবীহ্ কখনো কখনো উপলব্দি করতে পারতেন। তখন এটা তাদের মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হত। যেমন হযরত দাঊদ (আ.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ছিল যে, তিনি যখন সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র হামদ-সানা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতেন, তখন পশু-পাখি ও পাহাড় পর্বত তাঁর সাথে উচ্চস্বরে সমবেতভাবে তাসবীহ্-তাহ্‌লীল পাঠ শুরু করতো। হযরত দাঊদ (আ) এবং এরা সবাই একে অপরের তাসবীহ্ শুনত। হযরত দাঊদ (আ)-এর এ বিশেষত্ব সম্পর্কে কুরআনের সূরা আম্বিয়া, সাবা ও সাদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যপন্থী আলিমদের মধ্যে যাঁরা সূরা বনী ইসরাঈলের উক্ত আয়াতে বর্ণিত জ্বিন ও মানুষ ব্যতিত অন্যান্য বস্তুর তাসবীহ্‌কে 'স্বাভাবিক হাল' বলে মত প্রকাশ করেছেন,তাঁরাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে হযরত দাঊদ (আ.)-এর ব্যাপারটি ছিল অসাধারণ বা মু'জিযা। আর প্রাণীকুল ও জড়পদার্থের তাসবীহ্ পাঠ ছিল যথার্থ। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মু'জিযা ছিল স্বাভাবিক পদ্ধতির। কেননা পাথর কলেমা পড়েছিল এবং উস্তুনে হান্নানা-খেজুর গাছের কাণ্ড ক্রন্দন করেছিল এবং বিভিন্ন পশু হরিণ ইত্যাদি তাঁর সাথে কথা বলেছিল বলে প্রমাণিত।

হযরত দাঊদ (আ.)-এর হাতের স্পর্শে লোহা নরম হয়ে যেত

বিরাট কর্তৃত্বের অধিকারী এবং মহান সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও হযরত দাঊদ (আ.) রাজকোষ থেকে কোন ভাতা বা পারিতোষিত গ্রহণ করতেন না। নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের ভার তিনি বায়তুল মালের উপর ছেড়ে দিতেন না। বরং তিনি মেহনত করে নিজ হাতের উপার্জন দিয়ে হালাল জীবিকার ব্যবস্থা করতেন। হযরত দাঊদ (আ.)-এর এ মহৎ গুণ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ –

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার চাইতে উত্তম জীবিকা কেউ কখনো গ্রহণ করেন নি, আর আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ.) নিজ হাতের উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করতেন।"

শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, হযরত দাঊদ (আ.) সব সময় এই বলে দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ্! আমার জন্য এমন একটি উপায় বের করে দিন যাতে আমার নিজ হাতে উপার্জন করা সহজ হয়ে যায়; কেননা আমি বায়তুল মালের উপর আমার জীবিকার ভার অর্পণ করতে চাই না।" (আইনী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২০)

মূলত হযরত দাঊদ (আ.)-এর এ পবিত্র চেতনা ছিল তাঁর নবুওয়াতী বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এসব বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন শরীফে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সমস্ত নবী রাসূলদের হিদায়েত সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক নবী যখন তাঁদের উম্মাতকে আল্লাহ্‌র বাণী শোনাতেন তখন সাথে সাথে বলতেন ঃ

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ –

"আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আছে।" (সূরা শু'আরা ঃ ১৮০)

হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) বলেন, বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসের লক্ষ্য হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফার জন্য 'বায়তুল মাল' থেকে জীবিকা নির্বাহের সম পরিমাণ বৃত্তি গ্রহণ করা যদিও জায়িয; কিন্তু তবুও তাঁর উপর বোঝা সৃষ্টি না করাই উত্তম। সুতরাং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে বায়তুল মাল থেকে বৃত্তিস্বরূপ যে অর্থ নিয়েছিলেন ইন্তিকালের সময় অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করেন। তদ্রুপ অন্যান্য ইসলামী খেদমতের বিনিময়ে বৃত্তি গ্রহণ করার ব্যাপারটিও প্রনিধাণযোগ্য। (ফাত্হুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৩) অতঃপর আল্লাহ হযরত দাঊদ (আ.)-এর আশা পূরণ করেন। যার ফলে তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা ও ইস্পাত মোমের মত নরম হয়ে যেত। তিনি যখন লৌহ বর্ম তৈরি করতেন, তখন কর্মকারের শক্ত ও ভারী যন্ত্রপাতি ছাড়াই ইস্পাতকে যেভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাতেন। এছাড়া তাঁর হাতের স্পর্শে লৌহ বা ইস্পাত মোমের মত নরম হয়ে যাওয়ার কারণে অতি সহজে সব ধরনের আকৃতি তৈরি করতে পারতেন। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবাতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

"আর আমি নমনীয় করেছিলাম লৌহ, যাতে তুমি পূর্ণমাপের বর্ম তৈরি করতে পার এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার এবং তোমরা সৎকর্ম কর, তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা সাবা ঃ ১০-১১)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ -

"আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮০)

তাওরাত ও লৌহজাত শিল্পযুগের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, হযরত দাঊদ (আ.)-এর যুগের পূর্বেই লৌহজাত শিল্পের এত অগ্রগতি হয়েছিল যে, ইস্পাত গলিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রা ও পাত তৈরি হত এবং সেগুলো সংযোজন করে যুদ্ধাস্ত্র বা বর্ম বানান হত। কিন্তু সেগুলো খুবই ভারী হতো। যে কারণে সবল ও বিশালদেহী পুরুষ ছাড়া কারো পক্ষে সেগুলো ব্যবহার করা, যুদ্ধের ময়দানে বহন করা এবং যথেচ্ছা ব্যবহার কষ্টকর এমনকি অসম্ভব হতো। সর্বপ্রথম হযরত দাঊদ (আ.) আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ও ওহী প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে এমন সূক্ষ্ম ও চিকন বর্ম আবিষ্কার করেন যা হাল্‌কা জিঞ্জিরের বৃত্ত দ্বারা তৈরি, ওযনে হাল্‌কা এবং যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকগণ তা পরিধান করে সহজেই বহন করতে পারত। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এ বর্মগুলো খুবই সফল ও উত্তম বলে প্রমাণিত। সাইয়্যেদ মাহমূদ আলূসী (র.) 'রূহুল মা'আনী' নামক তাফসীরে হযরত কাতাদা (রা.) থেকে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (রূহুল মা'আনী, ১৭শ খণ্ড, পৃ.৭১)

পাখির কথা বলা

মহান আল্লাহ্ হযরত দাঊদ (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত সুলায়মান (আ.) কে একটি বিশেষ ফযীলত দান করেন। তাঁরা উভয়েই পাখির ভাষা বুঝার মত জ্ঞান লাভ করেন। মানুষ যেরূপ একে অপরের কথাবার্তা বুঝে, তারাও তেমনি পাখির কথাবার্তা বুঝতেন। পাখির ভাষার প্রকৃত ব্যাপার কি এবং পাখির ভাষা সম্বন্ধে দাঊদ ও সুলায়মানের কি ধরনের জ্ঞান ছিল সুলায়মান সম্পর্কিত আলোচনায় এর বিস্তারিত বিবরণ করা হবে। তবে একথা নিশ্চিত যে, প্রাণীবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ ধারণা ও অনুমানে পাখির ভাষা বিজ্ঞান বলে যে তথ্য আবিষ্কার করেছেন এবং

বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে Zoology বা জীববিদ্যা বলা হয়। হযরত দাঊদ ও সুলায়মানের পাখির ভাষা সম্পর্কিত ধারণা সে রকম ছিল না। বরং সে জ্ঞান ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি মহান অনুগ্রহ যা তাঁদের করেছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

যাবূর তিলাওয়াত

বিগত আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে যে, হযরত দাঊদ (আ.) অতি অল্প সময়ে যাবূর তিলাওয়াত খতম করতেন। তিনি ঘোড়ার গদি আটানোর শুরুতে তিলাওয়াত আরম্ভ করতেন আর তা শেষ করার সাথে তিলাওয়াত ও খতম করতেন। এ মু'জিযা ছিল হযরত দাঊদ (আ.)-এর জিহ্বা সঞ্চালন ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ হয়ত হযরত দাঊদ (আ.)-এর জন্য কয়েক ঘন্টার সমপরিমাণ সময়কে উক্ত সময়ের ভিতর সংকোচিত করে দিতেন অথবা অন্যান্য সাধারণ লোকজন কয়েক ঘন্টার যে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে সক্ষম হতো। তিনি অতি অল্প সময়ে দ্রুতগতিতে সে পরিমাণ শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা রাখতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত দাঊদ (আ.) সংক্ষিপ্ত সময়ে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশী শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম ছিলেন। আধুনিক যুগেও এটা স্বীকৃত যে, জিহ্বা সঞ্চালনের দ্রুততার ব্যাপারে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় না।

হযরত দাঊদ (আ.) ও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তাফসীর প্রসঙ্গ

হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কিত আলোচনায় এমন দু'টি বিষয় আছে যা বাস্তবতা ও মুফাস্সিরগণের বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিষয়টিতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টিতে মতভেদের দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং জ্ঞানী মনীষীদের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের কারণে তিলকে তালে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত বিষয়টি পরিবেশন করা এবং বাতিল অভিমত ও ধারণাকে দলীল প্রমাণের সাহায্যে প্রতিহত করা একান্ত অপরিহার্য।

১ম বিষয়

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ- وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا -

"এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে, তাতে রাতের বেলায় প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। এবং আমি সুলায়মান এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৮-৭৯)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে জমহুর মুফাস্সিরীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (আ) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একবার দু'জন লোক একটি মুকাদ্দামা নিয়ে হযরত দাঊদ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। বাদী তার দাবীনামায় উল্লেখ করে যে, বিবাদীর একপাল বকরী তার সমস্ত ফসলের ক্ষেত ধ্বংস করে ফেলেছে এবং চারাগাছ পর্যন্ত পদদলিত করে তছনছ করে দিয়েছে। হযরত দাঊদ (আ) তাঁর জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী ফয়সালা দিলেন- বাদীর ক্ষেত্রের ফসলের ক্ষতির পরিমাণ যেহেতু বিবাদীর পালের মূল্যের প্রায় সমপরিমাণ হবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার বকরীর পাল বাদীকে প্রদান করতে হবে। সে সময় ১১ বছর বয়সের বালক সুলায়মান (আ.) তাঁর পিতার পাশেই বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আব্বাজান, আপনার এ ফয়সালাটি যদিও সঠিক, কিন্তু এর চাইতেও বেশী উপযোগী ফয়সালা আমি বলে দিতে পারি। আর তা হলো– সমস্ত বকরী বাদীকে প্রদান করা হোক, সে বকরীর দুধপান এবং পশম থেকে উপকৃত হতে থাকবে আর বিবাদী ইত্যবসরে বাদীর ক্ষেতের পরিচর্যা করতে থাকবে। অবশেষে ক্ষেতের উৎপাদন যখন পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, তখন সে বাদীকে ক্ষেত বুঝিয়ে দেবে এবং তার বকরীর পাল ফেরৎ নিয়ে নেবে। পুত্রের এ ফয়সালায় হযরত দাঊদ (আ.) খুবই সন্তুষ্ট হলেন। কুরআনেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুলায়মানের মীমাংসা ছিল অধিকতর উপযোগী। আর এ বিশেষ ঘটনায় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রজ্ঞা যেন হযরত দাঊদ (আ.)-এর প্রজ্ঞার উপর প্রাধান্য পেয়ে গেল। ফিক্হ শাস্ত্রের পরিভাষায় হযরত দাঊদ (সা.)-এর ফয়সালা ছিল কিয়াসী বা অনুমানমূলক আর সুলায়মানের ফয়সালা ছিল ইস্তিহ্সানী বা সুদৃষ্টিমূলক। কিন্তু এ ধরনের খণ্ড ফযীলতের মাধ্যমে হযরত সুলয়মান (আ.) সমষ্টিকভাবে তাঁর পিতা দাঊদ (আ.)-এর উপর ফযীলতের প্রাধান্য রাখতেন এটা বুঝানো হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সামষ্টিক ফযীলতের ব্যাপারে হযরত দাঊদ (আ.)-এর যেসব গুণাবলী ও প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন, হযরত সুলয়মান (আ.)-এর ব্যাপারে তা করেননি।

২য় বিষয়

তাওরাত ও ইসরাঈলী বর্ণনার বিশেষত্ব হলো এই, নবী রাসূলগণের ব্যক্তি-সত্তার গুণাবলী প্রসঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে এমন হাস্যকর বাজে কাহিনী ও উদ্ভট উপাখ্যান জুড়ে দিয়েছে। যেগুলো পাঠ করলে পূত-পবিত্র মনীষী নবী ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, তারা যে স্বাভাবিক নীতিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ছিলেন এটাই বিশ্বাস হয় না।

উদ্ভট অপবাদের দৃষ্টান্ত

এ প্রসঙ্গে হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে একটি বাজে উপাখ্যান বর্ণিত আছে। তাওরাতের শামুয়েল পুস্তকে বর্ণিত দাউদ সম্পর্কে দীর্ঘ উপাখ্যানটি এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো ঃ

"একদা সন্ধ্যাকালে দাউদ (আ.) তাঁর পালঙ্ক থেকে গাত্রোত্থান করেন অতঃপর শাহী মহলের ছাদে উঠে পায়চারী করছিলেন। এমন সময় তিনি একজন মহিলাকে গোসল রত অবস্থায় দেখতে পেলেন। সে ছিল অপরূপা সুন্দরী। কাজেই দাউদ (আ.) লোক পাঠিয়ে তার তথ্য সংগ্রহ করলেন। কেউ বলল, সে আলআমের কন্যা বিনত সাব'আ, তার স্বামীর নাম হাত্তা আওরিয়া। দাউদ তখনই লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং সহবাস করলেন। কেননা মহিলাটি তখন নাপাকী থেকে পাক হয়েছিল। অতঃপর সে বাড়ী ফিরে গেল। পরে যখন সে জানতে পারল যে সে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়েছে, এ ব্যাপারে দাউদের কাছে খবর পাঠিয়ে অবহিত করল। সকালে দাউদ প্রধান সেনাপতি ইয়াওয়াবের কাছে একটি পত্র লিখলেন এবং আওরিয়ার হাতে দিয়ে তার কাছে পাঠালেন। তাতে লিখা ছিল, তুমুল যুদ্ধের সময় আওরিয়াকে সবার সামনে পাঠাবে এবং তার কাছ থেকে তোমরা সরে যাবে, যাতে সে যুদ্ধে মারা যায়..... । শহরবাসীরা যখন ইয়াওয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, দাউদ বাহিনীর খুব কম লোকই সে যুদ্ধে প্রাণ হারালো; কিন্তু হাত্তা আওরিয়া মারা গেল। যুদ্ধ শেষে ইয়াওয়াবা দূত মারফত যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা দাউদকে অবহিত করল। আওরিয়ার স্ত্রী যখন তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনল তখন স্বামী শোকে বিলাপ শুরু করল। শোক প্রকাশের দিনগুলো অতিবাহিত হবার পর দাউদ তাকে ডেকে নিয়ে এসে শাহী মহলে রেখে দিল। অতঃপর সে দাউদের স্ত্রী হয়ে গেল। তার গর্ভে দাউদের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। দাউদের এহেন কর্মে সদাপ্রভু খুবই রাগান্বিত হয়েছিলেন"। (শামুয়েল (২) অধ্যায়, ১১ শ্লোক ২-২৭)

উক্ত উপাখ্যানে হযরত দাউদ (আ.)-এর নৈতিক চরিত্রের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা পাঠ করলে তাকে একজন নবী তো দূরে থাক, একজন সুস্থ নীতিজ্ঞান

সম্পন্ন ব্যক্তি বলেও ধারণা করা যায় না। অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া অবৈধ দৈহিক মিলনে লিপ্ত হওয়া, অতঃপর ষড়যন্ত্র করে তার স্বামীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করানো মানবীয় জীবনের এমন এক ঘৃণ্য ও জঘন্য কাজ, যাকে নীতিবিজ্ঞানের পরিভাষায় দুশ্চারিত্রিক ও লাম্পট্য শব্দের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ "হে আল্লাহ্ এসব মারাত্মক অপবাদ থেকে তুমি পবিত্র"।

তাওরাতের পরস্পর বিরোধী বর্ণনা

আমরা নিষ্পাপও নিষ্কলংক মহাপুরুষ হযরত দাঊদ (আ.)-এর উপর রটানো অপবাদের দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ পেশ করছি, তবে এর পূর্বে হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কে তাওরাত অন্য জায়গায় কি মন্তব্য করেছে তার পবিত্রতা ও আল্লাহ্ ভীতি সম্পর্কে কি আলোকপাত করেছে, সে সম্পর্কে তাওরাতের নিজ বাণীকে তুলে ধরছি ঃ

তাওরাতের শ্যামুয়েল পুস্তকে বর্ণিত আছে, "তখন নাতেন (নবী) রাজাকে (দাঊদ) বললেন, যাও তুমি তোমার অন্তরে যা চায় তাই কর, কেননা সদাপ্রভু তোমার সাথেই আছেন।" সে রজনীতে সদাপ্রভুর বার্তা নাতেনের কাছে পৌঁছলো 'যাও আমার দাস দাঊদকে বলো যে, সদাপ্রভু এরূপ বলেছেন-

"..... সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাঊদকে বলো, বাহিনী সমূহের সদাপ্রভু বলেছেন, আমি তোমাকে ভেড়ার খোঁয়াড় থেকে তুলে এনেছি, সেখানে তুমি ভেড়া বকরীর পেছনে পেছনে ঘুরতেছিলে, যাতে তুমি আমার ইসরাঈল জাতির পরিচালক হত"। (শ্যামুয়েল পুস্তক (২), অধ্যায় ৭, শ্লোক ঃ ৩-৮) তিনি (সদা প্রভু) আমাকে আমার শক্তিশালী দুশমন ও শত্রুদের কবল থেকে মুক্ত করে আনলেন, কেননা তিনি আমার জন্য খুবই ক্ষমতাবান। বিপদের দিনে তিনি আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর সদাপ্রভু আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি আমাকে প্রশস্থ স্থানে বের করে আনলেন। তিনি আমাকে মুক্ত করলেন, কেননা তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। সদাপ্রভু আমাকে সত্যবাদিতা অনুযায়ী পুরস্কার দিয়েছেন এবং আমার হাতের পবিত্রতা অনুযায়ী বিনিময় দান করেছেন। কারণ, আমি সদাপ্রভুর রাস্তায় চলছিলাম এবং আমি উদ্ধত্য দেখিয়ে সদাপ্রভু থেকে বিছিন্ন হই নাই। তাঁর সমুদয় বিধান আমার সমানেই ছিল আর আমি তার বিধি বিধানের বিদ্রোহী হই নাই। আমি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ হাযির থাকতাম এবং কুকর্ম থেকে বিরত ছিলাম। যে কারণে সদাপ্রভু আমার সরলতা অনুযায়ী বরং তাঁর দৃষ্টির সামনে আমার পবিত্রতা অনুযায়ী বিনিময় দান করেছে"। (শ্যামুয়েল, অধ্যায় ২২, শ্লোক ১৮-২৫)

দাঊদ ইবন এইশী বলেন, অর্থাৎ এগুলো সেই ব্যক্তি ভাষ্য যাকে নেতৃত্বের উচ্চাসনে স্থান দেয়া হয়েছে এবং ইয়া'কূবের খোদার স্পর্শপ্রাপ্ত ও ইসরাঈল বংশের সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী। "সদাপ্রভুর আত্মা আমার মাধ্যমে কথা বলেছেন আর উক্ততা আমার জিহ্বায় বিদ্যমান থাকত।" (শ্যামুয়েল, অধ্যায় ২৩, শ্লোক ১-৩)

"সুলায়মান বলল, হে সদাপ্রভু! তুমি তোমার খাদেম আমার পিতা দাঊদের উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছ। কেননা তিনি তোমার উপস্থিতিতে সরল পথে সত্যাবদিতার মধ্যে এবং তোমার সাথে সরল মনে চলছিল"।(সম্রাট পুস্তক, ১১ অধ্যায় ৩)

"তিনি (সুলায়মান) বলেন, সদাপ্রভু! ইসরাঈলের খোদা কল্যাণময় হোক তিনি তার মুখে আমার পিতা দাঊদের সাথে কথা বলেছেন..............। তিনি দাঊদকে নির্বাচিত করেছেন যাতে তিনি আমার ইসরাঈল জাতির শাসক হতে পারেন।" (ইতিহাস পুস্তক (২) অধ্যায় ৬, শ্লোক-৪ -৭)

"হে সদাপ্রভু! ইসরাঈলদের খোদা! তোমার বান্দা আমার পিতা দাঊদের সাথে যে কথা দিয়েছিলে এখন তা পূরণ কর। তুমি বলেছিলে, আমার উপস্থিতিতে তুমি ইসরাঈলের সিংহাসনে বসার সময় লোভের কমতি হবেনা। তবে এর জন্য পূর্বশর্ত হলো, তুমি যেরূপ আমার উপস্থিতিতে চলছ, ঠিক সেরূপ তোমার সন্তানগণ আমার শরী'আত অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে নিজেদের রাস্তায় সতর্ক থাকবে"। (ইতিহাস পুস্তক, অধ্যায় ৬, শ্লোক-১৬)

তারপরও আমি সমগ্র রাজত্ব প্রদান করতাম না; কিন্তু কেবলমাত্র দাঊদ ও জেরুশালেমের সৌজন্যেই প্রদান করলাম। কেননা আমি দাঊদকে নির্বাচিত করেছিলাম, একটি গোত্র তোমার ছেলেকে দেব।" (সম্রাট পুস্তক (১), অধ্যায় ১১, শ্লোক-১৩)

"আর যদি তোমাকে যে নির্দেশ দেব সব নির্দেশই পালন এবং আমার রাস্তায় চল আর আমার দৃষ্টিতে যা কিছু ভাল, তা পালন কর, আমার বিধি-বিধান মেনে চল, আমার বান্দা দাঊদ যেরূপ করেছে সবকিছু সেরূপ কর তাহলে আমি তোমার সাথে থাকব এবং তোমার জন্য একটি স্থায়ী ঘর নির্মাণ করব, যেরূপ দাঊদের জন্য করেছিলাম এবং ইসরাঈল রাজ্য তোমাকে দেব"। (সম্রাট পুস্তক, অধ্যায়-১, শ্লোক -২৮)

উপরেল্লিখিত বাক্যগুলো তাওরাত থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে। এগুলো পাঠ করে অবহিত হওয়া যায় যে, হযরত দাঊদ (আ.) আল্লাহ্‌র মনোনীত ও পসন্দনীয় বান্দা ছিলেন। কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা মর্যাদা

রাখতেন। আল্লাহ্র শরী'আতের পূর্ণ পাবন্দ ও অনুসারী ছিলেন, সত্যবাদী, পবিত্র ও নিষ্কলঙক বুযর্গ ছিলেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত রাজত্বে বনী ইসরাঈলের নেতা ও আল্লাহ্র খলীফা ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্র হিফাযতে ও যত্নের জিম্মাদারীতে থাকতেন। তিনি নির্বাচিত পয়গম্বর এবং পরাক্রমশালী প্রশাসক ছিলেন।

কাজেই আহ্লে কিতাবগণ তাওরাতের এসব পরস্পর বিরোধী বর্ণনার কিভাবে সমন্বয় সাধন করবেন, তা বলা যাচ্ছে না। আর হযরত দাঊদ (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেই বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি তাও বুঝা যাচ্ছে না। তাদের দৃষ্টিতে যদি দাঊদ (আ.) নবী হয়ে থাকেন অথবা সচ্চরিত্রবান মহান সম্রাট হয়ে থাকেন, তাহলে হাত্তা আত্তরিয়ার স্ত্রী সম্পর্কিতে উপাখ্যান প্রসঙ্গে তাদের জবাব কি? আর যদি এ উপাখ্যানটি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে উপরোল্লিখিত প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা কোন্ দাঊদের জন্য প্রযোজ্য ?

এর বিপরীতে কুরআনে পাকে হযরত দাঊদ (আ) ছিলেন আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল, নিষ্পাপ নবী, আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং বনী ইসরাঈলের নেতা ও শাসক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلَى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا –

" আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যাবুর দিয়েছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৫)

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ –

"আমি দাঊদকে দান করলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।" (সূরা সাদ ঃ ৩০)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا –

"আমি নিশ্চয় দাঊদের প্রতি অনুগ্রহ করেছি।" (সূরা সাবা ঃ ১০)

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ –

"আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।" (সূরা সাদ ঃ ২০)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا قَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ –

"আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের তার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" (সূরা নাম্ল ঃ ১৫)

উক্ত আয়াতগুলোতে কুরআনে পাকের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সে সব ধারণার প্রতিবাদ এবং সংশোধন করেছে, যেগুলো তাদের পীর পুরোহিতগণের পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে আকীদার বিষয়বস্তু হয়ে প্রবেশ করেছে। কুরআন শরীফ ইতিহাসের সে সব অন্ধকার আবরণকে ছিন্ন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে যে, হযরত দাঊদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) বনী ইসরাঈলের মধ্যে পূত-পবিত্র মহান পুরুষ ছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্র সত্য নবী এবং সাধারণের গোনাহ ও নাফরমানী থেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ ছিলেন।

তবে লক্ষ কোটি পরিতাপের বিষয় এই যে, কুরআন শরীফে স্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও হাত্তা আওরিয়ার স্ত্রী সম্পর্কিত কল্প কাহিনী উপাখ্যান নাটকে তাওরাত ও ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করে কোন কোন তাফসীরবিদ কুরআনের তাফসীরে সংকলন করে দিয়েছেন এবং ইসরাঈলী গুজবকে দলীল প্রমাণ ছাড়াই ইসলামী বর্ণনার মর্যাদা দান করেছেন। এসব সরলমনা মনীষীগণ এ ব্যাপারে অনুধাবন করার ন্যূনতম চেষ্টাও করেন নি যে, যে সব কল্পকাহিনী ও বাজে উপাখ্যানকে আজ ইসরাঈলী বর্ণনাভঙ্গিতে কুরআনের তাফসীরে সংকলন করছেন, ভবিষ্যতে সেগুলো কুরআনী আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা মনে করা হবে এবং উম্মাত মুহাম্মদীর জন্য বিরাট ফিত্নার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সর্বোপরি তাদের গোমারাহীর উপাদান প্রমাণিত হবে। আরো অবাক লাগে সে সব নবীন প্রবীন দার্শনিকদের কর্মকাণ্ডে, যারা এসব অমূলক অশ্লীলতাকে কঠোরতার সাথে প্রতিহত করা এবং অপবাদ রটানোকে প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে সে সব বর্ণনার সৎউদ্দেশ্য অন্বেষণ করে এবং সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে ধন্য হতে চান। আর সংগতিবিহীন সুধারণার বশবর্তী হয়ে প্রকৃত ব্যাপারকে উপেক্ষা করছেন। মূলত কল্পকাহিনী ও বাজে উপাখ্যান সম্পর্কে যত ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন, তা বালির বাঁধ ও মাকড়শার জালের মতই ক্ষণস্থায়ী। আর কোননা কোন রীতিতে এগুলোকে মেনে নেয়া মানেই 'নবীদের নিষ্পাপ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ইসলামী আকীদায় আঘাত হানা শামিল'। কুরআন শরীফ নবী-রাসূলদের সম্পর্কে এ ধরনের সম্বন্ধ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নির্মল আর এ ধরনের বর্ণনাকে গুরুতর অপবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। সুতরাং কারো পক্ষে কুরআনের তাফসীরের ভিতরে এসব বাজে কাহিনীকে বর্ণনা করার কোন অধিকার নেই, থাকতে পারে না। যাহোক তাফসীরবিদ্গণ যেসব

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সেই হলাহলকে মিশিয়েছে, হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কিত সূরা সাদ এর উক্ত আয়াতগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

وهل اتك نبؤ الخصم اذ تسوروا المحراب - اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط - ان هذا اخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزنى فى الخطاب- قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب - فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب - يداود انا جعلنك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله - ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب -

"তোমার কাছে বিবাদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় আসল এবং দাউদের কাছে পৌঁছল, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা দু' বিবদমান পক্ষ আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছে। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদের সঠিক পথনির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বই দুম্বা আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে, আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাউদ বললেন, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝতে পারলো, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল। অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা ও শুভ পরিণাম। হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে

সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।" (সূরা সাদ ঃ ২১-২৬)

উক্ত আয়াতগুলোর বাতিল তাফসীর

একদিন মহান আল্লাহ দাউদকে একটি পরীক্ষায় সম্মুখীন করেছিলেন, এ জায়গায় সে ঘটনাই আলোচিত হয়েছে।

হযরত দাউদ (আ) প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নাই, পরে অবিলম্বে যখনই তার খেয়াল হলো যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, তখন সাথে সাথে মনোনীত নবীদের মতই আল্লাহর দিকে ধাবিত হন এবং মাগফিরাত কামনা করেন। তাঁর মাগফিরাত কামনা কবুল হওয়ার ফলে তিনি সম্মান মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হন। ব্যাপারটি ছিল এতটুকুন। কিন্তু কতক মুফাসসির দেখলেন যে, এ পরীক্ষা সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি অথচ আওরিয়ার স্ত্রী সম্পর্কে তাওরাত ও ইসরাঈলী বর্ণনায় একটি উপাখ্যান রয়েছে যার মধ্যে হযরত দাউদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথাও উল্লেখ আছে। সুতরাং কোন সূক্ষ্মচিন্তা ভাবনা ছাড়াই সেই কল্পকাহিনীকে উক্ত আয়াতের তাফসীরে সাজিয়ে পরীক্ষা, মাগফিরাত কামনা ও কবুল হওয়ার ব্যাপারগুলো জুড়ে দিয়েছেন। তবে মুহাক্কিক মুফাসসিরগণ তা দেখে নিজেদের স্থির রাখতে না পেরে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পেশ করে বুঝিয়ে দিলেন। 'সূরা সাদের' উক্ত আয়াতগুলোর তাফসীরের সাথে সেই কল্পিত উপাখ্যানের আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই। শুধু তাই নয়, বরং পুরো উপাখ্যানটি ইয়াহূদীদের মনগড়া অপবাদ রটানোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইসলামের এর কোন স্থান নেই।

এ পর্যায়ে হাকিম ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেন ঃ মুফাসসিরগণ এ আয়াতের তাফসীরে যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, তার অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগৃহীত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, তা আমাদের মানতে হবে। (তাফসীর ইবন কাসীর ঃ সূরা সাদ)

তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'তে আরো জোরালো ভাষায় বলেন: "বেশ কিছু নবীন ও প্রবীন" মুফাসসির এ জায়গায় এমন কিছু কাহিনী ও উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশই ইসরাঈলী মনগড়া বর্ণনা থেকে সংগৃহীত এবং নিঃসন্দেহে বানোয়াট ও মিথ্যা। যে কারণে ইচ্ছা করেই

আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে সেগুলো উল্লেখ করিনি। যাতে করে কুরআন তিলাওয়াতকে কল্প কাহিনী থেকে পবিত্র রাখা যায়। আর আল্লাহ্ যাঁকে ইচ্ছা সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার তাওফীক দিয়ে থাকেন।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩)

হাফিয আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাযম (র) 'কিতাবুল ফাসল' নামক গ্রন্থে উক্ত আয়াতের বরাত দিয়ে লিখেন "কুরআনের এ ভাষ্য সত্য ও সঠিক। মিথ্যাবাদী বিদ্রুপকারীগণ ইয়াহূদীদের মনগড়া আবিষ্কৃত কল্পকাহিনী থেকে সংগ্রহ করে যা কিছু বর্ণনা করেছে, কুরআনের এ ভাষ্য তা প্রমাণ করে না। (আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪) অনুরূপভাবে খুফ্ফাজী 'নাসীমুর রিয়াদ' গ্রন্থে, কাযী আইয়ায 'শিফা' গ্রন্থে আবু হাইয়ান আন্দুলুসী 'বাহরুল মুহীত' এ এবং ইমাম রাযী 'তাফসীরে কাবীর' গ্রন্থে এবং অন্যান্য মুহাক্কিক আলিমগণ এসব অশ্লীল কল্প কাহিনীকে প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে এ ব্যাপারে কোন হাদীসের উল্লেখ নেই।

আয়াতের সঠিক তাফসীর

অতঃপর এসব কল্প কাহিনী থেকে মুক্ত হয়ে মুহাক্কিক আলিমগণ আয়াতের যে তাফসীর পেশ করেছেন, হয় সেগুলো সাহাবাদের নির্ভুল হাদীস থেকে সংকলিত, না হয় কুরআনের পূর্বাপর আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে স্থির মস্তিষ্কের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ তাফসীরগুলো সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

১. আল্লামা ইব্ন হাযম (র) বলেন, ঘটনাটি ছিল এরূপ ঃ "একদা দু'জন লোক হঠাৎ করে দাঊদের ইবাদতখানায় প্রবেশ করে। তিনি তখন আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল ছিলেন। যেহেতু তাদের ব্যাপারটি ছিল খুবই জরুরী ও জটিল। আর তাদের পক্ষ থেকে উক্ত সমস্যা মীমাংসা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা হচ্ছিল বিধায় তারা দেয়াল টপকিয়ে দাঊদের কাছে চলে আসে। হযরত দাঊদ (আ.) বাদীর বর্ণনা শুনে উপদেশ প্রদানের ভঙ্গিতে পূর্বযুগের ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, সব যুগেই সবল মানুষেরা দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার-নিঃপীড়ন করেছে। তারা দুর্বলদের জীবনকে নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ ভেবেছে, অথচ এটা কতই না ঘৃণ্য ব্যাপার! তবে আল্লাহ্র মু'মিন বান্দা ও সৎকর্মশীলগণ এরূপ যুলুম অত্যাচার থেকে বিরত থাকেন এবং আল্লাহ্কে ভয় করেন। কিন্তু এদের সংখ্যা খুবই কম। অতঃপর হযরত দাঊদ (আ.) ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে তাদের সমস্যার সমাধান করেছেন। দু'পক্ষ চলে যাবার পর হযরত দাঊদ (আ.) সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মন মস্তিষ্ককে নিজের দিকে ধাবিত করেন যে, মহান আল্লাহ তাঁকে কতবড় রাজত্ব

অতুলনীয় সম্মান মর্যাদা দান করেছেন। মূলত এটা তাঁর উপর এক বিরাট পরীক্ষা। কেননা আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও আমাকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তদুপরি যে গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে আমি সঠিকভাবে কতটুকু পালন করছি এবং বিরাট নিয়ামতের শুক্রিয়া কতটুকুই বা আদায় করছি ? সুতরাং এ ধরনের চিন্তায় হযরত দাঊদ (আ) গভীরভাবে মগ্ন হয়ে প্রভাবিত ও তন্ময় হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি সিজ্দাবনত হয়ে মাগফিরাত কামনা করতে করতে স্বীকার করেন যে, হে আল্লাহ্! এই মহান দায়িত্ব যথাযথ পালন করে মুক্তি পাওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। তবে তোমার সাহায্যই আমার একমাত্র সহায়। হযরত দাঊদ (আ.)-এর মুনাজাত আল্লাহ্ তা'আলা খুবই পসন্দ করেন এবং তাঁর মহান ক্ষমাগুণে তাঁকে স্বীয় রহমতের ছায়াতলে স্থান দেন।" উক্ত তাফসীর পেশ করার পর ইবন হাযম (র) বলেন, মাগফিরাত কামনা করা আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয় আমল। তবে এর জন্য সর্বময় এটা জরুরী নয় যে, পূর্বেই গোনাহ-নাফরমানী করতে হবে এবং অতঃপর সে গোনাহ পরিত্যাগ করার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে।

এ কারণেই ফিরিশ্তাগণও মাগফিরাত কামনা করেন বলে প্রমাণিত। অথচ কুরআন শরীফে ফিরিশতাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা যে,

لَايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ –

"তারা আল্লাহ্র নির্দেশেই নাফরমানী করেনা আর তাদের যা হুকুম করা হয় তাই তারা করে।"(সূরা তাহ্রীম ঃ ৬)

এছাড়া ফিরিশ্তাদের মাগফিরাত কামনা সম্পর্কে কুরআন বলছে ঃ

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ –

" এবং (ফিরিশ্তাগণ) মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক। তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর। " (সূরা মু'মিন ঃ ৭)

ইব্ন হাযমের উক্ত তাফসীরের সমর্থনে আমরা আরো বাড়িয়ে বলতে চাই যে, কুরআনে হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কিত ঘটনার তাঁর নাফরমানী ও গোনাহ সম্বন্ধে মোটেই কোন কথা বলে নাই। বরং فَتَنَّاهُ (অর্থ্যাৎ আমি তাকে পরীক্ষা করেছি) বলে শুধু এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, "আমরা তাকে কোন একটি পরীক্ষায় ফেলেছি।" আর পরীক্ষার জন্য কখনো এটা জরুরী নয় যে, তাঁর দ্বারা কোন

গোনাহ্ বা অপরাধ সংঘটিত হতেই হবে। যেমন হযরত আইউব (আ.) কে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কাজেই হযরত দাঊদ (আ)-এর এ ব্যাপারটি ও কোন গোনাহ্ বা নাফরমানীর সাথে জড়িত নয় বরং পয়গম্বরী মাহাত্ম্য, কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি এবং আল্লাহ্র সামনে নিজের দাসত্ব ও অসহায়ত্ব প্রকাশের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কুরআনের উক্ত আয়াতের এরূপ তাফসীর যদিও গ্রহণযোগ্য এবং এর দ্বারা হযরত দাঊদ (আ)-এর পয়গম্বরী মহত্ত্ব আরো বেশী প্রস্ফুটিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও এ তাফসীর গবেষণাপ্রসূত। কেননা পরীক্ষার যে রীতি বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোন আয়াত বা হাদীসে উল্লেখ নেই, বরং শুধুই ইজতিহাদের সাথে সম্পৃক্ত।

২. আবূ মুসলিম (র.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, হযরত দাঊদ (আ.) এর সামনে বাদী-বিবাদী দু'জন লোক এসে যখন তাদের সমস্যা তুলে ধরলো, তখন হযরত দাঊদ (আ) বিবাদীকে জবাবদিহির সুযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র বাদীর আর্জি শুনেই এমন উপদেশ প্রদান করেন, যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে বাদীর পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে বলে বুঝা যাচ্ছিল। আর স্বাভাবিক রীতিতে এটা ছিল ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কাজ। যে জন্যে হযরত দাঊদ (আ)-এর বক্তব্য যদিও উপদেশে পরিপূর্ণ ছিল এবং বিবাদ মীমাংসা তখনো সমাপ্ত হয়নি, তা সত্ত্বেও তাঁর মত গুরুত্বপূর্ণ মহান রাসূলের শানে এরূপ কাজ শোভনীয় ছিলনা। কাজেই এটাই ছিল এমন ফিতনা, যে ফিতনার কোলে তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। কিন্তু যখনই কোন প্রিয় বান্দার এহেন পদস্খলন ঘটে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবিলম্বে সতর্ক করে দেন। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ) ও উক্ত বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে তাঁর পদস্খলন ঘটে গেছে বলে সতর্ক হয়ে যান এবং এটা যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা তা বুঝতে পেরে আল্লাহ্র দরবারে মাগ্ফিরাত কামনা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাসুলভ মহত্ত্বের গুণে তাঁর দু'আ কবূল করেন এবং তাঁর এ পসন্দনীয় আমলের বরকতে মর্যাদার আসন আরো সমুন্নত করে দেন। (রূহুল মা'আনী, ২৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৮) আমরা এ ব্যাখ্যার সমর্থনে আরো বৃদ্ধি করতে চাই যে, সব কিছু সমাধা হবার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ) কে সম্বোধন করে বললেন, হে দাঊদ! তুমি পৃথিবীর সে সব রাজা বাদশাহদের মত নও, যাদের অধিকাংশই ন্যায়বিচার সম্পর্কে উদাসীন এবং তারা নিছক খামখেয়ালী, প্রবৃত্তির চাহিদাও ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই আল্লাহ্র সৃষ্টি উপর কর্তৃত্ব করে। তুমি তো আল্লাহ্র যমীনে তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি বা খলীফা। সৃষ্টির সেবা করা তোমার পবিত্র জীবনের স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। সেজন্য প্রতিটি

মুহূর্তে সত্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখা তোমার কর্তব্য। এসব ব্যাপারে সামান্যতম পদস্খলনও ঘটতে দিওনা এবং সীরাতে মুস্তাকীমকে তোমার চলার জন্য রাজপথ মনে করো। সুতরাং কুরআন পাক এ বাস্তব সত্যকে তুলে ধরার জন্য উক্ত আয়াতের পরপরই ব্যক্ত করেছে ঃ

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

"হে দাঊদ! আমি তো তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি।" উপরে/ল্লিখিত ব্যাখ্যা দু'টিতে মুফাস্সিরগণ আলোকপাত করেছেন যে, উক্ত বিবাদটি রূপক ছিল না বরং বাস্তব ঘটনা ছিল। দু'পক্ষের লোক ফিরিশ্তার আকৃতি ধারণ করেন নি বরং তারা প্রকৃত মানুষ ছিলেন। কেননা কুরআনে পাকের বর্ণনাশৈলী তাই প্রমাণ করছে। উক্ত আলোচিত আয়াতের ব্যাখ্যা যদিও চিন্তা গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিবেশিত, তবুও আয়াতের অন্তর্নিহিত তথ্য ও যোগসূত্রের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। যে কারণে তাফসীরবিদদের দৃষ্টিতে এটা অধিক গ্রহণযোগ্য। কিন্তু দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যেই পৃথক পৃথক সন্দেহের অবকাশ রয়েছে,যা সত্যিই ভাবনার বিষয়, প্রথম ব্যাখ্যায় আয়াতের যোগসূত্র অনুযায়ী একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন হাযম (র) যা বলেছেন তা যদি মেনে নেয়া হয় তবে পরবর্তী আয়াত ঃ

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

আলোচিত আয়াতের সাথে কোন সম্বন্ধ ও যোগসূত্র আছে বলে পরিলক্ষিত হয় না। কেননা এখানে হযরত দাঊদ (আ)-এর ব্যাপারে এত গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত বর্ণনা করার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যা কুরআন হযরত আদম (আ)-এর পরবর্তী রাসূলদের মধ্যে কেবল তাঁর সম্পর্কেই বর্ণনা করেছেন।

আর আবূ মুসলিমের ব্যাখ্যার মাঝে সন্দেহটি হচ্ছে এই যে, বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে পার্থিব বিচারপতি এবং বাদশাহদের কাছেও স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত রীতি হচ্ছে, সর্বদা দু'পক্ষের বিবরণ শোনে ফয়সালা দেয়া। বরং এটা তো ঐশী নির্দেশ এবং মীমাংসিত পদ্ধতি। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ)-এর মত স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মহান পয়গাম্বর সম্বন্ধে কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি বিবাদীর জবানবন্দী না শুনেই বাদীর পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিয়েছেন অথবা স্বভাবের প্রবণতায় এ কাজ করেছেন। আর বিবাদটা তো এমন কোন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় ছিলনা যে, হযরত দাঊদ (আ) স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা অনুধাবন করতে পারেন নি। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁর পদস্খলন ঘটে গেছে!

অতএব উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যা ভিন্ন আমাদের মতে উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে উত্তম ব্যাখ্যা ও তাফসীর রয়েছে, যা বাক্যবিন্যাস, আয়াতের যোগসূত্র ও পূর্বাপর সম্পর্কের দিক থেকেও যথার্থ। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, (আ) বর্ণিত একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করেই এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত দাঊদ (আ) তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীকে চারভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একদিন আল্লাহ্র ইবাদত, একদিন জটিল সমস্যা ও বিবাদ মীমাংসা, একদিন নিজস্ব প্রয়োজন মেটানো আর একদিন বনী ইসরাঈলের হিদায়েতের জন্য নির্ধারিত ছিল।(রূহুল মা'আনী, ২৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬২)

কিন্তু কর্মসূচীর তালিকা অনুযায়ী ইবাদতের জন্য নির্ধারিত দিনের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। কেননা এমনিতে হযরত দাঊদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত থেকে কোন দিনই ফাঁকা ছিলনা; তদুপরি শুধু এ উদ্দেশ্যেই একটা দিন ধার্য করে নিয়েছিলেন, সে দিন তিনি অন্য কোন কাজই করতেন না, এ প্রসঙ্গে কুরআনে তাঁকে اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ। অর্থাৎ "আল্লাহ্র প্রতি একাগ্রচিত্ত অভিমুখী" গুণে ভূষিত করেছে। উপরন্ত কুর্আন শরীফ ও বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে প্রমাণিত যে, হযরত দাঊদ (আ) তাঁর ইবাদত ও তাসবীহ্ তাহ্লীল কেউ যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্যে তিনি ইবাদতখানা বন্ধ করে দিতেন। বন্টনকৃত দিনের মধ্যে কেবলমাত্র সে দিনেই কারো পক্ষে হযরত দাঊদ (আ) এ কাছে যাওয়া খুব দঙ্কর ছিল আর সেদিন বনী ইসরাঈলের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত।

অন্যান্য দিনে বিশেষ কোন গণ্ডগোল বা বিবাদ উপস্থিত হলে তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা যেত এবং তাদের অভাব অভিযোগ তাঁর সামনে পেশ করতে পারতো। গভীরভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহ্র তা'আলার তাসবীহ্-তাহ্লীল করা তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এতদসত্ত্বেও যাদেরকে তাঁর সৃষ্টির হিদায়েত ও খেদমত করার জন্য মনোনীত করেছেন, তাদের জন্য অধিক ইবাদতের চাইতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হওয়া আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী পসন্দনীয় আমল। একজন সূফী ও খোদা প্রেমিক সাধক যত বেশী সংসার ত্যাগী হয়ে নির্জন কুটিরে বসে ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, নিঃসন্দেহে তিনি ততবেশী আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মর্যাদা হাসিল করবেন। কিন্তু নবুওয়াত ও খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বেলায় এটা প্রযোজ্য হবে না। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে যে মর্যাদা দান করা হয়েছে,

তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টিকে সত্যপথের দিকে হিদায়েত করা এবং তাদের খেদমত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। সুতরাং সৃষ্টির সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধানকে সমুন্নত করার মধ্যেই এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা বিদ্যমান। নির্জনবাসী হয়ে সূফী হওয়া উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ) এর দিন বন্টন পদ্ধতিটি জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা ও কর্মবন্টনের ক্ষেত্রে সেদিক থেকেই প্রশংসারযোগ্য। কিন্তু কোন একদিন কেবলমাত্র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নবুওয়াত ও খিলাফত পদমর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশেষ করে হযরত দাঊদ (সা)-এর মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহান নবী ও খলীফাতুল্লাহ্র জন্য কোনোক্রমেই শোভনীয় ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ) কে সংসার ত্যাগী হয়ে নির্জন কুটিরে একাকী বসে সাধক ও সূফী সাজবার জন্য মর্যাদাবান করেন নাই; তাঁকে নবুওয়াত ও খিলাফত প্রদান করে মাখলূককে দ্বীন ও দুনিয়ার সব ধরনের খেদমত আঞ্জাম দেয়া এবং হিদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। আর এ কারণেই সৃষ্টির হিদায়েত ও সৃষ্টি সেবা তাঁর মহৎ জীবনের প্রধান কাজ ছিল, সারাদিন আনুষ্ঠানিক ইবাদতে কাটানো নয়। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ)-এর এ পদ্ধতিকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন আর পরস্পর বিবাদমান দু'জন লোক ইবাদতের নির্দিষ্ট দিনে দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত হঠাৎ দু'জন লোককে সামনে দেখতে পেয়ে মানব সুলভ অভ্যাস অনুযায়ী হযরত দাঊদ (আ) ভয় পেয়ে গেলেন। আগন্তুক দু'জন পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমাদের হঠাৎ করে প্রবেশের কারণ হলো এ বিবাদ। আমরা এর আশু সমাধান কামনা করছি। তখন হযরত দাঊদ (আ) তাদের ঘটনা শুনলেন এবং পূর্বে বর্ণিত উপদেশ প্রদান করেন। কুরআন পাক এ জায়গায় বিবাদের সাধারণ দিকসমূহের আলোচনা উপেক্ষা করেছে। কেননা সাধারণ বোধসম্পন্ন লোকদের এমনিতেই একথা জানা আছে যে, হযরত দাঊদ (আ)-এর ফয়সালা নিঃসন্দেহে সত্যের অনুকূলে ছিল। সুতরাং ঘটনার যে পার্শ্বের সাথে হিদায়েতের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, আয়াতে শুধু তাই প্রতিভাত হয়েছে অর্থাৎ সবলে সবলে যুলুম। মোটকথা দু'পক্ষের ফয়সালার পর হযরত দাঊদ (আ) তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে ভাবলেন, আল্লাহ্ আমাকে এ কঠিন পরীক্ষায় কেন ফেললেন ? সাথে সাথে বাস্তব কারণ অনুধাবন করত সিজ্‌দাবনত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে মাগফিরাত করেন। আল্লাহ্ তাঁর ইস্তিগফার মহানুভবতার সাথে কবূল করেন এবং তাঁর মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। অতঃপর তাঁকে নসীহত করে বলেন, হে দাঊদ! আমি তোমাকে আমার যমীনে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছি কাজেই আমার

প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ হক আদায় করা তোমার কর্তব্য। বিশেষ করে এ পথে ন্যায়বিচার ও আদল্‌ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে খেয়াল রেখো এবং সীরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে ইফরাত ও তাফরীত অর্থাৎ অতিরঞ্জন ও ঘাটতির পথ অনুসরণ করনা।

৪. কিয়াস, ইজতিহাদ ও সাহাবাদের উক্তির উপর ভিত্তি করে পূর্বে যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাকিম (র.) তাঁর 'মুস্তাদরাক' নামক গ্রন্থে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির তাফসীর পরিবেশন করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এ তাফসীরকে মুহাদ্দিসগণ সঠিক ও উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার চাইতে উক্ত তাফসীর নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার স্তরে উন্নীত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত দাউদ (আ) এর পরীক্ষার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদা হযরত দাউদ (আ) মহান আল্লাহ্‌র দরবারে গর্বভরে আরয করেন, হে আল্লাহ্! দিন ও রাতের মাঝে এমন কোন মুহূর্ত নেই, যখন দাউদ কিংবা দাউদের পরিবারের কোন একজন আপনার তাসবীহ্ পাঠে মশগুল থাকে। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর প্রিয়তম নবী দাউদের এহেন গর্বভরা আচরণ পসন্দ হয়নি। সাথে সাথে ওহী নাযিল হয়, হে দাউদ! সবকিছুই তো আমার সাহায্য ও অনুগ্রহের মাধ্যমেই হয়, নতুবা তোমরা কিংবা তোমার সন্তানাদির মধ্যে উক্ত নিয়মের উপর অটল থাকার সাধ্য কোথায় ? অথচ তুমি যেহেতু এরূপ দাবী উত্থাপন করছ, তাই আমিও তোমাকে পরীক্ষাতে ফেলে যাচাই করবো। দাউদ বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে পূর্বাহ্নেই অবহিত করে পরীক্ষা নেবেন। কিন্তু পরীক্ষার ব্যাপারে হযরত দাউদ (সা)-এর এ আবেদন কবুল হয়নি। অতঃপর কুরআনে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ) কে পরীক্ষার ফিৎনায় পড়তে হয়। (মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩)

হযরত দাউদ (আ.) উক্ত বিবাদ মীমাংসার সময়টুকুতে তাসবীহ্ পাঠ থেকে বঞ্চিত হন। আর স্বাভাবিক কারণেই দাউদ পরিবারের অন্য কেউ সে সময়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত মশগুল ছিল না। এ তাফসীর থেকে একটি প্রবাদ বাক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, আর তা হল

حَسَنَاتُ الاَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقَرَّبِيْنَ

"সাধারণ সৎলোকদের ন্যায় নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের সৎকাজ মন্দকাজ বলে বিবেচিত হয়"। কেননা হযরত দাউদ (আ)-এর উক্ত কাজে কোনো গোনাহ কিংবা নাফরমানীর ব্যাপার ছিল না বরং তার মত স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবীর পক্ষে এরূপ কাজ শোভনীয় ছিলনা বিধায়, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। মোটকথা কুরআন পাকের উক্ত আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে মুহাক্কিক

আলমগণ যে বক্তব্য পেশ করেছেন, হয় সেগুলো গ্রহণযোগ্য আর না হয় কুরআনের ভাষ্যকার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর তাফসীর যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইয়াহূদীদের কল্প কাহিনী ও উদ্ভট উপাখ্যানগুলোর সাথে এসব আয়াতের দূর থেকেও সামান্যতম সম্পর্ক নেই।

তাঁর বয়স

এ সম্পর্কে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস হাকিম (র) তার 'মুস্তাদরাক' নামক গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, ঊর্ধ্ব জগতে হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে যখন তাঁর সন্তানদের বের করে তাঁর সামনে রাখা হয় তখন তিনি একটি অতি সুশ্রী ঝলমলে ললাট বিশিষ্ট সন্তানকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে পরোয়ারদেগার! এ ব্যক্তিটি কে ? উত্তরে বলা হলো, ইনি তোমার সন্তান দাঊদ। অনেক অনেক পরে দুনিয়াতে আসবে। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বয়স কত নির্ধারিত হয়েছে ? ইরশাদ হলো, ৬০ বছর। এবার হযরত আদম (আ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্! আমি আমার আয়ু থেকে ৪০ বছর এ ছেলেটিকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন আদম (আ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো,তখন তিনি মালাকুল মাওত (আযরাঈল) কে বললেন, আমার আয়ু তো এখনো ৪০ বছর বাকী রয়েছে। আযরাঈল (আ) বললেন, আপনি ভুলে গেছেন যে, এ পরিমাণ বয়স আপনার আয়ু থেকে আপনারই সন্তান দাউদকে দান করে দিয়েছিলেন।" (মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তারীখ) উক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত দাঊদ (আ) এর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তাওরাতের 'সম্রাট ও ইতিহাস পুস্তক' বর্ণিত আছে, হযরত দাঊদ (আ) বৃদ্ধ বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং ইসরাঈলদের উপর ৪০ বছর রাজত্ব পরিচালনা করেন। তিনি হেবরুনে ৭ বছর জেরুজালেমে ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। অবশেষে সম্পদ ও সম্মানে পরিতৃপ্ত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। (ইতিহাস পুস্তক, অধ্যায়-২৯, শ্লোক : ২৬-২৮)

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন, হযরত দাঊদ (আ.) ৭০ বছর রাজত্ব করেন"। (মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড : কিতাবুত তারীখ)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত দাঊদ (আ) শনিবারে হঠাৎ করে ইন্তিকাল করেন। শনিবার ছিল ইবাদতের জন্য নির্ধারিত দিন। তিনি ইবাদতে মগ্ন অবস্থায় তাঁকে ছায়া প্রদানের নিমিত্ত পাখির পালক নির্মিত খাঁচা তাঁর উপর ঝুলানো ছিল। এ অবস্থায় তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। (ফায়যুল বারী , ২য় খণ্ড, কিতাবুল আম্বিয়া)

দাফনের জায়গা

তাওরাতে আছে হযরত দাঊদ (আ) তাঁর পিতা ও দাদার সাথেই ঘুমিয়ে আছেন। হযরত দাঊদ (আ)-এর জন্মস্থান 'সায়হুন' নগরীতে তাঁকে দাফন করা হয়। (সম্রাট (সালাহীন), পুস্তক ১, অধ্যায় - ২ , শ্লোক -১১)

শিক্ষণীয় বিষয়

হযরত দাঊদ (আ)-এর পূত পবিত্র জীবনের অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহ আমাদের সামনে যেসব উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় পেশ করেছে সংখ্যার দিক থেকে সেগুলো অত্যন্ত ব্যাপক, তা সত্ত্বেও যেসব শিক্ষণীয় বিষয় সঠিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত এবং ফলপ্রসূ হিসেবে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সে গুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. আল্লাহ্ পাক যখন কাউকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ব্যক্তি সম্পন্ন বানাতে এবং বিশেষ ফযীলতে ভূষিত করতে চান, তখন জন্মগতভাবেই তাঁর মাঝে এমন কতগুলো রত্ন প্রদান করেন যার ফলে, শুরু থেকেই তাঁর সৌভাগ্যের ললাট উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ঝলমল করতে থাকে। যেহেতু হযরত দাঊদ (আ) কে একজন মহান স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূল বানানোর পরিকল্পনা ছিল, তাঁর জীবনের প্রাথমিক যুগেই জালূতের মত অত্যাচারী দুর্ধর্ষ বাদশাহকে তাঁরই হাতে হত্যা করানো হয় এবং তার সাহসিকতা, বীরত্ব ও দৃঢ়মনোবলের রত্ন উদ্ভাসিত করা হয়। ফলে সমগ্র বনী ইসরাঈল তাঁকে তাদের অবসংবাদিত নেতা ও গ্রহণযোগ্য পথিকৃত হিসেবে বরণ করে নেয়।

২. অনেক সময় আমরা কোনো কিছুকে অতি নগন্য ও সাধারণ মনে করে অবজ্ঞা-করে থাকি, কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতির ব্যবধানে প্রতীয়মান হয় যে, এট অসাধারণ অনন্য। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ)-এর শেষকালীন অবস্থা এবং পরবর্তীতে সত্যের সহযোগিতায় তাঁর জিহাদ, আল্লাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে সত্যের দাওয়াত এবং নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার মাঝে যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, তা সে দাবী সত্যতাই প্রমাণ করছে।

৩. সর্বদা আল্লাহ্র খলীফা ও তাগূতী বাদশাহর মাঝে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। প্রথমোক্ত জনের মধ্যে প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের প্রচুর্য থাকা সত্ত্বেও বিনয়-নম্রতা ও খেদমতে খাল্কের চিহ্ন আচার-আচারণে প্রস্ফুটিত হবে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত জনের মধ্যে অহংকার আমিত্ববোধ, যুলুম, নিঃপীড়ন ঔদ্ধত্যপনা পরিলক্ষিত হবে। আর সে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে তার আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের উপকরণ মনে করবে।

৪. আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান এই যে, কোনো ব্যক্তি সম্মান ও উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করার পর সে যে পরিমাণ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবে এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার কথা স্বীকার করবে, ঠিক সে পরিমাণের বেশীর চেয়ে পুরস্কার ও দয়া দ্বারা তাঁকে ভূষিত করা হবে। হযরত দাঊদ (আ.)-এর পুরো জীবনটাই এর প্রকৃষ্ট সাক্ষী।

৫. মাযহাব-ধর্ম যদিও আত্মার সাথে বেশী সম্পৃক্ত, কিন্তু পার্থিব ক্ষমতা (খিলাফত) ধর্মের প্রধান জিম্মাদার, আর খিলাফত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হলো ধর্মের প্রদর্শিত জীবন বিধানের প্রকৃত রক্ষাকবচ। সতরাং এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা)-এর উক্তিটি প্রনিধাণযোগ্য ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالاَ يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ –

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রশাসন ক্ষমতার অধিকারীর মাধ্যমে প্রতিরক্ষার যে কাজ করেন, কুরআনের মাধ্যমে তা করেন না"। (আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০)

৬. আল্লাহ্ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রদানের ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে যা কিছু ইরশাদ করেছেন তার সারাংশ হলো এই, রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা প্রদান ও তা কেড়ে নেয়ার সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতী হাতে নিহিত। সর্বপ্রথম এ বাস্তব সত্যকে বিশ্বাস করা প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। কেননা পৃথিবীর বড় বাদশাহ ও প্রভাবশালী রাজাদের ইতিহাস এর জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ –

"হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা মর্যাদাবান কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬)

কিন্তু তিনি তাঁর এ মহান অনুগ্রহ ও বখ্‌শিশ প্রদান এবং তা কেড়ে নেয়ার জন্য একটি বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যাকে সুন্নাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র শাশ্বত বিধান বলে আখ্যায়িত করা যায়। সে বিধানটি এরূপ; বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা দু'টি উপায়ে অর্জন করে থাকে। এক. আল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী সূত্রে, দুই. পার্থিব উপায় উপকরণের মাধ্যমে।

প্রথম উপায়ে কোন জাতিকে রাজত্ব প্রদান করা হয় তখন, যখন তার আকীদা ও আমলে পূর্ণভাবে ওয়ারাসাতে এলাহীর (আল্লাহ্র উত্তরাধিকারী) পরিচয় পাওয়া যাবে অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে তার আকীদার সম্পর্ক নির্ভুল ও সঠিক হবে এবং আমলের দিক থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সৎ ও কল্যাণমূলক কাজের মহান স্তরে উন্নীত হবে, কুরআনের পরিভাষায় এঁদের সালিহীন অর্থাৎ সৎ ও যোগ্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ জাতি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পুরস্কার পাবার উপযুক্ত হয় আর এর পরিচিতি হয় খিলাফতে ইলাহীয়ার নামে। প্রকৃতপক্ষে এ জাতিই পৃথিবীতে আল্লাহ্র যোগ্য প্রতিনিধি এবং নবী রাসূলদের পবিত্র উত্তরাধিকারী। আল্লাহ্ তো ওয়াদা করেছেন, যে জাতি আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলের উত্তরাধিকারী হতে পারবে, সে জাতির পার্থিব উত্তরাধিকারী রাজত্বের মালিক হতে পারবে। পার্থিব উপায় উপকরণের পাহাড় পরিমাণ প্রতিবন্ধকতাও যদি সামনে আসে, তবুও এসব কিছুকে ছিন্নভিন্ন করে আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُوْنَ -

"আমি উপদেশের পর যাবূর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার নেক যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

اِنَّ الاَرْضَ لِلّٰهِ يَرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -

"নিশ্চয় যমীনের কর্তৃত্ব আল্লাহ্র কাছে, তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর অধিকারী করেন"। (আল-কুরআন)

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مشيت বা আল্লাহ্র ইচ্ছা বলতে যমীনের কর্তৃত্ব বা অধিকারী হবে তারা, যারা তার 'সালিহ্' বা সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন বিবেচিত হবে। আর যদি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে উপরোক্ত যোগ্যতা না থাকে, তাহলে সে ইসলামের যত দাবীদারই হোক না কেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যমীনের অধিকারী হবার ভাগ্য তার হবে না। আর খিলাফাতে ইলাহীয়াতে তার কোন হক নেই। আর সে জাতিকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ কোন ওয়াদাও করেন নাই।

তবে আল্লাহ্ হিক্মত ও কল্যাণের দৃষ্টিতে যদি দেখেন যে, অমুকের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও নির্বাহ সঠিকভাবে পরিচালিত হবে, তাহলে তিনি যাকে

ইচ্ছা রাজত্ব প্রদান করেন আবার যার কাছ থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন। কোন কিছু ঘটনার সাথে যেমন এর কারণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ঠিক তেমনি রাজত্ব প্রদান ও কেড়ে নেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর কুদ্‌রতী আইনের অনুসরণ করেন। অর্থাৎ রাজত্ব প্রদান ও তা কেড়ে নেয়ার জন্য এত অসংখ্য কারণের উদ্ভব হয় যে গুলোর প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা তো দূরে কথা উপলব্ধির ধারে কাছেও মানুষ পৌঁছতে পারেনা। এ পর্যায়ে সবচাইতে ভয়াবহ ও দুর্ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সে সব মুসলমানদের জন্য, যখন তারা কাফিরদের অধীনস্ত দাসে পরিণত হয়। মুসলমানদের কুকীর্তি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় আর কল্যাণমূলক কাজে যোগ্যতার অভাব প্রকট আকার ধারণ করে তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এধরনের শাস্তি ও অসন্তোষ নেমে আসে। সে পরিস্থিতিতেও নসীহতের ক্ষেত্র রয়েছে। আর তা হলো আল্লাহ্ কাফিরদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে রাজ সিংহাসনের অধিকারী বানান নাই, বরং যমীনের কর্তৃত্বের প্রকৃত হক্‌দারদের দুষ্কর্ম ও অযোগ্যতার দরুন তাদের অধিকার হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং বিশ্বের সাধারণ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে এখন রাজত্ব দেয়া হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলমান কিংবা কাফির অথবা মুশরিক শর্ত নয়।

وَاللّٰهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ –

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব প্রদান করেন।"

আর মুসলমানগণ যদি তাদের অন্তর্দৃষ্টির আবরণ উন্মোচন করত নিজেদের ধ্বংসোম্মুখ জীবনে বিপ্লব সাধন করতে পারে এবং সালিহীন বা যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতীক ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে, তবে আল্লাহ্‌র এ ওয়াদা তাদের সুসংবাদ দান করতে এগিয়ে আসবেই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا –

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন।" (সূরা নূর ঃ ৫৫)

হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালাম

বংশ পরিচয়

হযরত সুলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র বিধায় তাঁর বংশ তালিকাও ইয়াহুদার মাধ্যমে হযরত ইয়া'কূব (আ) পর্যন্ত পৌছায়। তাঁর মায়ের নাম জানা যায় না। তাওরাতে অবশ্য তাঁর মায়ের নাম 'বিনতু সাবা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রথমে সে আওরিয়ার স্ত্রী ছিল পরে হযরত দাউদ (আ)-এর স্ত্রী হওয়ায় তাঁর ঔরযে জন্মগ্রহণ করেন হযরত সুলায়মান (আ)। কিন্তু এ কাহিনী যে মিথ্যা ও বানোয়াট বিগত আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়েছে কাজেই ইতিহাসের আলোকে উক্ত নাম সঠিক নয়।

ইবন মাজা শরীফে উল্লেখিত একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেন : সুলায়মান ইবন দাউদ (আ)-এর মা একদা সুলায়মানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "হে আমার বৎস সারারাত ঘুমিও না ; কেননা রাতের অধিকাংশ সময় নিদ্রায় কাটালে কিয়ামতের দিন তা মানুষকে সৎকর্ম থেকে দরিদ্র বানিয়ে দেবে।"

কুরআন শরীফ তাঁর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে বলেছ যে, তিনি ইয়াকূবের মাধ্যমে ইবরাহীম(আ.)-এর বংশধর ছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داؤد وسليمان –

"এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব ও এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তাঁর বংশধর দাউদ ও সুলায়মানকে।" (সূরা আল্ আন'আম ঃ ৮৪)

অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ ووهبنا داؤد وسليمان

কুরআন শরীফে সুলায়মানের বিবরণ

কুরআন শরীফে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে ১৬ জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে কতক জায়গায় সবিস্তারে আর কতক জায়গায় সংক্ষিপ্তভাবে। তবে তাঁকে ও তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ যেসব অনুগ্রহ, ফযীলত ও সম্মান দান করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে অধ্যয়নের সুবিধার্থে নিম্নে একটি চিত্র তুলে ধরা হলো-

সূরা	আয়াত	সংখ্যা	সূরা	আয়াত	সংখ্যা
বাকারা	১০২	১	নাম্‌ল	১৫,১৬,১৭,১৮,	
নিসা	১৬৩	১		২০,৩৬,৪৪	৭
আ'নআম	৮৫	১	সাবা	৩৪	১
আম্বিয়া	৭৮,৭৯,৮১	৩	সাদ	১২৩,৩৪	২

সর্ব মোট -১৬

শৈশব

মহান আল্লাহ্ সুলায়মান (আ)-কে সৃষ্টিগতভাবেই তীক্ষ্মবুদ্ধি, বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছিলেন, সুতরাং তাঁর শৈশবকালীন ঘটনা এর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হযরত দাউদের আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআনের বর্ণনা ইতিপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

উক্ত আয়াত সম্পর্কিত ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) তাঁর এ রত্নকে চিনতে পেরেছিলেন। যে কারণে শৈশব থেকেই তাঁকে রাজত্ব পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করাতেন। বিশেষ করে বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করতেন।

দাউদের উত্তরাধিকারী

ঐতিহাসিকগণ বলেন হযরত সুলায়মান (আ) যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন হযরত দাউদ (আ.) ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে নবুওয়াত ও রাজত্ব উভয় ব্যাপারে দাউদের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। এভাবেই তিনি নবুওয়াত

প্রাপ্তির সাথে সাথে ইসরাঈলী রাজত্বেরও অধিকারী হন। কুরআন শরীফ স্থলাভিষিক্ত হওয়াকে দাঊদের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

"আর সুলায়মান হয়েছিল দাঊদের উত্তরাধিকারী।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ১৬)

ইব্‌ন কাসীর (র) বলছেন, উক্ত আয়াতে উত্তরাধিকারী বলতে নবুওয়াত ও রাজত্বের উত্তরাধিকারী বুঝানো হয়েছে, সম্পদের উত্তরাধিকারী নয়। কেননা হযরত দাঊদ (আ)-এর আরো অনেক সন্তান ছিল, তাদের বঞ্চিত করা হবে কেন? অধিকন্তু সিহাহ সিত্তার হাদীসসমূহে বহু জালীলুল কাদ্‌র সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَالَ مَعْشَرُ الاَنْبِيَاءِ لاَ نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ-

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমরা নবী-রাসূলদের জন্য সম্পদের উত্তরাধিকারীর বিধান নেই। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সাদাকায় পরিণত হয়"। উক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, নবী-রাসূলদের মৃত্যুর পর তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদের কোন ওয়ারিস হয়না, বরং সেগুলো ফকীর-মিস্‌কীনদের হক এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাদাকা হয়ে যায়। বস্তুত ধন-সম্পদের মত সাধারণ বস্তুত উপর তাঁদের ওয়ারিসী সম্পৃক্ত হোক, এটা নবী-রাসূলদের স্বাভাবিক রুচির পরিপন্থী; কেননা তাঁদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো তাবলীগ, হিদায়েত ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় মানুষকে দাওয়াত দেয়া। সুতরাং জ্ঞান ও নবুওয়াতের মত মহান অনুগ্রহের পরিবর্তে একটি সাধারণ বস্তু তাঁদের উত্তরাধিকারের সাথে যুক্ত হোক এটা কিভাবে পসন্দ করতে পারে? বরং মানবতার ভিত্তিতে জীবন রক্ষার জন্য তাঁদের রেখে যাওয়া সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে ফকীর-মিস্‌কীনদের অংশ হয়ে যাওয়াই উচিত, সম্মানিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী-রাসূলদের বংশ ও গোত্রের জন্য নয়।

নবুওয়াত

যেসব নবী রাসূলের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষিত এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে স্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, আল্লাহ্ যাঁকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, যৌবনের পদার্পণ করার পরই তাঁকে এ মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। যাতে তিনি পার্থিব উপকরণের দৃষ্টিতে স্বভাব সুলভ বয়সের সেই অংশ

অতিক্রম করেন, যে বয়ঃসন্ধিক্ষণে বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতায় পরিপক্কতা অর্জন করতে পারেন। আর সেই সীমারেখার পৌঁছে যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তির মাঝে স্থিরতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। সুতরাং আল্লাহ্র এ শাশ্বত বিধান হযরত সুলায়মান (আ)-এর বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে। যৌবনে পদার্পণের পর তাঁকে রাজত্ব ও খিলাফাতের সাথে সাথে নবুওয়াতের দায়িত্ব ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ–

"আমরা তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ্ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণ ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম।" (সূরা নিসা ঃ ১৬৩)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

"আমরা তাদের প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৭৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا–

"আর আমি দাঊদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দিয়েছিলাম।" (সূরা নাম্ল ঃ ১৫)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর বৈশিষ্ট্য

মহান আল্লাহ্ হযরত দাঊদ (আ.)-এর মত সুলায়মানকে ও কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র গুণাবলীতে ভূষিত করেন এবং তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ দিয়ে সুলায়মানের জীবনকে স্বাতন্ত্র্যের প্রতীকে পরিণত করেন।

পাখির-ভাষা বুঝা

আল্লাহ্ হযরত দাঊদ (আ) ও সুলায়মান (আ) উভয়কে পশু-পাখির ভাষা বুঝার মত বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন। তাঁদের দু'জনের কাছে পাখির কলবর বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের কথাবার্তার মতই মনে হতো। কুরআন শরীফ সুলায়মানের উক্ত মর্যাদা সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالاَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلْنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ- وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ-

"আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর আমাদের শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। সুলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল,হে মানুষ! আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু থেকেই দেয়া হয়েছে, এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ১৫-১৬)

এ আয়াতে مَنْطِقَ الطَّيْرِ বা পাখির ভাষা কথাটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তারা অনুমানের মাধ্যমে পক্ষিকুলের বিভিন্ন শব্দ কলরব থেকে শুধু তাদের উদ্দেশ্যেকে বুঝে নিতেন-এর চেয়ে বেশী কিছু ছিল না, এরূপ বুঝার অবকাশ নেই। কেননা এমন অনেক লোকই তো আছে যারা অনুমানের ভিত্তিতে কিছুটা বুঝতে পারে। পালিত পশুর ক্ষুধা তৃষ্ণার সময়ের শব্দ, আনন্দ ফূর্তির শব্দ , প্রভূকে কাছে দেখতে পেয়ে প্রভূভক্তি ও বিশ্বস্ততার শব্দ, শত্রু দেখে বিশেষ ধরনের চিৎকারের শব্দ থেকে অনেকেই বেছে নিতে পারে যে, কোন্টা কি ধরনের শব্দ। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। অধিকন্তু مَنْطِقَ الطَّيْرِ দ্বারা সে জ্ঞানকেও বুঝানো হয়নি যা আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে অনুমানের ভিত্তিতে কিছু কিছু পশুর কথাবার্তার ধরন আবিস্কার হয়েছে। এবং যাকে Zoology বা প্রাণীবিদ্যা নামে একটি বিভাগে পরিণত করা হয়েছে। কেননা এটা হলো একটা অনুমানের তীর যা পূর্বে বর্ণিত অভিজ্ঞতার পরে ধনুক থেকে নিক্ষেপ করা হয়।

এ ধরনের জ্ঞানকে স্বয়ং প্রাণী বিজ্ঞানের উদ্ভাবকগণও সঠিক বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান বলবেন না, এ ছাড়া এটা এমন একটি সিদ্ধিলাভ বা উপার্জনলব্ধ আর্ট যা অল্পবিস্তর পরিশ্রম করলে প্রত্যেকেই অর্জন করতে পারে। তাহলে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সম্পর্কে এ ধরনের জ্ঞানের প্রেক্ষিতে কুরআন শরীফে এত গুরুত্বের সাথে বর্ণনার কোন প্রয়োজনই ছিলনা। কুরআন শরীফ যে ভঙ্গিতে এর উল্লেখ করেছে এবং সুলায়মানের কৃতজ্ঞতার বাচনভঙ্গী ও লিপিবদ্ধ করেছে; তা থেকে প্রমাণিত হয় যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য এটা

এমন অনুগ্রহ ছিল যাকে মু'জিযা বলা হয়ে থাকে। তাঁরা তো নিঃসন্দেহে পাখির ভাষা:ক বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষের কথাবার্তার মতই বুঝতেন। তাঁদের এ ছিল নিশ্চিতরূপে পার্থিব উপকরণের অনেক ঊর্ধ্বে এবং মহাশক্তিশালী আল্লাহ্র বিশেষ পদ্ধতির অনন্য অনুগ্রহের প্রতিফলন।

কাজেই এ সম্পর্কিত বোধশক্তি এমন স্তরে পৌছতে সক্ষম হয় যে, তার পক্ষে এটা কোন অসম্ভব কথা নয়। কেননা ভাষা ও বোধশক্তি উভয়ের দিকে থেকে ভাষার জন্য কেবলমাত্র শব্দই যথেষ্ট, তার জন্য মানুষের মত বাকপটুত্বের প্রয়োজন নাই পশু পাখির ভাষার মধ্যে শব্দ এবং শব্দের উত্থান-পতন দু'টিই বিদ্যমান। অতএব পাখির ভাষা বুঝা এমন একটি দান ও অপার অনুগ্রহ যাকে আল্লাহ্র নিদর্শন বলা উচিত। এসব নিদর্শন তো কেবল তাদের মত পূত-পবিত্র মনীষীদের জন্যই নির্দিষ্ট। তাফসীরে বায়যাভী ও আমাদের মাঝে مَنْطِقَ الطَّيْرِ। এর তাফসীর প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) ও হযরত দাঊদ (আ) পশু-পাখির ভাষা যে ভাবে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারতেন, তা ছিল সাধারণ লিখিত জ্ঞানের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির এবং তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে মু'জিযার নিদর্শন স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। তবে অবশ্য এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কাযী বায়যাভী (র)-এর মতে, পশুপাখির ভাষা বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন আকৃতিতে কল্পনার সাহায্যে বুঝা যায় আর এ ব্যাপারে নিশ্চিত স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য উপার্জন শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়, বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। হযরত দাঊদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-এর পক্ষে এভাবেই অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের মতে উল্লিখিত মহান পয়গম্বরদ্বয় এদের ভাষা মানুষের কথাবার্তার মতই শুনতেন। হয়তবা এটা শুধু এমন মু'জিযা ছিল যা তাঁদের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণত এদের ভাষা বিভিন্ন অবস্থার দ্বারাই বুঝা যায়। অথবা এমনও হতে পারে যে, তাদের শব্দ যথার্থই ভাষার স্তরের হত, যার দ্বারা একে অপরকে নিজের মনের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে বুঝতে ও বুঝাতে পারত; কিন্তু মানুষের ভাষার চাইতে সেটা ছিল অনেক দুর্বল মানের। হযরত সুলায়মান (আ) ও হুদহুদ পাখির কথোপকথন সম্পর্কে কুরআন যেভাবে ব্যক্ত করেছে তা আমার ব্যাখ্যারই অনুকূলে।

বাতাস বশীভূত হওয়া

হযরত সুলায়মান (আ)-এর সত্য নবুওয়াতের অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, মহান আল্লাহ্ বাতাসকে তাঁর বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বাতাস ছিল তাঁর নির্দেশ পালনের অধীন। সুতরাং হযরত সুলায়মান (আ) যখনই ইচ্ছা করতেন

তখন সকালে একমাসের এবং বিকেলে একমাসের সমপরিমাণ দূরত্ব ভ্রমণ করতেন। কুরআন শরীফ হযরত সুলায়মান (আ)-এর এ বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে তিনটি কথা উল্লেখ করেছে ঃ এক, বাতাসকে সুলায়মানের অধীনে বশীভূত করা হয়। দুই, বাতাস তাঁর এতই অনুগত ছিল যে ঝড়ো ও তীব্র হাওয়া পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে আস্তে চলত ও মৃদু সমীরণে পরিণত হত এবং আরামদায়ক বাতাসের রূপ লাভ করত, তেমন মৃদু ও আস্তে চলা সত্ত্বেও সে বাতাসের গতিবেগ ছিল এরূপ যে, একজন সুনিপুণ অশ্বারোহীর এক মাসের অবিরাম দ্রুত ভ্রমণের সমান দূরত্ব পথ, হযরত সুলায়মানের সিংহাসন বর্তমান যুগের ইঞ্জিন চালিত দ্রুতগামী উড়োজাহাজের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে চলত, আল্লাহ্র হুকুমে সেটা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে উড়ে চলত।

একজন জড়াবাদী প্রকৃতি পূজারী মানুষের দৃষ্টিতে এ বিষয়ে খটকা লাগতে পারে। কিন্তু যুক্তি ও বিবেক বিভিন্ন মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা স্বীকার করছে। কেননা কোনো একজন মানুষ তার বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ অতি সহজেই করতে পারে, অন্যজনের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই আমরা বুঝতে পারি না যে, সে বুদ্ধির পক্ষে আল্লাহ্র বিধান মেনে নেয়াতে অসুবিধা কোথায় ? আল্লাহ্ যেমন সাধারণ নিয়মে বিশেষ কিছু নিয়ম ও প্রাকৃতিক রহস্যও আছে যা আলোচ্য বিষয়টির মতই অসাধারণ। সাধারণ বুদ্ধিমান লোকেরা যার কারণের সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি করে; কিন্তু নবীগণ কারণ ছাড়াই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন। তবে জড়বাদী বিজ্ঞানীরা সে জ্ঞান পর্যন্ত পৌছতে পারেনা। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে যদি এমন একটি বিষয় ঘটেছে বলে অবহিত করানো হয় তাহলে নিছক ধারণা, অনুমান ও বোধশক্তির অভাবে বাস্তবে প্রমাণিত একটি বিষয়কে কি ভাবে অস্বীকর করা যেতে পারে ? যদি কোন একটি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান না থাকে তাহলে বাস্তবে বস্তুটির অস্তিত্ব নেই বলা কতুটুকু যুক্তি সংগত!

সুতরাং বাতাস বশীভূত হওয়া এবং দ্রুত গতিতে ভ্রমণ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে মেনে নেয়াই সহজ পন্থা। এ ক্ষেত্রে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন ও তাঁর সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণ সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থ ও তাফসীরে যেসব বিবরণ উল্লেখ আছে সবগুলোই ইসরাঈলী ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইব্ন কাসীরের মত মুহাক্কিক মনীষী ও সেসব বর্ণনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন। অথচ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বর্ণনাগুলোর ব্যাপারে সঠিক অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে কুরআন শুধু এতটুকুই বলেছে ঃ

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهِ اِلَى الاَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

"এবং সুলায়মানের জন্য বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত সে দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি, প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮১)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ

"আমি সুলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় একমাসের পথ অতিক্রম করত"। (সূরা সাবা ঃ ১২)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ-

"অতঃপর আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেথায় মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।" (সূরা সাদ ঃ ৩৬)

জ্বিন ও পশু-পাখি তাঁর বশীভূত ছিল

হযরত সুলায়মান (আ)-এর কর্তৃত্বের একটি মহান বৈশিষ্ট্য যা বিশ্বের আর কেউ লাভ করতে পারেনি তা হল, শুধু মানব জাতিই তার অধীনে ছিলনা বরং জ্বিন পশু ও পাখি পর্যন্ত তার আদেশের অনুগত ছিল।

সব কিছুই হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রজ্ঞাময় ক্ষমতার অনুগত ও হুকুমের অধীন ছিল। কতিপয় অবিশ্বাসী মু'জিযা, জ্বিনের অস্তিত্ব এবং এ জাতীয় আরো কিছু বিষয়ে যেমন অবিশ্বাস করে ঠিক তেমনি আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারকে বিস্ময়ক ও হাস্যাস্পদ অভিহিত করে তারা বলে, এ ক্ষেত্রে জ্বিন বলতে এমন প্রকটি সম্প্রয়দায়কে বুঝানো হয়েছে যারা সে যুগের সবচাইতে বিশাল দেহের অধিকারী দানবাকৃতির মানুষ ছিল। হযরত সুলায়মান (আ) ব্যতীত আর কেউ তাদের করায়ত্তে আনতে পারেনি। পশু-পাখি তাঁর বশীভূত ছিল, এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো, কুরআন শরীফে ত এপর্যায়ে শুধু হুদহুদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছ। মূলত হুদহুদ কোন পাখির নাম নয় বরং এটা একজন মানুষের নাম। মানুষের নাম, যে পানির অন্বেষণে নিয়োজিত ছিল। আর সে যুগের মানুষের মাঝে একটা প্রথা দীর্ঘকাল থেকে চালু ছিল যে, কেউ কোন পশু বা পাখি পালন

করলে এর নামানুসারে তার সন্তানের নাম রাখত। সুতরাং আধুনিক যুগের এ বিষয়ে নেপুটিজম নামে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখার উদ্ভব হয়েছে।

এ ধরনের উদ্ভট ও বিকৃত ব্যাখ্যাকারীগণ হয় অবিশ্বাসের উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এরূপ বলেছে, না হয় কুরআনের জ্ঞান থেকে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও দলীলহীন দাবীতে বাড়াবাড়ি করছে।

কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় জ্বিন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, তারাও মানুষ থেকে ভিন্ন একটা সৃষ্টি। সুতরাং এ পর্যায়ে 'কাসাসুল কুরআন' ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু সে আয়াতটি পেশ করেই ক্ষান্ত থাকতে চাই, যা এ ব্যাপারে ফয়সালাকারী বাক্য হিসেবে পরিগণিত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ-

"আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

উক্ত আয়াতে জ্বিনকে মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করে উভয়ের সৃষ্টি রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে জ্বিনকে মানুষেরই অন্তর্গত শক্তিশালী জাতিরূপে আখ্যায়িত করা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। অনুরূপভাবে হুদহুদকে পাখি বলে কুরআনে স্পষ্টত উল্লেখ থাকার পরেও কারো পক্ষে এর বিপরীত মনগড়া ব্যাখ্যার অধিকার নেই। কুরআনে আছে ঃ

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ -

"তিনি (সুলায়মান) পাখির সন্ধান নিলেন এবং বললেন, ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে ! না কি সে অনুপস্থিত" (সূরা নাম্ল ঃ ২০)

মোটকথা হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ অনন্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। কেননা মানুষ ছাড়া জ্বিন পশু-পাখি এবং বাতাসের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। আল্লাহরই নির্দেশে এরা সবাই তাঁর আনুগত্য করত। এর কারণ ছিল এই, একদা হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহ্র দারবারে দু'আ করে বলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

"সে (সুলায়মান) বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়, তুমি তো পরমদাতা"। (সূরা সাদ ঃ ৩৫)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তার দু'আ কবুল করে। এবং এমন বিস্ময়কর ও অদ্ভুত কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে ও কারো ভাগ্যে জুটেনি আর না পরে কারো ভাগ্য জুটবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা.) বলেন, গতকাল এক অবাধ্য জ্বিন হঠাৎ করে এসে আমার নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আমার আয়ত্তে এনে দেন। ফলে আমি তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হই। অতঃপর তাকে আমি মসজিদের থামের সাথে বেঁধে রাখার মনস্থ করি, যাতে দিনের বেলায় তোমরা দেখতে পার। কিন্তু যখন আমার ভাই সুলায়মানের এ প্রার্থনার কথা মনে পড়ল যে, তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেছিলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ –

"হে আমার পরোয়ারদেগার! আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর, যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়।" এ কথা স্মরণ হতেই তাকে অপমানিত করে ছেড়ে দিলাম। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ফাতহুলবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬)

নবী করীম (সা.)-এর বাণী "সুলায়মানের দু'আ' মনে পড়ল। এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা যদিও আমাকে সমস্ত নবী-রাসূলের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং জ্বিন জাতিকে বশীভূত করার ক্ষমতা ও আমাকে দেয়া হয়েছে, তাই তা প্রদর্শন করা সমীচীন মনে করিনি।

বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ

মহান আল্লাহ্ জ্বিন জাতিকে এমন এক সৃষ্টিরূপে পরিণত করেছেন, যে কঠিন থেকে কঠিনতম ও দুঃসাধ্য কাজ সহজেই করতে পারে। এ কারণে হযরত সুলায়মান (আ.) মসজিদের চারপাশে বিরাট বড় একটি নগর স্থাপনের এবং মসজিদটি পুনরায় প্রথম থেকে নির্মাণ শুরু করার ইচ্ছা পোষণ করেন। মসজিদ ও শহরটি বহু মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মাণের বাসনায়, তিনি দূর দূরান্ত থেকে সুন্দর বড় বড় পাথর সংগ্রহ করেন। উল্লেখ্য সে যুগের সীমিত যাতায়াত ব্যবস্থা ও পরিবহন সংকটের কারণে হযরত সুলায়মান (আ)-এর উক্ত বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই জ্বিন জাতিই কেবল এ কঠিন কাজ করতে পারবে মনে করে তিনি তাদের কাছ থেকেই সেবা নিতে শুরু করেন। দূর দূরান্ত থেকে তারা অতীব সুন্দর ও বড় বড় পাথর সংগ্রহ করে আনতে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজ শুরু করতে থাকে। সাধারণত প্রসিদ্ধ যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর আমলেই মসজিদে আক্সা বা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয়েছে। কিন্তু

এটা সঠিক নয়। কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফে সহীহ্ মারফূ' হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আবু যার গিফারী (রা.) নবী (সা.)কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি উত্তরে বলেন, মসজিদে হারাম, আবূ যার (রা) আবার জিজ্ঞাসা করেন, তারপর কোন্ মসজিদ নির্মিত হয়? তিনি বলেন, মসজিদে আক্সা। তৃতীয় বারের মতো প্রশ্নে হযরত আবূ যার (রা) বলেন, এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধান কত দিনের? তখন নবী (সা.) ইরশাদ করেন, এ দু'টি নির্মাণের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান ছিল। অথচ মসজিদে হারামের নির্মাতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও সুলায়মান (আ.) এর মাঝে এক হাজার বছরের চাইতেও অধিক সময়ের ব্যবধান রয়েছে। কাজেই হাদীসের মর্মার্থ এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) যেমন মসজিদে হারাম নির্মাণের কারণে মক্কার বসতি স্থাপন শুরু হয়, ঠিক তেমনি হযরত ইয়াকূব (আ.) ও বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেন, যার ফলে অত্র অঞ্চলের বসতি গড়ে উঠে। তার দীর্ঘকাল পর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নির্দেশ মসজিদ ও শহরের নতুনভাবে সংস্কার করা হয় এবং জ্বিন বশীভূত ছিল কারণে অতুলনীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্য কর্ম ধরাপৃষ্ঠে অস্তিত্ব লাভ করেছে। যা অদ্যাবধি মানুষের জন্য বিস্ময়কর কাজ হিসেবে পরিগণিত। কেননা বিশাল আকৃতির পাথর কোথেকে আনা হল, কেমন করে আনা হল এবং এত ভারীবস্তু উঠানোর জন্য যন্ত্রপাতিই বা কিরূপ ছিল, যার মাধ্যমে পাথরগুলোকে এত উঁচুতে পৌছাতে এবং পরস্পর গাঁথুনি দিতে সক্ষম হয়?

জ্বিন সম্প্রদায় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নির্দেশ বায়তুল মুকাদ্দাস ছাড়াও আরো অনেক নির্মাণ কাজ করেছে এবং এমন কিছু জিনিস তৈরী করেছে যেগুলো তৎকালীন যুগের আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। এ পর্যায়ে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ –

"এবং শয়তানদের (জ্বিন) মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ছাড়া অন্য কাজও করত, আমি তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮২)

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ – يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ

وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّسِيَتٍ اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا
وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ –

"জ্বিনদের কতক তার সামনে কাজ করত আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, ভাস্কর্য, হাওয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। আমি বলেছিলাম, 'হে দাউদ পরিবার। কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা ঃ ১২-১৩)

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ

"সুলায়মানের সামনে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে জ্বিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং তাদের বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ১৭)

وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ–
هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ–

"এবং শয়তানদের (জ্বিন) যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরো অনেককে। এসব আমার অনুগ্রহ এ থেকে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার, এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।" (সূরা সাদ ঃ ৩৭-৩৯)

হযরত শাহ আবদুল কাদির (আল্লাহ্ তাঁর কবর উজ্জ্বল করুন) বলেন, মহান আল্লাহ্ হযরত সুলায়মান (আ) কে প্রচুর সম্পদ দান করে বলেছিলেন, এ প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য ও অপরিসীম সম্পদ থেকে তুমি ইচ্ছেমত ব্যয়, দান খয়রাত কিংবা আটকে রাখতে পার। কেউ কোন রকম বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু এ অধিকার লাভ সত্ত্বেও হযরত সুলায়মান (আ) যাবতীয় সম্পদ ও কর্তৃত্বকে আল্লাহ্র সৃষ্টির জন্য 'আমানতে ইলাহী' মনে করতেন এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে একটি টুক্‌রাও খরচ করতেন না; বরং তিনি ঝুড়ি বানিয়ে বিক্রি করে যা কিছু পেতেন তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

তাফসীরে বায়যাভীর রচয়িতা এ ক্ষেত্রে একটি ইসরাঈলী বর্ণনা সংকলন করেছেন। জ্বিন জাতি সুলায়মানের সিংহাসনটি এক অভিনব প্রযুক্তি খাটিয়ে তৈরি করেছিলেন। সিংহাসন নিচে বিশালাকৃতির হিংস্র বাঘ দাঁড়িয়ে থাকতো এবং এর

সাথে দু'টি শকূন ঝুলানো থাকত। হযরত সুলায়মান (আ.) যখন সিংহাসন আলোকিত করার উদ্দেশ্যে কাছে আসতেন তখনই বাঘ দু'টি তাদের বাহু সম্প্রসারিত করে বসত এবং সিংহাসন নিচু হলে তিনি তাতে আসন গ্রহণ করতেন। তখন বাঘ দু'টি পুনরায় দাঁড়িয়ে যেত আর তৎক্ষণাৎ ভয়ংকর শকূনগুলো পাখা মেলে তাঁর মাথার উপর ছায়ার আবরণ তৈরি করতো। এমনিভাবে তিনি পাথর দিয়েও বিরাট বড় ও ভারী ডেগ তৈরি করেন। সেগুলো বেশী পুরো ও ভারী হবার কারণে নড়ানো যেত না, কাজেই সবসময় চুলার উপর স্থায়ী থাকত। এছাড়া তিনি পাথর ভেঙ্গে বড় বড় হাওয বানিয়েছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন শহর ও মসজিদে আক্সা এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মে তাঁর মাত্র সাত বছর সময় লেগেছিল। (তাফ্সীরে বায়যাভী, সূরা সাবা)

"সুলায়মান বাদশাহ লোকদেরকে মজুর হিসেবে রেখে সদাপ্রভুর গৃহ (মস্জিদ ও জেরুযালেম নগরী) আর নিজের প্রাসাদ (সুলায়মানের প্রাসাদ) মূল শহর, জেরুযালেমের শহরতলী, হাসুর, মাজদু ও জাযের নগরী নির্মাণ করেন। তিনি জাযের ও বায়তে হোরানো নিম্নাঞ্চল পুনঃনির্মাণ করেন এবং বালাত ও দশতে তাদাম্নুরকে রাজ্যের মাঝখানে নিয়ে আসেন। সুলায়মানের সমগ্র রাজকোর অঞ্চল, শকটের গ্যারেজ, গাড়োয়ানদের জনপদ ইত্যাদি সহ তার যা কিছু বাসনা ছিল তিনি জেরুযালেম লেবাননে তৈরি করেন এবং রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলে অনেক ইমারাত তৈরি করেন"। (সম্রাট পুস্তক (১) অধ্যায় ৯, শ্লোক-২০-২৫)

এছাড়া পাথর দিয়ে বিরাট আকারের হাওয নির্মাণ, বড়বড় ডেগ তৈরি এবং ভাস্কর্য স্থাপনের জন্য তিনি বহু মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। তার একটা দীর্ঘ তালিকা তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। (সম্রাট পুস্তক (১) অধ্যায় ৭-৮)

তামার ঝর্ণা

হযরত সুলায়মান (আ.) ছিলেন বিরাট গগণচম্বী অট্টালিকা এবং সুদৃঢ় দূর্গ নির্মাণের বিশেষ আগ্রহী এবং এসব স্থাপত্য কর্মে তাঁর অনুরাগ ও ছিল অপরিসীম। এসব নির্মাণ কাজে চুন-সুরকির পরিবর্তে গলিত ধাতু ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল যে, বিপুল পরিমাণ গলিত ধাতু কোথায় পাওয়া যাবে? হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটা আশু ব্যবস্থা কামনা করেন। সুতরাং মহান আল্লাহ্ সুলায়মানের সমস্যার একটা সুন্দর সমাধান করে দিলেন, তাকে গলিত তামার ঝর্ণার সন্ধান দিয়ে দিলেন।

কতক মুফাস্সির বলেন, মহান আল্লাহ্ প্রয়োজন অনুসারে তামা গলিয়ে দিতেন। আর সুলায়মান (আ.)-এর জন্য এটি একটা নিদর্শন। তাঁর আগে কেউ ধাতু গলানোর ব্যাপারটা জানত না।

নাজ্জার বলেন, পৃথিবীর যে স্থানে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তামাগুলো তরল হয়ে পানির মত প্রবাহিত হয়, আল্লাহ্ সে ঝর্ণার সন্ধান দেন হযরত সুলায়মানকে, আর তাঁর আগে অন্য কেউ পৃথিবীর এ ধাতুর ঝর্ণা সম্পর্কে অবহিত ছিল না। (কাসাসুল আম্বিয়া, (আরবী) পৃ. ৩৯৩)

ইব্ন কাসীর (র.) হযরত কাতাদা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ সুলায়মানকে যে গলিত ঝর্ণার সন্ধান দিয়েছিলেন সেটা ইয়ামান দেশে অবস্থিত ছিল। কুরআনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি, তার উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তুর সত্যতার জন্য যথেষ্ট। কাজেই কোন পাঠক আগ্রহী হলে যে কোন একটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

তাওরাতে হযরত সুলায়মানের এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ নেই।

হযরত সুলায়মান (আ.) এবং যুদ্ধের ঘোড়ার বিবরণ

কুরআন শরীফে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এভাবে দিয়েছে ঃ

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ - إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ -

"আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী। যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল সে তখন বলল আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। এগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো। অতঃপর সে তাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল।" (সূরা সাদ ঃ ৩০-৩৩)

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবা কেরাম (রা.) থেকে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক. হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা.)-এর, দুই. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর। তবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বক্তব্যটি হাসান বাসরী (র.)-এর সনদে এবং আলী ইব্ন তালহার সনদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনাটি ছিল এরূপ ঃ একদা হযরত সুলায়মান (আ.) এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার সময়

আস্তাবল থেকে সবগুলো ঘোড়া নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। ঘোড়া নিয়ে আসা হলে তিনি দেখাশোনা ও পরখ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আসরের নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে সূর্য ডুবে গেল। হযরত সুলায়মান (আ.) সম্বিত ফিরে পেয়ে একথা স্বীকার করলেন যে, আল্লাহ্‌র স্মরণের চাইতে সম্পদের আসক্তি আমাকে পেয়ে বসেছে। অতঃপর তিনি চিন্তিত ও রাগান্বিত হয়ে ঘোড়াগুলোকে পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন এবং আল্লাহ্‌র যিক্‌রে আবেগাপ্লুত হয়ে সবগুলোকে যবাই করে দেন। কেননা এগুলোর কারণেই তিনি তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন। উক্ত তাফসীর অনুযায়ী أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ আয়াতের অর্থ হলো, "আমি তো আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে সম্পদের আসক্ত হয়ে গিয়েছিলাম"। আর حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ মধ্যে توارت শব্দের সর্বনাম شمس বা সূর্যের প্রতি ধাবিত যা বাক্য থেকে উহ্য রয়েছে। মূলে বাক্যটি ছিল تَوَارَتِ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ আর طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالاَعْنَاقِ বাক্যের অন্তর্গত مَسْحٌ শব্দের অর্থ মারা, আঘাত করা। অর্থাৎ এসব ঘোড়ার গোড়ালী ও ঘাড় কেটে দেন।

ইব্‌ন কাসীর (র.) সহ অধিকাংশ প্রাচীন মনীষীগণ এ মত পসন্দ করেছেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর এ কাজটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ ছিল না বরং খন্দক যুদ্ধের অনুরূপ একটি ঘটনা ছিল। এ যুদ্ধে নবী (সা.)-এর আসর নামাযের সময় চলে গিয়েছিল, পরে তিনি সাহাবাদের নিয়ে সূর্য অস্ত যাবার পর তা কাযা করে নেন। (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, সূরা সাদ; তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫)

অতঃপর যখন হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহ্‌র যিকরের প্রেমে আবেগাপ্লুত হয়ে সর্বোত্তম ঘোড়াগুলো যবাই করে দেন, তখন আল্লাহ্ বাতাসকে তাঁর বশীভূত করে দিয়ে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন।

(তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, সূরা সাদ)

২. হযরত হাসান বাস্‌রী (র.)-এর সনদে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী ঘটনাটি এরূপ ঃ একদা সুলায়মান (আ.) যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধাকল্পে ঘোড়াগুলোকে উপস্থিত করতে নির্দেশ দেন। ঘোড়া উপস্থিত করার পর পূর্বালোচিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন সুলায়মান (আ.) সেগুলোকে ফিরিয়ে আনেন এবং গোড়ালী ও ঘাড়ে আস্তে আস্তে আঘাত করে বলেন, ভবিষ্যতে তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল করে দিও না।

উক্ত বর্ণনার ধারানুযায়ী مَسْحٌ এর অর্থ আস্তে আস্তে আঘাত করা। তাফসীরের ভাবার্থ এই, যদিও নামায থেকে এ অবহেলার কারণ ছিল মূলত জিহাদ সম্পর্কিত ব্যস্ততা ও প্রস্তুতি, তা সত্ত্বেও সুলয়মান (আ.) ঘোড়াগুলোকেই বাহ্যিক কারণ মনে করেন এবং মনের বেদনা প্রকাশ করেন। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, তিনি ঘোড়াগুলোকে পশু ভেবে তাঁর রাগ ও ক্রোধের স্বীকারে পরিণত করতে চাননি বরং মোটামুটি বেদনা প্রকাশের নিমিত্ত এরূপ আচরণ করেন।

৩. আলী ইব্‌ন আবূ তালহার সনদে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর এ তাফসীর উপরে বর্ণিত দু'টি তাফসীর থেকে ভিন্ন। এতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে নামাযের সময় চলে যাওয়া কিংবা সূর্য ডুবে যাবার কোন ব্যাপারই নেই, এমনকি ঘোড়া যবাই করার কোনো ঘটনাই আলোচিত হয়নি বরং ঘটনাটি এরূপে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার সময়কালীন এক বিকেলে হযরত সুলায়মান (আ.) জিহাদের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াগুলোকে আস্তাবল থেকে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। ঘোড়ার বংশসূত্র, দৈহিক গঠন প্রকৃতিও গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। যখন সেগুলো উপস্থিত করা হল তিনি তাদের দ্রুতগতি; ছিপছিপে মযবুত গড়ন এবং অধিক সংখ্যায় পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে লাগলেন, আমি ঘোড়াগুলোকে আমার সম্পদের মতই ভালবাসি, আর নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সুলায়মন (আ) যখন এ ধরনের চিন্তায় বিভোর; ওদিকে ঘোড়াগুলো তখন আস্তাবলের দিকে ফিরে চলছে তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন ঘোড়াগুলো তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। সাথে সাথে সেগুলো ফিরিয়ে আনার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর ফিরিয়ে আনা হলে হযরত সুলায়মান (আ) এদের আদর করেন এবং যুদ্ধাস্ত্রের প্রতি সোহাগ ও মর্যাদা প্রদর্শনের মতই এদের পায়ের গোছা ও গর্দানে হাত বুলিয়ে থাপ্পড় দিতে থাকেন। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত হলো তিনি এদের বশ মানাতে থাকেন।

উক্ত তাফসীর অনুযায়ী আয়াত اِنِّىْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ -এর অনুবাদ হবে এরূপ "নিঃসন্দেহে সম্পদের ভালবাসা (অর্থাৎ জিহাদের ঘোড়াকে ভালবাসা) আল্লাহ্‌র যিকরের অন্তর্ভুক্ত।" আর تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ বাক্যে تَوَارَتْ শব্দের সর্বনাম صَافِنَاتُ الْجِيَادِ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত অর্থাৎ ঘোড়াগুলো যখন চোখের আড়ালে চলে যায়। এ অবস্থায় شمس শব্দটি মানার দরকার পড়ে না। আর طَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ আয়াতাংশের مَسْحٌ

শব্দের অর্থ স্পর্শ করা এবং হাত বুলানো, যা সাধারণত অভিধানে প্রসিদ্ধ (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; তারীখ ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫)

ইব্ন জারীর তাবারী ও ইমাম রাযী এ তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়ে সঠিক বলে মনে করেন এবং বলেন ঘোড়ার সংখ্যা ছিল হাজার হাজার আর জিহাদের জন্য সেগুলোকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। আর এটা তো স্পষ্ট যে হযরত সুলায়মানের নামায ছুটে যাওয়াতে পশুগুলোর কি অপরাধ ছিল যে, এদের শাস্তি দিতে হবে? এসব বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত আয়াতের সে তাফসীরটি বিশুদ্ধ নয়। যা হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

বিচার্য বিষয়

বিভিন্ন বর্ণনা ও মুফাসরিরদের বক্তব্য অধ্যয়ন সঠিক বলে মনে হয়। কেননা, এতে কোন শব্দ উহ্য মানারও দরকার পড়ে না এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতিও এমন একটি কাজ আরোপিত হয় না, যা যুক্তিতে অসমীচীন বলে মনে হয়।

আর এ পর্যায়ে ইব্ন কাসীর ও ইব্ন জারীর (র.) কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের যে উত্তর দিয়েছেন, তাও অযৌক্তিক ব্যাখ্যার চাইতে বেশী কিছু নয়। কেননা তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহান পয়গম্বর। তাঁর জীবনে এমন কোন ঘটনার সূত্রপাত হয়নি যে দশ-বিশ হাজার ঘোড়া যবাই করে দিলেন আর তাঁর জাতির মধ্যে এ ধরনের কাজ প্রচলিত ও পসন্দনীয় মনে হতো বলে চালিয়ে দিলেন, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা। অনুরূপভাবে ইব্ন কাসীরের এ বক্তব্যটিও অযৌক্তিক যে, হযরত সুলায়মান (আ) গাফলতীর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যখন হাজার হাজার উত্তম ঘোড়া যবাই করে দেন, তখন আল্লাহ্ এর বিনিময়ে বাতাসকে তাঁর বশীভূত করে দেন। কথাটি যদিও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু কুরআনের বক্তব্যের সাথে এর সামঞ্জস্য নেই। কেননা আলোচ্য ঘটনাটি একটি অভিনব ঘটনা, কুরআনে বিন্দুমাত্র ইংগিতও করা হয়নি যে, এর সাথে বাতাস বশীভূত হওয়ার ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে। অথচ কুরআনের সাধারণ বর্ণনাভঙ্গি অনুযায়ী এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ থাকা দরকার ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ) যেহেতু আমার সন্তুষ্টির মধ্যে এ কাজ করেছেন কাজেই এর বিনিময়ে আমি বাতাসকে তাঁর অনুগত বশীভূত করে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করেছি। কিন্তু এর বিপরীতে বাতাস বশীভূত করার ব্যাপারটিকে এমন ঘটনার সাথে জুড়ে দিয়েছে যার সাথে সুলায়মানের পরীক্ষার সম্পর্ক জড়িত। অর্থাৎ সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাত কামনা করার সময় এই দু'আ করেছিলেন যে, তাঁকে এমন এক

কর্তৃত্ব দান করা হোক যা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে দেয়া না হয়। মহান আল্লাহ্ জ্বিন, পশু-পাখি ও বাতাসকে তাঁর বশীভূত করার মাধ্যমে দু'আ কবূল করেন। (সূরা সাদ)

মোটকথা صفنات الجياد অর্থাৎ 'ঘোড়াগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে' এ অর্থ মেনে নেয়ার পর হযরত সুলায়মানের ঘোড়ার আরোহীদের পরিত্যাগ করার প্রশ্ন উঠে না, জিহাদের ময়দানে তাদের দ্বারা কোন কাজ করানো হয়েছে কিনা তারও প্রমাণের প্রয়োজন পড়েনা, জ্বিন ও বাতাস বশীভূত করার সাথে এ ঘটনার সম্পর্ক ছিল কিনা এবং আয়াতে شمس শব্দটি উল্লেখ কিংবা উহ্য ছিল আর এতগুলো ঘোড়াকে একসাথে যবাই করা পসন্দনীয় কাজ কিনা, এসবের কোন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর এ বক্তব্যটিই অগ্রগণ্য ও সঠিক।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষা

মহান আল্লাহ্ হযরত সুলায়মান (আ.) কে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন, সূরা সাদে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ -

"আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর একটি ধড় রাখলাম। অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হলো। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমি তো পরমদাতা। তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত মৃদুমন্দ গতিতে প্রাবহিত হত"। (সূরা সাদ ঃ ৩৪-৩৬)

উক্ত আয়াতে কি কারণে হযরত সুলায়মান (আ) কে পরীক্ষা করা হয়েছে তা পরিস্কার করে বলা হয়নি, তবে এতটুকু ইশারা করা হয়েছে তার সিংহাসনের উপর একটি দেহ (ধড়) নিক্ষেপ করা হয়। অধিকন্তু এ সম্পর্কে হাদীসেও কোন বিবরণ নেই। সুতরাং তাফসীরবিদগণ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে দু'টি মত পোষণ করেন।

১. কিয়াস, ধারণা ও নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমাদের কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত নয়? আর অন্তত এতটুকুন বিশ্বাস রাখা সমীচীন যে, আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন, সুলায়মানকে তিনি কোন একটি পরীক্ষায় ফেলেছেন। এর সাথে তখতে সুলায়মানীর উপর একটি মৃতদেহ নিক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বিস্তারিত ঘটনা অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) মহান নবীদের মতই আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হন এবং প্রথমেই মাগফিরাত কামনা করেন। অতঃপর অশ্রুতপূর্ব ও অনন্য এক রাজ্যের জন্য দু'আ করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবুল করেন এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিষ্ঠিত করে বলেন : وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনি আমার নৈকট্য লাভ করেছেন এবং উচ্চ মর্যাদার আসীন হয়েছে আর শুভ পরিণাম হাসিল করেছেন।" (সূরা সাদ : ৪০)

আয়াতগুলোর আলোচ্য তাফসীরকে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীর, ইব্ন হাযম ও কতক অভিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও মুফাসসির পছন্দ করেছেন।

২. উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও আয়াতের ব্যাখ্যা এমনভাবে করা উচিত যাতে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বা সংশয় সন্দেহ অপনোদন করা যায়।

এ পর্যায়ে তাফসীর্‌বিদগণ যে সব তাফসীর করেছেন তন্মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য।

এর মধ্যে একটি তাফসীর করেছেন ইমাম রাযী এবং অপরটি করেছেন কতিপয় মুহাদ্দিসীন কেরাম।

ইমাম রাযীর তাফসীরের সারসংক্ষেপ

এক সময় হযরত সুলায়মান (আ.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, তাঁর অবস্থা এতই নাজুক হয়ে যায় যে, তাঁকে সিংহাসনে বসানো হলে মনে হত যেন প্রাণহীন একটি দেহ। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে সুস্বাস্থ্য দান করেন। তিনি সুস্থ হয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার প্রথম পর্যায়ে পয়গম্বরী মর্যাদানুযায়ী মাগফিরাত কামনা করেন। অতঃপর নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন যে, হে আল্লাহ্! আমাকে অদ্বিতীয় কর্তৃত্ব ও অনন্য রাজ্য দান কর। (তাফসীর কাবীর, সূরা সাদ)

ইমাম রাযীর উক্ত তাফসীর অনুযায়ী وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ আয়াতের 'ফিত্‌নার' অর্থ কঠিন রোগ। আর وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا আয়াতে 'দেহ নিক্ষেপ' অর্থ হল, কঠিন রোগের কারণে সুলায়মানের দেহ যেন প্রাণহীন অবস্থায় সিংহাসনে পড়ে থাকত ...অর্থ সুস্বাস্থ্যের দিকে ফিরে আসা অর্থাৎ সুস্থ হওয়া।

এ থেকে বুঝা যায়, পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই। সুলায়মান (আ.) যেন عين اليقين বা প্রত্যক্ষদর্শীর মত বিশ্বাসীর স্তরে উন্নীত হয়ে বুঝতে সক্ষম হন যে, তাঁর এত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই রাজত্ব এমনকি তাঁর নিজের উপর পর্যন্ত তাঁর আয়ত্তে নাই। অতঃপর তিনি যেন মহান নবীদের মতই আল্লাহ্‌র সামনে বিণয়াবনত হয়ে নম্রতা প্রদর্শন করেন এবং মাগফিরাত কামনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে পারেন। কতিপয় মুহাদ্দিসও আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একদা সুলায়মান (আ.) মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমি অদ্য রজনীতে সকল স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলে যত ছেলে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা সবাই জিহাদের ময়দানে যাবার জন্য উপযুক্ত মুজাহিদ হবেন। কিন্তু এ ধারণার সময় اِنْ شَاءَ اللّٰهُ 'যদি আল্লাহ্ চান' বলতে ভুলে যান। একজন মহান নবীর এহেন আচরণ আল্লাহ্ অপসন্দ করলেন। অতঃপর তিনি সুলায়মানের উক্ত দাবী এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করেন যে, সমস্ত স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র একজন স্ত্রীই একটি মৃত শিশু প্রসব করে। তিনি তখন সিংহাসনে অবস্থান করছিলেন, একজন খাদেম মৃত শিশুটিকে নিয়ে তাঁর সামনে রেখে দেয়। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) সম্বিত ফিরে পেয়ে বুঝতে পারেন যে, এটা তাঁর আল্লাহ্‌র উপর সমর্পণ না করা এবং 'ইনশা আল্লাহ্' না বলে নিজের বক্তব্যকে জোরদার করার পরিণাম। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হয়ে মাগফিরাত কামনা করেন এবং কুরআনে উল্লেখিত ভাষায় দু'আ করেন। মুহাদ্দিসীনগণ এ তাফসীরের সমর্থনে বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীস দলীল হিসেবে পরিবেশন করেন। বিখ্যাত মুফাসসির আবু সাউদ ও সাইয়্যেদ মাহ্‌মুদ আলূসী (র.) ও এ ব্যাখ্যাটি পসন্দ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَاُطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَاَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَاَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا اِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا اِحْدٰى شِقَّيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, একদা সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) বলেন, আমি আজ রাত ৭০ জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব, তারা প্রত্যেকেই অন্তঃসত্ত্বা হবে এবং এমন ঘোড়সাওয়ার বীর সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে পারবে। তখন তাঁর জনৈক সাথী

বললো إِنْ شَاءَ اللهُ। 'আল্লাহ্ যদি চান'। কিন্তু সুলায়মান এ বাক্যটি বলেননি। ফলে শুধুমাত্র একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউ অন্তঃস্বত্ত্বাই হয়নি। তদুপরি অন্তঃসত্তা স্ত্রীটি একটি বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করে। অতঃপর নবী (সা.) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) যদি إِنْ شَاءَ اللهُ। বলতেন, তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে মুজাহিদ প্রসব করত। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

একটি পর্যালোচনা

উপরোক্ত দু'টি তাফসীরে লক্ষণীয় বিষয় হলো ইমাম রাযী (র.) প্রথম যে ব্যাখ্যাটি পসন্দ করেছেন, সেটা কিয়াসী ব্যাখ্যা, এছাড়া আয়াতের অন্তর্গত বাক্যগুলোকে যেভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাও সঠিক থেকে দূরের ব্যাখ্যা। তবে রোগ-শোক দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সুলায়মানের রাজ সিংহাসনে القاء جسد। 'দেহ নিক্ষেপ' বলতে জীর্নশীর্ণ অবস্থায় তাঁর আসন গ্রহণ করা বুঝানো প্রচলিত অর্থের বিপরীত। আয়াতে যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, তাঁর রাজাসনে এমন একটি বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছে যা সুলায়মানের পরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। উপরন্তু اناب। শব্দের অর্থ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মাগফিরাত কামনা ও দাসত্ব প্রকাশের জন্য আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। অথচ এখানে সুস্থতার দিকে ফিরে যাওয়ার অর্থ গ্রহণ করা মানানসই কথা নয়। অনুরূপভাবে কতিপয় মুহাদ্দেসীনের তাফসীরে যা আবু সাউদ ও সাইয়েদ মাহমুদ আলূসী (র.) পসন্দ করেছেন, তাও আলোচ্য আয়াতের তাফসীর নয়। কেননা বুখারী কিংবা অন্যান্য হাদীসের কিতাবে যেখানেই উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যেখানে কোনোভাবেই এমন কোন শব্দ বা বাক্য পাওয়া যায় না যা নবী (সা.) অথবা আবু হুরায়রা (রা.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন কিংবা এর দিকে ইশারাও করেছেন। বরং হযরত সুলায়মান (আ.) এর ঘটনাবহুল জীবনের স্বতন্ত্র একটি ঘটনা প্রসঙ্গে এ হাদীসটি বনর্ণা করা হয়েছে। যেমন উক্ত অধ্যায়ে অন্যান্য কতগুলো ঘটনা সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, নবী (সা.) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে দু'জন মহিলা তাদের দু'টি শিশুসন্তান নিয়ে একসাথে ভ্রমণ করছিল। পথিমধ্যে ঘটনাচক্রে একজন স্ত্রীলোকের সন্তানকে নেকড়ে ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর বেঁচে থাকা শিশুটিকে নিয়ে দু'জন মহিলাই পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দেয়। তাদের দু'জনেরই দাবী যে শিশুটি আমার অন্যজনের শিশুকে নেকড়ে নিয়ে গেছে। অবশেষে এ বিবাদ হযরত দাউদ (আ.)-এর দরবারে পেশ করা হয়। তিনি বিবাদ মীসাংসার বিধান অনুযায়ী যাবতীয় বিবরণ শুনে তাদের মধ্যে অধিক বয়স্কার

পক্ষে রায় প্রদান করেন। কেননা বাহ্যিকভাবে শিশুটি তখন বয়স্কার আয়ত্তে ছিল। আর কম বয়সী স্ত্রীলোকটি সঠিক কোন সাক্ষী ত পেশ করতে পারেনি। যাক বিচার শেষে মহিলাদ্বয় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাদের কাছে বিবাদের বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন তা শোনার পর একটি ছুরি আনার হুকুম দেন এবং বলেন, এ শিশুটিকে কেটে দু'টুকরা করা হোক, তারপর এক টুকরা বয়স্কা মহিলাকে আর অন্য টুকরা কম বয়সীকে দেয়া হোক। এ কথা শুনে বয়স্কা মহিলাটি চুপ করে থাকে; কিন্তু কম বয়সী মহিলাটিএ মীমাংসা শুনে চিৎকার শুরু করে দেয় এবং বলে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ শিশুটিকে দু'টুকরা করবেন না, আমি বয়স্কার হাতেই একে ছেড়ে দিচ্ছি। এটা দেখে সবার আস্থা জন্মাল যে শিশুটি আসলে অল্পবয়সী মহিলার। আর বয়স্কা মহিলাটি মিথ্যা দাবী করছে। অতঃপর কম বয়স্ক মহিলার হাতে শিশুকে দিয়ে দেয়া হলো। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

নবী করীম (সা.) উক্ত ঘটনাটি যেরূপ হযরত সুলামমান (আ.)-এর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার পর্যায়ে আলোকপাত করেছেন। ঠিক সেরূপ সুলায়মানের সহধর্মিনীদের ঘটনারও বর্ণনা করেছেন। এতে করে তাঁর উম্মাত নসীহত গ্রহণ করতে পারে যে, তাদের সকল কাজে কল্যাণ ও বরকত পেতে হলে উক্ত কাজের দৃঢ়ইচ্ছা প্রকাশ সময়েই . ان شآء الله। 'আল্লাহ্ চাহেত' বলা উচিত। অধিকন্তু এ বর্ণনার এটাও একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ যখনই সুলায়মানের এ ঘটনাটি বর্ণনা করতেন, তখন তিনি বলতেন যে, তার স্ত্রী ও দাসীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। এজন্যেই নবী (সা.) প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করার লক্ষ্যে স্ত্রীদের সংখ্যা কিংবা কতক হাদীসের দৃষ্টিতে একশত পর্যন্ত বলেছেন। তন্মধ্যে কিছু ছিল সহধর্মিনী আর অবশিষ্ট দাসী। মোটকথা আলোচ্য ঘটনাটি উপদেশ নসীহতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বালোচিত আয়াতের তাফসীরের সাথে এ কোন সম্পর্ক নাই। উপসংহারে এটা বলা যায় যে, ইমাম রাযী (র.) কতিপয় মুহাদ্দেসীনের পসন্দনীয় তাফসীরটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষা এবং তাঁর আসনে القاء جسد। বা দেহ নিক্ষেপের ব্যাপারে যে সমস্যার জট লেগেছে তা খুলতে পারে নাই। আয়াতে যদিও দু'টি বিষয় দ্ব্যর্থবোধক শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও উপদেশ ও নসীহতের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনাটি অধিকতর স্পষ্ট ও প্রনিধাণযোগ্য। বস্তুত কুরআনের ঘটনার ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যও তাই হয়ে থাকে। সুতরাং ঘটনার যে দিকটায় উপদেশ নসীহতের উপাদান বিদ্যমান তার উপরই মোটামুটি ঈমান আনা উচিত। আর কেউ যদি এ ব্যাখ্যায় সার্বিকভাবে

অন্তরের প্রশান্তি লাভ না করতে পারে তাহলে ইমাম রাযীর তাফসীর গ্রহণ কর তার জন্য উপযোগী। আলোচিত আয়াতের বর্ণিত তাফসীর ছাড়াও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থসমূহে এমন অনেক বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, ইসলামী রেওয়ায়েতের সাথে যেগুলোর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। আর নিঃসন্দেহে সবগুলোই ইয়াহূদীও ইসরাঈলী মনগড়া কাহিনীর সমষ্টি। কাজেই সেগুলোকে বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করা অপমানকর ব্যাপার। সেসব বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই, আল্লাহ্ তা'আলা কিছু দিনের জন্য হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনকে জ্বিনের আয়ত্তে প্রদান করেছিলেন। বিভিন্ন কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) জনৈকা স্ত্রী আমীনা ছিল মূর্তি পূজারিনী। সে তার পিতার আবক্ষ মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত আমীনা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘরে মূর্তি পূজা করেছিল, আল্লাহ্ ততদিন সুলায়মানকে শাস্তি প্রদান করেন তাঁকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাঁর হাতের ইস্‌মে আযম খচিত আংটিটি 'জারদা' দাসী কর্তৃক জ্বিনের হাতে পড়ে যায়। সেদিন থেকে উক্ত জ্বি হযরত সুলামান (আ.) আকৃতি ধারণ করে সিংহাসনে বসে রাজত্ব চালাতে শুর করে। অতঃপর শাস্তি প্রদানের সময়সীমা অতিবাহিত হবার পর আংটিটি জ্বিনে হাত থেকে সমুদ্রে পড়ে যায় এবং একটি মাছ তা ভক্ষণ করে ফেলে। পরবর্ত মাছটি সুলায়মানের শিকারের জালে ধরা পড়ে। তিনি তার পেট থেকে আং বের করে আনেন এবং নিজের রাজত্ব ফিরে পান।

তাওরাতের সম্রাট (১) একাদশ অধ্যায়ে হুবহু এ ধরনের একটি কাহি বর্ণিত আছে। তাতে স্ত্রীদের সুলায়মানের মূর্তিপূজা করার কথাও উল্লেখ আছে (নাউযূবিল্লাহ,) উল্লেখিত বর্ণনায় একজন মহান নবীর প্রতি যে পরিমাণ বা উদ্ভট ও গুরুতর বর্ণনা আরোপ করা হয়েছে একজন সাধারণ লোকও অ সহজেই তা অনুধাবন করতে পারবে যে, এ ধরনের বর্ণনায় ইসলামী শিক্ষ সাথে কতটুকু সম্পর্ক থাকতে পারে। এ জন্যেই মুফাস্‌সির ইব্‌ন কাসীর (র উপরোক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

"ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আবু হাতিম প্রমুখ মুফাস্‌সিরীন এ পর্যায়ে সাল সালেহীন (প্রবীন মনীষী)-এর কাছ থেকে এমন কতগুলো রিওয়ায়েত উল্লে করেছেন, যার অধিকাংশই এমনকি সবগুলোই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগৃহীত তন্মধ্যে বেশীর ভাগই প্রত্যাখ্যাত। আমরা আমাদের তাফসীরের কিতাবে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছি এবং শুধুমাত্র তিলাওয়াতে কুরআনেই সীমিত থাকতে বলেছি"। (আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ ২৬)

কিন্তু স্পষ্টত এসব রিওয়ায়েতের সম্বন্ধ যদি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি আরোপ করা সঠিক ও প্রমাণিত হয়, তবুও বুঝতে হবে যে, সেগুলো তিনি আহলে কিতাবের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। আহলে কিতাবের একটি দলত হযরত সুলায়মান (আ.)কে নবী বলেই স্বীকার করত না। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এসব বর্ণনার মাধ্যমে তারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। এ কারণেই তাদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (তাফ্‌সীর ইব্‌ন কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬)

উক্ত কাহিনীটি দীর্ঘ কলেবরে প্রবীন মনীষী যেমন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব যায়িদ ইব্‌ন আসলাম প্রমুখদের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। আর কাহিনীর আদ্যপান্ত পুরোটাই আহলে কিতাবের গল্প কাহিনী থেকে সংকলন করা হয়েছে। (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩৬)

ইব্‌ন কাসীর (র.) ছাড়াও ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে, ইব্‌ন হাযম 'আল-ফাসল' নামক কিতাবে কাযী আইয়াজ 'শিফা' নামক কিতাবে, শাইখ বদরুদ্দীন আইনী 'শারহে বুখারী'তে, ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট মুহাক্কিক, মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণ উক্ত কাহিনী সম্পর্কিত বর্ণনাকে বাজে ইসরাঈলী উদ্ভট কল্পকাহিনী বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং ইসলামী রিয়াওয়াতের আঁচড়কে সেগুলো থেকে পবিত্র রেখেছেন।

সুলায়মান (আ)-এর সেনাবাহিনী ও পিঁপড়ার ঢিবি

বিগত আলোচনায় 'পাখির ভাষা' শিরোনামে এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) জীব জন্তুর ভাষা অনুধাবণ করতে পারতেন। সুতরাং কুরআন শরীফে পিঁপড়ার ঢিবি সম্পর্কে একটি ঘটনা আলোকপাত করা হয়েছে। একদা হযরত সুলায়মান (আ.) জ্বিন, মানুষ ও পশু-পাখির এক সুসজ্জিত বিরাট বাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। উক্ত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও কোনো পর্যায়ের কারো পক্ষেরই শক্তি ছিল না যে, নিজেদের পদমর্যাদার বিপরীত আগে অথবা পিছে গিয়ে বিশৃঙ্খলা প্রদর্শন করবে; বরং সুলায়মানের ভয়ে তারা সবাই অনুগত সৈনিকের মতই সহযাত্রীদের সাথে দলে দলে এগিয়ে যাচ্ছিল। চলতে চলতে অবশেষে তারা এমন এক উপত্যকায় গিয়ে উপস্থিত হলো যেখানে ছিল অসংখ্য অগণিত পিঁপড়ার বাসস্থান। আর পুরো উপত্যকাটাই ছিল পিঁপড়ার ঢিবি। পিঁপড়ার দলপতি বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী দেখে নিজ সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা অতি সত্বর যার যার গর্তে ঢুকে পড়। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.) ও তাঁর বাহিনী তো জানেনা যে, তোমরা এত বেশী সংখ্যক পিঁপড়া উপত্যকা জুড়ে

হামাগুড়ি দিয়ে চলছ। আমি জানি না, তাদের ঘোড়া ও পদাতিক বাহিনীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে অজান্তে তোমাদের কত যে মারা পড়বে? হযরত সুলায়মান (আ.) পিঁপড়া দলপতির এ ভাষণ শুনে হেঁসে উঠলেন এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিলেন। কুরআনের ভাষায় ঘটনাটি মহান আল্লাহ্ এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ - وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ - حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ - فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ -

"আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলামানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের তাঁর বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। সুলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল , 'হে মানুষ! আমাকে পাখির ভাষা শিখানো হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু থেকেই দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ । সুলায়মানের সামনে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে জ্বিন, মানুষ ও পাখিদের এবং তাদের বিভিন্ন ব্যূহে বিন্যস্ত করা হলো। যখন তারা পিঁপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছলো, তখন এক পিঁপড়া বললো 'হে পিঁপড়া সমাজ! তোমরা তোমাদের আবাসগৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে পদভারে তোমাদের পিষে না ফেলে। সুলায়মান তার কথা শুনে মৃদু হেঁসে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে নিয়ামত প্রদান করেছ তার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং তুমি যা পসন্দ কর এমন সৎকাজ করতে পারি এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ১৫-১৯)

নির্দেশ প্রদানকারী পিঁপড়াকে তাদের বাদশাহ বা দলপতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এটা শুধু এ জন্যে যে, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবিগণ এ ব্যাপারে একমত, জীবজন্তুর মধ্যে মৌমাছি ও পিঁপড়ার জীবন পদ্ধতি খুবই সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ, যে কারণে এদের ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবেনা। এমনকি কতক আধুনিক জড়বাদী বুদ্ধিজীবি তো এ দাবীই উত্থাপন করেছে যে, মানুষ উপরোক্ত দু'প্রজাতি থেকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখে নিজেদের সুশৃঙ্খল করেছে। অবশ্য এ দাবী সস্থানে যতই উপেক্ষনীয় হোক না কেন; কিন্তু তাদের শৃঙ্খলার সৌন্দর্য অবশ্যই স্বীকৃত। আর এ বাস্তবতা মেনে নেয়ার পর অতি সহজেই বলা যায় যে হুকুমদাতা পিঁপড়া সত্যিই উপত্যকার বাদশাহ বা দলপতি ছিল।

পিঁপড়ার উপত্যকাটি কোথায় অবস্থিত? এর উত্তরে অবশ্য বহু জায়গার নাম বলা হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের জোরালো অভিমত এই যে, সেটা আসকালানের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। বিশেষ করে বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইব্‌ন বতূতা উক্ত মতপোষণ করেন। ঐতিহাসিক ইয়াকূতের মতে সে জায়গাটা ছিল বায়তে জাবরুন ও আসকালানের মধ্যবর্তী স্থানে। সাধারণ মুফাস্‌সিরীনদের মতে সে স্থানটা ছিল সিরিয়াতে। উক্ত প্রশ্ন ছাড়াও এক্ষেত্রে আরো কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন-হুকুম পিঁপড়ার নাম কি ছিল? সে কোন প্রজাতির পিঁপড়া ছিল? তার স্থূলতা কি পরিমাণ ছিল? ইত্যাদি ইত্যাদি। ইসরাঈলী উপাখ্যান ও কল্পকাহিনী থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু এসব আলোচনা অনর্থক ও দলীল প্রমাণহীন। আর কুরআন হাদীস তো এসব বাহুল্য কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় নাফি' বাক্কালী বলেন, পিঁপড়াগুলো ছিল নেকড়ে বাঘের মত বড়। (তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১) অথচ কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, দেহ ছিল খুবই ক্ষুদ্র। যে কারণে সর্দার পিঁপড়াটিকে তাদের বলতে হয়েছিল, সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে পদতলে তোমাদের পিষে মারতে পারে। কেননা এ ধরনের নির্দেশ বা বক্তব্য তখনই সঠিক হতে পারে, যখন পিঁপড়ার দেহ এতই ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞার পাত্র হয় যে, পায়ের তলায় পিষে গেলেও তারা তো জানতে পারে না। এ ঘটনা উল্লেখের পেছনে কুরআনের উদ্দেশ্য হলো, উপরোক্ত আয়াতের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দাউদ ও সুলায়মানকে আল্লাহ্ পাখির ভাষা বুঝার জ্ঞান দান করেছেন। আর এটা ছিল তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদার অন্যতম নিদর্শন ও ম'জিযা। কাজেই এ পর্যায়ে দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেছি, যাতে এ ব্যাপারে

পাঠকদের মনে কোন প্রকার সংশয় সন্দেহ বাকী না থাকে এবং এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় জ্ঞান অর্জিত হয় যে, কুরআন শরীফ যে দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা করেছে তা সাধারণ পার্থিব জ্ঞানের মত ছিল না, বরং তা ছিল মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সম্মানিত নবীদের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ ও মু'জিযা। সুতরাং এ প্রেক্ষাপটে প্রথমত পিঁপড়ার উপত্যকা শিরোনামের ঘটনাটি বর্ণনা করেছে। মানুষ যেমন একে অপরের ভাষা অবলীলাক্রমে শুনতে পারে ঠিক সেরূপ হযরত সুলায়মান (আ.) কিভাবে একটি অতি সূক্ষ্মদেহ বিশিষ্ট প্রাণীর ভাষা শুনতে পেয়েছেন, সাথে সাথে এও স্পষ্ট হয়েছে যে, এহেন বিস্ময়ের জ্ঞান সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন অর্জিত হওয়ার পর তিনি মহান নবীদের মর্যাদার নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ্র দেয়া মু'জিযার শুক্রিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। যে সূরায় পিঁপড়ার বর্ণনা এসেছে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নাম রেখেছেন সূরা নাম্ল বা পিঁপড়ার সূরা। এ থেকেও আমরা ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবণ করতে পারি।

আহমাদ যাকী পাশা মিসরী তাঁর এক প্রবন্ধে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ স্থানে 'নামল্' শব্দের অর্থ বিশাল জনতা। অর্থ্যাৎ সে উপত্যকায় মানুষের ভীড় ছিল অসংখ্য পিঁপড়ার মত এবং সুলায়মানের বাহিনী যেন কোথাও তাদের পিষে না ফেলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট ভয় ছিল। কিন্তু যাকী পাশার এ তাফসীর আয়াতের তাফসীর নয়; বরং মূল অর্থের বিকৃতি, কেননা আয়াতে সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, তারা তোমাদের পিষে মারবে অথচ তোমাদের উপর কি বিপর্যয় নেমে আসবে তারা তা টেরও পাবে না। তাহলে 'নামল্' অর্থ বিশাল জনতার ভীড় কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? এছাড়া কুরআন শরীফের পূর্বাপর আলোচনা এ ধরনের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা এর দ্বারা আয়াতের সম্পর্কে সেই 'ইল্মের' সাথে থাকে না যে ইল্ম প্রসঙ্গে প্রথম আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মানুষের নিজস্ব তৈরি ভাণ্ডারে এমন কোন প্রবাদও নেই, যা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বিস্ময়কর হাসির কারণ হাত পারে। অধিকন্তু এটা তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার ছিল না, যার জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) শুকরিয়া আদায়ের গুরুত্ব অনুভব করেন এবং আয়াতে স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কথা বাদ দিলেও এটা যদি বিশাল জনতার ভীড় সম্পর্কিত ব্যাপার হত, তাহলে স্পষ্ট ও সোজা বিষয়টিকে এমন ইংগিতপূর্ণ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্ত করা কুরআনের কী দরকার ছিল। যার অর্থ অনুধাবনের ব্যাপারে অনর্থক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। ধরা যাক, কোথাও যদি অসংখ্য মানুষ ও প্রাণীর

ভিড় পরিলক্ষিত হয়, তা হলে অবশ্য বিভিন্ন ভাষার প্রবাদে এটা বলা হয়ে থাকে যে, তাদের সংখ্যা ছিল পিঁপড়ার ন্যায় অগণিত; কিন্তু যেখানে মানুষের সমাবেশ সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোন আলোচনাই নেই, এছাড়া তাদের সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পতা সম্পর্কেও কোন বক্তব্য নাই, সেখানে যদি এভাবে বাক্য শুরু করা হয়ে যে, যখন সেনাবাহিনী পিঁপড়ার উপত্যকায় উপস্থিত হলো, তখন পিঁপড়া বলল- তাহলে কোন পরিভাষাতেই একথা বলা যায় না যে, এর দ্বারা বিশাল জনতাকে বুঝানো হচ্ছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে পশু-পাখির ভাষাবিদ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা পশু পাখির মাঝেও বাকশক্তি এবং নির্দিষ্ট ভাষা প্রদান করেছেন। যদিও তাদের বাকশক্তি মানুষের বাকশক্তির তুলনায় খুবই দুর্বল। আর যে যুগে পশু-পাখির উপলব্ধি ক্ষমতা ও সূক্ষ্মবোধশক্তি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনার সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তাদের ভাষার প্রকরণ ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালা বাস্তবে প্রমাণ করে দেখানো হচ্ছে, সে যুগে আল্লাহ্‌র ওহীর মাধ্যমে যদি এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় যে, আল্লাহ্ তাঁর একজন বিশিষ্ট বান্দাকে (নবী) পার্থিব উপকরণের ঊর্ধ্বে উঠে পশু-পাখির ভাষার জ্ঞান দান করেছেন, তাহলে এটাকে যুক্তিবুদ্ধিতে কেন অসম্ভব মনে করা হয় এবং উদ্ভট ব্যাখ্যা এমনকি বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়, এটা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। (দাইরাতুল মা'আরিফ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭-২৮৮)

কতক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে একবার অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি তাঁর উম্মাতদের নিয়ে সালাতুল ইস্তিস্কা পড়ার জন্য মাঠের দিকে রওয়ানা হন। রাস্তায় তিনি দেখতে পান যে, একটি পিঁপড়া সামনের পা তুলে আসামনের প্রতি তাকিয়ে দু'আ করছে, হে আল্লাহ্! আমরা তো তোমারই অন্যতম সৃষ্টি, তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী। বৃষ্টির পানি থেকে বঞ্চিত করে আমাদের ধ্বংস করে দিওনা। এরূপ দু'আ শুনে হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর জাতিকে বললেন, চল ফিরে যাই। একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর দু'আই আমাদের জন্য যথেষ্ট কাজ করবে। এখন তোমাদের দু'আ ছাড়াই বৃষ্টি হবে। ইবন আসাকির ও ইব্‌ন আবু হাতিম ও রেওয়ায়েতটি মাওকূফ ও মারফূ উভয় পদ্ধতিতেই উল্লেখ করেছেন। (তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ.২: তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৯)

কিন্তু মুহাদ্দিসীদের মতে উক্ত রিওয়ায়েতের সম্বন্ধ নবী (সা.) প্রতি আরোপ করা উপেক্ষণীয় ব্যাপার। তবে পিঁপড়া সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিম শরীফে একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে। নবী করীম (সা.) বলেন, একদা কোন একজন

নবীকে পিঁপড়া কামড় দিয়েছিল। যে গর্ত থেকে পিপঁড়া বের হয়ে এসে তাকে কামড়েছিল তিনি রাগান্বিত হয়ে সে গর্ত জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বলেন, একটি পিঁপড়া তোমাকে কামড় দিয়েছে অথচ তুমি তাদের পুরো ঢিবি জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছ কেন? তুমি কী জান তাতে কি পরিমাণ নিরপরাধ পিঁপড়া বিদ্যমান ছিল? তুমি শুধু একটি পিঁপড়াকেই ধ্বংস করে ক্ষান্ত হলে না কেন?" (তাফসীর ইব্ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৯)

আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ "আমাদের সবকিছু দেয়া হয়েছে"। এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর রহমত ও করুণা দ্বারা আমাদের এতই অনুগৃহীত করেছেন এবং অবারিত নিয়ামতের বৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষণ করেছেন। এতে মনে হয় বিশ্বের যাবতীয় জিনিসই আমাদের দান করেছেন।

হযরত সুলায়মান (আ.) ও সাবার রাণী

কুরআন শরীফে সূরা নাম্‌ল-এ হযরত সুলায়মান ও সাবার রাণী সম্পর্কিত ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যা বিস্তারিত ও খণ্ডিত বর্ণনাসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সৃষ্টিশীলতার বিচারে এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিশাল ও অতুলনীয় দরবারে মানুষ ছাড়াও জ্বিন, পশু ও পাখি সেবার উদ্দেশ্যে দলে দলে উপস্থিত থাকত। তারা নিজেদের পদমর্যাদা অনুসারে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকত বিনাদ্বিধায়। একদা সুলায়মানী দরবার পূর্ণ জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, এমন সময় হযরত সুলায়মান (আ) পরিসংখ্যান নিয়ে দেখলেন যে, হুদহুদ নামক পাখিটি তার স্থান থেকে অনুপস্থিত। তিনি বললেন, আমি হুদহুদ পাখিটিকে তার স্থানে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? সে যদি প্রকৃতপক্ষেই অনুপস্থিত থাকে থেকে, তাহলে তার এ অকারণ অনুপস্থিতি কঠোর শাস্তিযোগ্য, না হয় তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে। ইত্যাবসরে হুদহুদ এসে উপস্থিত হলো। সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রশ্নোত্তরের পর বলল, আমি একটি নির্ভরযোগ্য সংবাদ নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে আপনি পূর্ব থেকে অবহিত নন। আর তা হলো, ইয়ামান অঞ্চলের সাবা প্রদেশে এক রাণী বাস করেন, আল্লাহ্ তাকে সবকিছু দিয়ে রেখেছেন আর তার রাজসিংহাসন আপন সৌন্দর্য্যে মর্যাদাপূর্ণ ও চাকচিক্যময়। কিন্তু রাণী ও তার জাতি সূর্য পূজারী। শয়তান তাদের গোমরাহ করে রেখেছে। ফলে তারা বিশ্বস্রষ্টা পরোয়ারদেগারে আলম ও লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদত করে না।

হযরত সুলায়মান (আ) বললেন, ঠিক আছে তোমার সংবাদ সত্য কি মিথ্যা এখনই যাচাই করছি। তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমার এ চিঠি নিয়ে তার কাছে পৌঁছাও এবং এ সম্পর্কে তারা কি কথাবার্তা বলে সেজন্যে অপেক্ষা কর। রাণীর কোলে চিঠি পড়তেই তিনি তা পড়লেন এবং দরবারে উপস্থিত সভাসদকে বললেন, আমার কাছে এখনই একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র এসেছে, তাতে লিখা আছে, উক্ত চিঠি 'সুলায়মানের পক্ষ থেকে' মহান করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, তোমরা আমাদের সাথে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে আমার কাছে এসো।"

সাবার রাণী চিঠির বক্তব্য পাঠ করে বললেন, হে আমার রাষ্ট্রীয় পারিষদ! তোমরা তো জান আমি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ ছাড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করিনা। কাজেই এখন তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও আমি কি করব? পারিষদবর্গ বলল, এত ভীত সন্ত্রস্ত হবার প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা দুর্ধর্ষ ক্ষমতা ও রণ বলে বলীয়ান, তবে পরামর্শের চূড়ান্ত আপনার উপরই নির্ভর করছে, যা ভাল বুঝেন, নির্দেশ করুন কি করতে হবে?

রাণী বললেন, নিশ্চয়ই আমরা শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান; কিন্তু সুলায়মানের এ ব্যাপারটি নিয়ে আমদের তাড়াহুড়া করা উচিত হবেনা। প্রথমে তাঁর শক্তি সামর্থের অনুমান করা জরুরী। কেননা তিনি যে বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে আমার কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। তাতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, সুলায়মানের ব্যাপারে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আমার অভিমত হচ্ছে আমাদের কয়েকজন দূত সুলায়মানের জন্য খুবই চমৎকার ও মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে যাবে এবং এই কৌশলে তাঁর শক্তি ও সৌর্যবীর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এত উপলব্ধি করতে পারবে যে, তিনি আমাদের কাছে কি চান? যদি তিনি যথার্থই শক্তি-সামর্থবানও প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করা নিরর্থক। কেননা প্রবল প্রতাপশালী রাজা বাদশাদের স্বাভাবিক নিয়ম হলো যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন জনপদে প্রবেশ করেন, তখন তারা সে জনপদকে ধ্বংস এবং সম্মানিত অধিবাসীদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে থাকেন। সুতরাং অনর্থক এ ধ্বংস ডেকে আনার কি প্রয়োজন? অতঃপর সাবার রাণীর দূত উপঢৌকন নিয়ে সুলায়মানের খেদমতে হাজির হলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের রাণী আমার বার্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বুঝেছ। তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা এসব উপঢৌকন যেগুলোকে তোমরা খুবই মূল্যবান মনে করে আনন্দিত; সেগুলোর মাধ্যমে আমার পদস্খলন ঘটাবে? অথচ তোমরা তো চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছ মহান

আল্লাহ্ আমাকে যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন সে তুলনায় তোমাদের এ অতি মূল্যবান সম্পদ অতিশয় নগন্য ও নিকৃষ্ট। কাজেই তোমাদের উপহার সামগ্রী ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং রাণীকে বলো যদি সে আমার বার্তার নির্দেশ পালন না করে তা হলে আমি এমন এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সাবা বাসীদের উপর চড়াও হব, যার প্রতিরোধ বা মোকাবেলা করা কারো দ্বারা সম্ভব হবেনা। অতঃপর তোমাদের অপমানিত লাঞ্ছিত করে শহর থেকে বিতাড়িত করব। দূতগণ ফিরে ফিরে গিয়ে যাবতীয় বিবরণ সাবার রাণীর সামনে পেশ করল। হযরত সুলায়মান (আ)-এর যে সৌর্যবীর্য ও শক্তি প্রত্যক্ষ করেছে তা যথাযথ বলে শোনাল এবং বলল তাঁর কর্তৃত্ব শুধু মানুষের উপরই নয় বরং জ্বিন, পশু ও পাখি পর্যন্ত তাঁর আদেশানুগত ও একান্ত বাধ্য।

রাণী সবকিছু শুনে সিদ্ধান্ত করলেন যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানেই ধ্বংস ডেকে আনা। সুতরাং তাঁর ডাকে সাড়া দেয়াই উত্তম পন্থা।

হযরত সুলাইমান (আ)-এর সম্মানিত পত্রে وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ বাক্যটি লিপিবদ্ধ ছিল। যেহেতু সাবার রাণী অনুধাবন করেছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমি যেন তাঁর আনুগত্য স্বীকার পূর্বক তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে অধীন হয়ে যাই। অতএব এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ভ্রমণ শুরু করে দিল এবং সুলায়মানের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রাওয়ানা হলো। হযরত সুলায়মান (আ.) ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, সাবার রাণী তাঁর দরবারে হাজির হবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। তিনি পারিষদবর্গকে সম্বোধন করে বললেন, আমি চাই যে, সাবার রাণী এখানে পৌছার পূর্বেই তাঁর রাজসিংহাসন উঠিয়ে নিয়ে আসবে। তোমাদের মধ্যে কে আছ এ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে? একথা শুনে জনৈক দানবাকৃতির জ্বিন বলল, আপনার দরবার শেষ করার আগেই আমি সিংহাসন নিয়ে আসতে পারি। এ ক্ষমতা আমার আছে। আর তা ছাড়া সিংসাসনের মূল্যবান সামগ্রীর জন্য আমি দায়িত্বশীল আমানতদার। কখনো খিয়ানত করব না। দানবাকৃতির জ্বিনের এ দাবী শুনে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক মন্ত্রী বলল, আমি চোখের পলকে সেটা আপনার সামনে হাযির করতে পারি। ইত্যবসরে হযরত সুলায়মান (আ.) পার্শ্ব ফিরে দেখলেন রাণীর সে সিংহাসন উপস্থিত। তিনি বলতে লাগলেন, এটা আমার পরোয়ারদেগারের বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন আমি তার শুক্রিয়া আদায় করছি, নাকি অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তাঁর শুকরিয়া

আদায় করে সে নিজেরই উপকার করে। আর যে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তার অবাধ্যতা থেকে ভ্রুক্ষেপহীন ও অনেক সম্মানিত, এর পরিণাম অবাধ্য নাফরমানকেই ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ্ শুক্‌রিয়া আদায়ের পর হযরত সুলায়মান (আ.) সিংহাসনের আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি দেখতে চাই যে, সাবার রাণী এটা দেখে প্রকৃত সত্যের দিকে ধাবিত হতে পারে কিনা। কিছুক্ষণ পর সাবার রাণী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে এসে পৌছাল এবং যখন দরবার উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সিংহাসনটি কি এরূপই? বুদ্ধিমতী রাণী বলল "মনে হয় যেন সেটাই"। অর্থাৎ সিংহাসনের আকৃতি ও সামষ্টিক গঠন তো বলছে যে, এটা আমারই সিংহাসন। কিন্তু কিছুটা বাহ্যিক পরিবর্তনের দরুন পূর্ণ আশ্বস্থ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করছে বিধায় তাও বলতে পারছে না যে, নিঃসন্দেহে এটা আমারই সিংহাসন। অতঃপর সাথে সাথে সাবার রাণী বলল, আপনার অতুলনীয় ক্ষমতা সম্পর্কে আমি আগেই অবহিত হয়েছি। সে কারণে অনুগত ও বাধ্য হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি আর এখন সিংহাসনের এই হতবুদ্ধিকারী ব্যাপার তো আপনার অনন্য শক্তির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এটা আমাদের আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকারের জন্য অধিকতর নিদর্শন। কাজেই আমরা আবারো একবার আপনার প্রতি আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করছি। রাণী আশ্বস্থ হলো যে, كنا مسلمين অর্থাৎ আমরা অনুগত বলেই হযরত সুলায়মানের বার্তার নির্দেশ পালন করেছি এবং তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছি। রাণীর মুশরিকী জীবন ও সূর্য পূজার অভ্যাস হযরত সুলায়মানের বার্তার মূল রহস্য বুঝবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করল এবং সৎপথ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা তৈরি করল। কাজেই হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য অপর একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করলেন এবং তাঁর মেধাশক্তি ও বোধক্ষমতাকে শাণিত ব্যবস্থা নিলেন। তিনি জ্বিনদের সহযোগিতায় আলীশান প্রাসাদ নির্মাণ করান, যা স্ফটিকের মত চকচকে, প্রাসাদোপম উচ্চতা ও বিস্ময়কর কারুকার্য খচিত নির্মাণশৈলিতার দৃষ্টিকোণ থেকে অভূতপূর্ব ও অনন্য ছিল। সেই প্রাসাদে প্রবেশ করার পথে সামনেই যে চত্বর ছিল, তাতে বিরাট চৌবাচ্চা খনন করান ও পানির তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। আর স্বচ্ছস্ফটিক ও কাঁচের টুকরা দিয়ে এক মনোরম ও সুন্দর গালিচা বিছিয়ে রাখেন যা দেখে দর্শকের দৃষ্টি প্রতারিত হতো এবং বিশ্বাস করতে বাধ্য হতো যে, চত্বরে স্বচ্ছ পানিই প্রবাহিত হচ্ছে। সাবার রাণীকে বলা হলো, আপনি শাহী প্রাসাদে অবস্থান করবেন। রাণী প্রাসাদের সামনে পৌছে দেখতে পেলেন যে, স্বচ্ছ পানি

প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি তা দেখে পানিতে নামার জন্য যখন গোড়ালীর উপর কাপড় উঠালেন, তখন হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, কাপড় উঠানোর দরকার নেই। কারণ এটা পানি নয়, বরং সমস্ত প্রাসাদ এবং এর সৌন্দর্যমণ্ডিত চত্বর চকচকে স্ফটিকের তৈরি। এটা ছিল রাণীর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার উপর মারাত্মক আঘাত। সুতরাং গূঢ় রহস্য অনুধাবনের জন্য তার বুদ্ধির প্রখরতাকে জাগ্রত করলেন এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু ঘটে চলেছে তা কোন যালিম বাদশাহর প্রতাপ ও সৌর্যবীর্যের প্রদর্শনী নয় বরং আমার কাছে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-কে এ ধরনের অনন্য ক্ষমতা ও অলৌকিক শক্তি দান করেছেন এমন এক মহান সত্তা যিনি সূর্য চন্দ্র এমনকি সমস্ত সৃষ্টি জগতের একক অধিপতি, যে কারণে আমার কাছে তার জন্য আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর প্রত্যাশী নয় বরং সেই একক সত্তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের দাওয়াত দেয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

রাণীর বিবেকে এ ধারণার উদ্রেক হতেই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ব্যক্তির মতই তিনি সুলায়মান (আ)-এর সামনে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে স্বীকারুক্তি প্রদান পূর্বক বললেন, হে পরোয়ারদেগার! অদ্যাবিধি আমি এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্য বস্তুর পূজার করে নিজের উপর যুলুমই করেছি। এখন সুলায়মানের সাথে একত্রিত হয়ে শুধু এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলাম, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। এমনি করে তিনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বার্তা واتو نى مسلمين বাক্যের প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হয়ে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলেন।

কুরআন শরীফে সাবার রাণীর এ ঘটনাটি এরূপ মু'জিয পদ্ধতির সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঘটনা বিবরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য নসীহত প্রদানও প্রতিভাত হয়েছে এবং ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ অংশও বিবৃত হয়েছে। সাথে সাথে হযরত সুলায়মান (আ.) পাখির ভাষা বুঝা সম্পর্কে পূর্বোক্ত আয়াতের বক্তব্যের সাক্ষীর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হুদহুদ পাখি ও সুলায়মানের মাঝে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এ ঘটনা শুরু হয়েছে ঃ

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيْ لاَ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ – لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْلاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ – فَمَكَثَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاءٍ بِنَبَاءٍ يَّقِيْنٍ – اِنِّيْ وَجَدْتُ إِمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُوْنَ - اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ
يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ-
اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ
مِنَ الْكٰذِبِيْنَ- اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ
فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ - قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ
- اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ
وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ - قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْ اَمْرِىْ مَاكُنْتُ
قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ- قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَأْسٍ
شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ- قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا
دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَّ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ -
وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ- فَلَمَّا جَاءَ
سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ - بَلْ اَنْتُمْ
بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ - اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لاَّ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ- قَالَ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ
بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ - قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ
بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ - قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ
عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ
مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ لِيَبْلُوَنِىْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ -
وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ- قَالَ
نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ يَهْتَدُوْنَ -
فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ- وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ- وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا
كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ- قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ

لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ - قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

"সুলায়মান বিহঙ্গদলের সন্ধান নিল এবং বলল, ব্যাপার কি হুদহুদকে দেখছি না যে, সে অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা যবাই করব। অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়লো এবং বলল, আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সব কিছু থেকে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখলাম আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের কাছে শোভনীয় এবং সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না। নিবৃত্ত করেছে এ জন্যে যে, তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, আর যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর তিনি তা জানেন। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি। সুলায়মান বলল, আমি দেখব তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পণ কর; অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে থেক এবং তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর। সে নারী বলল, হে পারিষদবর্গ। আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। এটা সুলায়মানের কাছ থেকে আর তা এই, দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে, অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করোনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। সে নারী বলল, হে পারিষদবর্গ! আমার এ সমস্যায় তোমাদের মতামত প্রদান কর। আমি যা সিদ্ধান্ত করি তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই করি। তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন। সে বলল, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদ প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অপদস্থ করে দেয়; এরাও এরূপই করবে। আমি তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি দূতেরা কী নিয়ে ফিরে আসে? সুলায়মানের কাছে দূত এলে তিনি বললেন, তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতেছ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ। তাদের কাছে ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নাই। আমি অবশ্যই তাদের সেখান থেকে লাঞ্ছিতভাবে বের করে দেব

এবং তারা অবনমিত হবে। সুলায়মান আরো বললেন, হে আমার পারিষদবর্গ। তারা আত্মসর্ম্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে? এক শক্তিশালী জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। যার কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আপনি চোখের পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন বললেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, যে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। সুলায়মান বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে, না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়? সে নারী যখন এল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, এটা তো যেন তাই। আমাদের ইতিপূর্বেই জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি। আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার পূজা করতো তাই তাকে সত্য থেকে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাকে বলা হলো এ প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তা দেখল তখন সে তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গিরা অনাবৃত করল। সুলায়মান বললেন, এতো স্বচ্ছস্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ, সে নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক। আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম, আমি সুলায়মানের সাথে সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করছি।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ২০-৪৪)

কতগুলো গবেষণা উপযোগী বিষয়

হযরত সুলায়মান (আ) ও সাবার রাণী সম্পর্কিত বর্ণনায় বেশ কতগুলো গবেষণা উপযোগী বিষয় রয়েছে, সেগুলোর বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

'সাবা'র ব্যাখ্যা

'সাইলে আরাম' নামক আলোচনা প্রসঙ্গে 'সাবা' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আসবে, তবে এখানে শুধু এতুটুকুন জেনে নেয়াই যথেষ্ট হবে যে, 'সাবা' ছিল কাহাতানী বংশের এক বিখ্যাত শাখা। সে ছিল তার গোত্রের পূর্ব পুরুষ। তার নাম ছিল উমর অথবা আবদ্ শামস। আর উপাধি ছিল 'সাবা'। আরব ঐতিহাসিক ও আধুনিক ইতিহাসিকগণের ব্যাখ্যা এরূপ। আর তাওরাতে বর্ণিত

আছে, তার নাম ছিল 'সাবা' সে খুবই সাহসী ও শক্তিশালী ছিল। বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে সে সাবা রাজত্বের পত্তন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে সাবা রাজত্বের উত্থানের যুগ ছিল সম্ভবত খৃ. পূর্ব ১১০০ সাল। সে কারণে খৃ. পূর্ব ১০০০ সালে তার কর্তৃত্ব ও শক্তির উত্থান সম্পর্কে দাউদের যাবূরে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন "হে আল্লাহ্! বাদশাহ্কে ন্যায়পরায়ণতা দান কর, আর বাদশাহজাদাকে দাও সত্যবাদিতা, যে তোমার বান্দাদের মাঝে সততার নির্দেশ দেবে, দ্বীপ-উপদ্বীপের রাজাগণ তার কাছে পাঠাবে উপহার সামগ্রী এবং সাবার রাজা পাঠাবে উপঢৌকন। সে যেন দীর্ঘজীবী হয় এবং 'সাবা'র সোনা-দানা তাকে যেন দেয়া হয়। তার জন্যে সর্বদা দু'আ থাকবে।" (যাবূর (২) (সুলায়মানী) যাবূর)।

সুতরাং এভাবে হযরত দাউদ (আ) দু'আ কবুল হয়। প্রায় ৯৫০ পূর্বাব্দ 'সাবা'র রাণী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে 'সাবা'র সোনা ও মণিমুক্তা উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন এবং নিজেও মুসলমান হয়ে 'সাবা'র রাজত্ব হযরত সুলায়মান (আ)-এর আয়ত্তাধীনে প্রদান করেন। 'সাবা' রাজত্বের প্রধান কেন্দ্র ছিল আরবের দক্ষিণাংশে ইয়েমেনের পূর্বাঞ্চলে, রাজধানী ছিল মারের। এর অপর নাম ছিল 'সাবা' নগরী। ক্রমান্বয়ে এর আয়তন বাড়তে বাড়তে পশ্চিমে হাদরামাউত পর্যন্ত প্রশস্ত হয়েছিল এবং অপরদিকে আফ্রিকা পর্যন্ত এর প্রভাব পড়েছিল; কেননা আবিসিনিয়ার উমাইনা অঞ্চলও ছিল সাবার কর্তৃত্বাধীন। মু'আফের নামক জনৈক সাবাঈ গভর্নর সে অঞ্চলের শাসক ছিল। এটা সে সময়ের কথা যখন মুঈনের রাজত্ব ছিল পতনোন্মুখ। তখন সাবা ইয়ামেনের বিভিন্ন প্রান্তে সুদৃঢ় দূর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ওদিকে মুঈনের দূর্গ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছিল। সাবা রাজত্বের বিভিন্ন শাখা ছিল। বহুদিন পর তাদের কয়েকটি শাখা ইয়ামেনকে তাদের রাজত্বের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে সেখানে তাহযীব তামাদ্দুন ও রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কাঠামোর প্রধান ভিত্তিভূমি রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে হুমায়ের ও তাবাবেআ ছিল বিখ্যাত রাজকীয় শাখা। তাদের পূর্ববর্তী রাজাগণ সাবা উপাধিতেই খ্যাত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে সাবার শেষ রাজার রাজত্বকাল ছিল খৃ. পূর্ব ৫৫০ সাল। (মু'জামুল বুলদান ও দায়রাতুল মাআ'রিফ: সাবার আলোচনা)

সাবার রাণীর নাম

কুরআনে হযরত সুলায়মান (আ) ও সাবার রাণীর ঘটনায় রাণীর নাম কি ছিল তার উল্লেখ নাই। এমনকি সে সাবার আয়ত্তাধীন তিনটি কেন্দ্র ইয়ামেন, আবিসিনিয়া ও উত্তর আরবের কোন্ অংশ থেকে এসেছিল, তাও নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কেননা কুরআনের বর্ণনার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে এদু'টি কথাই

অপ্রয়োজনীয়। তবে আরব ইহূদীদের ইসরাঈলী উপাখ্যানে তার নাম বিল্‌কীস বলে উল্লেখ আছে। আবিসিনিয়া বাসীদের দাবী হল যে, তারা সাবার রাণী ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর ঔরষজাত বংশ, তাদের ধারণা মতে রাণীর নাম ছিল মাক্‌দা। সে কোন অংশের রাণী ছিল, এ সম্পর্কে তারগুমে উল্লেখ আছে যে, তার রাজত্ব ছিল ফিলিস্তীনের পূর্বদিকে। (ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া, জিউস সাবা)

ইনজীলে বর্ণিত আছে, তার রাজত্ব ছিল ফিলিস্তীনের দক্ষিণে। (সাত অধ্যায় ১৩: শ্লোক ৪২; লুকা অধ্যায় ১১: শ্লোক ৩১)

ইউসিফসের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সে ছিল মিসর ও আবিসিনিয়ার রাণী। আবিসিনিয়া বাসীগণ তাকে হাবশী বংশোদ্ভূত মনে করে থাকে, আর আবিসিনিয়ার বাদশাহরা অদ্যাবধি অতি গৌরবের সাথে বলে যে, তারা রাণী বিলকীসের বংশধর । (আরদুল কুরআন, ইউসিফসের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, সুলায়মান অধ্যায়) উপরোক্ত মতামতের মধ্যে ইউসিফসের মতকে গবেষকগণ ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাকী দু'টি বর্ণনার সারকথা একই বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন; কেননা এ দু'টি অংশই ছিল ইয়ামেনের কর্তৃত্বাধীন। তন্মধ্যে ইনজীলের বর্ণনাকে অধিকতর সঠিক বলে মনে করেন। প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ বলেন যে, বিশেষ করে ইয়ামেন অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি বা অন্যান্য খননকৃত নিদর্শনে কোন নারীর রাজত্ব পরিচালনা সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। তবে ইরাক সংলগ্ন উত্তর আরবে চারজন প্রাচীন নারী নাম অবশ্যই পাওয়া যায়, যারা রাজত্ব করেছেন। সুতরাং সাবার রাণী এ অঞ্চল থেকেই হযরত সুলায়মান (আ)-এর খেদমতে হাজির হবার সম্ভাবনাই বেশী।

হুদহুদ

কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত যে, হুদহুদ পাখি হযরত সুলায়মান (আ) এর দূত ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির ধুয়া তুলে কতক আধুনিক বিজ্ঞানী এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অযৌক্তিক ও অবোধগম্য বলে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করতে উদ্যত হয়। আর যদিও বা ধর্মের প্রতি কিছুটা নমনীয় থাকে তবু আয়াতের অর্থের বিকৃতি সাধন পূর্বক মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরি করে এবং কুরআনের মর্মবাণীর বিপরীতে নিজস্ব সৃষ্ট অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। প্রথমত, তারা পাখির কথাবলাকে অযৌক্তিক সাব্যস্ত করেছে। অতঃপর আলোচ্য বিষয় সম্বলিত আয়াতের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে যে, প্রাচীন যুগে মুশরিকরা প্রায়শঃই তাদের দেব-দেবীদের নামানুসারে সন্তানদের নাম রাখত, এমনকি পালিত পশু-পাখির নামেও তাদের নাম রাখত। অতএব এখানে হুদহুদ মানে কোন পাখি নয়; বরং

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক মানুষ দূতকে বুঝানো হয়েছে। সম্ভবত. তার নাম ছিল হুদহুদ। কিন্তু তাদের এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে যখন আপত্তি উত্থাপিত হল যে, কুরআনে তো স্পষ্টভাবে تَفَقَّدَ الطَّيْرَ অর্থাৎ 'পাখির খোঁজ নিয়েছেন' বলে উল্লেখ আছে। কাজেই হুদহুদকে মানুষ বলা কিভাবে শুদ্ধ হবে? তখন মৌলভী চেরাগ আলী-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আয়াতে طَيْرٌ অর্থ পাখি নয় বরং সেনাদল। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ.) সেনাদলের খোঁজ নিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, তার এ মনগড়া অর্থ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং আরবী অভিধানের দৃষ্টিতে মারাত্মক ভুল। আর সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার হচ্ছে যে. অভিধানে গবেষণার স্থান নেই বরং তা ভাষাবিদদের ব্যবহারের আওতাধীন। আরবী ভাষাভাষীদের কেউ প্রকৃত ও রূপক অর্থে কোন একটিতে طَيْرٌ দ্বারা সেনাদল অর্থ ব্যবহার করে নাই। অধিকন্তু الطَّيْرَ ও طَيْرٌ - সম্বন্ধ পদ বিধায় যবরযুক্ত। সুতরাং এ রীতির طَيْرٌ এর অর্থ শুধু পাখিই হতে পারে। কুরআন এমন জীবন্ত ভাষায় নাযিল হয়েছে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيْنٌ অর্থাৎ 'স্পষ্ট আরবী ভাষা' বিশ্লেষণ আখ্যায়িত এটা কোন মৃত ভাষায় নাযিল হয় নাই যে, কেউ ইচ্ছা করলেই কোন শব্দের যে কোন অর্থ করবে। কোনো একজন হস্তীবাহিনীর ঘটনাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে طَيْرًا أَبَابِيْلَ বাক্যের طير শব্দের অর্থ করেছে অশুভ বা অলুক্ষণে আপদ। আর অন্যজন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর হুদহুদকে পাখি হিসেবে মানতে নারাজ। সেতো تَفَقَّدَ الطَّيْرَ বাক্যের طَيْرٌ-শব্দের অর্থ করেছে সেনাদল। অথচ এ দু'টি অর্থই স্ব স্ব স্থানে আরবী অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে মারাত্মক ভুল এবং আরবী বাকধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী এক্ষেত্রে মৌলভী চেরাগ আলীর ভুল ব্যাখ্যাটি প্রত্যাখান করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারকে যুক্তিসঙ্গত বানানোর উদ্দেশ্যে লিখেন, "আর যদি পাখির ভাষার ব্যাপারে দ্বিধা থেকেই থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, পত্রবাহক কবুতরের মতই হুদহুদ পাখিও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পত্রবাহক ছিল মাত্র আর তার কথা বলা মানে বুঝতে হবে যে সে বিষয়ের পত্র তার কাছে ছিল, যেমন কুরআনে আছে হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে সাবার রাণীর কাছে পত্র দিয়ে পাঠান, ঠিক তদ্রূপ সে প্রথমে একটি পত্র নিয়ে এসে থাকবে। (আরদুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮)

অবাক লাগে এজন্যে যে, কুরআন যেখানে পাখির ভাষা বুঝা আর পিঁপড়াও হুদহুদ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বিশেষ অনুগ্রহ

ও অপরিসীম নিয়ামত বলে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে আর ঘটনাগুলো পূর্বাপর এভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে কুরআন উল্লেখ করেছে যে, হুদহুদ একটি পাখি ছিল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে তার কথোপকথন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। সেখানে কয়েকজন জড়বাদী প্রকৃতি পূজারীর ভিত্তিহীন অস্বীকার এবং নিজেদের ক্রটিপূর্ণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ওহী প্রদত্ত জ্ঞান ও বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে। সৈয়দ সাহেব তাদের খাতিরে কেন যে এমন ব্যাখ্যা পেশ করছেন যা কুরআনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তা বোধগম্য হচ্ছে না। তাছাড়া কোন ঘটনা তাওরাত ও ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে বর্ণিত হওয়া তার মিথ্যা ও অশুদ্ধ হবার জন্য দলীল নয়, বরং কুরআন ও সহীহ্ হাদীস যখন দলীল প্রমাণের সাথে সেগুলোকে ভুল আখ্যায়িত করে অথবা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নীতিমালার বিরুদ্ধে কিংবা স্বীকৃত তথ্যের বিপরীতে কোন বিষয় উপস্থাপন করে থাকে অথবা কুরআন-হাদীসে নেই এমন কোন বিবরণ পেশ করে এবং যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতেও তা ভ্রান্ত ও অনর্থক বিবেচিত হয়, তবে নিঃসন্দেহে এসব ইসরাঈলী রিওয়ায়েত প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কিন্তু কোন একটি ঘটনা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে এবং তাওরাত ও ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে বা সাহিত্য ভাণ্ডারেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহলে নিছক ইসরাঈলী বর্ণনায় থাকার কারণে তাকে ভুল আখ্যায়িত করে কুরআনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার মর্মার্থের বিকৃতি সাধন করা বা অপব্যাখ্যার দ্বার উন্মোচন করা আদৌ বৈধ নয়। বরং সেক্ষেত্রে ইসরাঈলী সাহিত্যে বর্ণিত তথ্যকে কুরআন হাদীসের স্পষ্ট ঘটনার স্বপক্ষে উপস্থাপন করা উচিত। কতক মুফাস্সির বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদহুদ পাখি ছিল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পানি বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার। মাটির তলায় যেখানেই পানি থাকত সৈনিকদের প্রয়োজন পড়লে হুদহুদ বলে দিত যে, এ জায়গায় এ পরিমাণ গভীরতায় পানি আছে। তখন সুলায়মান (আ.) জ্বিনদের দ্বারা খনন করাতেন এবং পানি প্রয়োজন মেটাতেন। (তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১)

সাবার রাণীর সিংহাসন

ইতিপূর্বে আমরা হুদহুদের মৌখিক বিবরণীতে সাবার রাণীর সিংহাসনের বর্ণনা শুনেছি। এ পর্যায়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মুজিযাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নির্দেশ মাত্রই চোখের পলক ফেলতেই তিনি দেখতে পেলেন সাবার রাণীর সিংহাসন তাঁর দরবারে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের কয়েকটি বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা দরকার ঃ

১. রাণী তার দূতদের মাধ্যমে যেসব উপঢৌকন পাঠিয়েছিলে হযরত সুলায়মান (আ.) সেগুলো গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আয়াতে আছে ঃ

اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ - بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ- اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ الاٰيَة

"তোমরা কি আমাকে ধন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ, তাদের কাছে ফিরে যাও।" (সূরা নাম্ল ঃ ৩৬-৩৭)

২. যখন হযরত সুলায়মান (আ.) জানতে পারেন যে, সাবার রাণী তাঁর দরবারে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে, তখন পারিষদবর্গকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে রাণী এখানে পৌছার পূর্বেই তাঁর সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে? এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُ اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّأْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ-

"সুলায়মান আরো বললেন, হে পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে? (সূরা নাম্ল ঃ ৩৮)

৩. প্রথমে শক্তিশালী জ্বিন বলল, আমি আপনার দরবার শেষ করার আগেই তা এনে উপস্থিত করতে সক্ষম এবং সে নিজের দাবীর সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলল, আমি খুবই বলবান এবং উক্ত সিংহাসনের মূল্যবান সামগ্রীর ব্যাপারে বিশ্বস্ত আমানতদার। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ -

"একক শক্তিশালী জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।" (সূরা নামল ঃ ৩৯)

৪. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক মন্ত্রী বলল, আমি আপনার চোখের পলক পড়ার সাথে সাথেই তা এনে দিতে পারি। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ -

"আমি আপনার চোখের পলক ফেলবার পূর্বেই তা এনে দেব।" (সূরা নাম্‌ল : ৪০)

৫. হযরত সুলায়মান (আ) পাশ ফিরাতেই দেখতে পান যে, সিংহাসন তার কাছেই। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করে বলেন, যে আল্লাহ্‌র এত বড় ফযীলত বা অনুগ্রহ শুধু আমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই, আমি কি তার শুক্‌রিয়া আদায় করছি, নাকি নাফরমান বান্দার অন্তর্ভুক্ত?

এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ لِيَبْلُوَنِىْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ –

"অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ৪১)

৬. অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ.) সিংহাসনের আকৃতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

نَكِّرُوْا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ يَهْتَدُوْنَ–

"সুলায়মান বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়?" (সূরা নাম্‌ল ঃ ৪১)

৭. সাবার রাণী যখন ভ্রমণ শেষে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এটা কি আপনার সিংহাসনের মতই?

সে বুদ্ধিমতিসূলভ উত্তরে বলল, এটা তো মনে হয় যেন তাই। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ – قَالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ

"সে নারী যখন এলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, এটা তো যেন তাই।"

সিংহাসন সম্পর্কিত এ বিবরণ এবং এর ধারাবাহিকতা সামনে রাখলে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, কুরআন তো সেই সিংহাসনের আলোচনা উপস্থাপন করছে যার সম্পর্কে হুদহুদ বার্তা আদান-প্রদানের পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিল। তবে

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য তা বলা হয় নাই। কেননা দূতদের মাধ্যমে যেসব উপঢৌকন পাঠনো হয়, তাতে সিংহাসনের কোন উল্লেখ নেই। আর তারা ফিরে গেলে রাণীর আগমন বার্তা শুনে হযরত সুলামান (আ.) তাঁর দরবারে রাণীর পৌছার পূর্বেই সিংহাসন নিয়ে আসতে বলেন। অতঃপর এমন বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে সিংহাসন তুলে আনা হয়, সে সম্পর্কে জ্বিনদের মধ্য থেকে দানবাকৃতির এক জ্বিন ওয়াদা করেছিল দরবার শেষ হবার পূর্বেই সে তা উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু হযরত সুলায়মানের নির্ভরযোগ্য জনৈক পারিষদ বলল যে, আমি চোখের পলক পড়ার আগেই হাযির করে দিচ্ছি। হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহ্ প্রদত্ত এ অলৌকিক কাণ্ড দেখে স্বীকার করেন যে, এটা আল্লাহ্র মহান অনুগ্রহ। অতঃপর তিনি সিংহাসন এর আকৃতি পরিবর্তনের নির্দেশ করেন। এসব কয়টি ধাপ অতীত হবার পর রাণী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং সিংহাসন সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর র্পব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ও কুরআন সাবার রাণীর কোন উপঢৌকনের কথা উল্লেখ করছে না। এপুরো বিবরণে নিজের পক্ষ থেকে না কোন ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর না ভেঙ্গেচুরে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। সুতরাং সিংহাসনের ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে একটি মু'জিযা এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুওয়াত ও রিসালতের অন্যতম নিদর্শন। যেসব মনীষী উক্ত অর্থ ছাড়া অন্য ব্যাখ্যা করেছেন তা সবগুলোই মিথ্যা ও ভুল। কেননা তাঁরা কুরআনের হয় স্পষ্ট ও সোজা কতক অংশকে উপেক্ষা করে বর্ণনা করেছেন। যেমন সাইয়েদ সুলায়মান নদভী করেছেন। অথবা কিছু শব্দের ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ নিয়ে অবশিষ্ট পুরো ঘটনাটিকেই বাস্তব থেকে বিকৃত করে দিয়েছেন। নদভী আল্লাহ্র এসব আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা পাঠ করলে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন যে, কুরআনের আলোচ্য বিষয়বস্তু তার ব্যাখ্যার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? তিনি বলেন, আমাদের অভিমত এই যে, সাবার রাণী হযরত সুলায়মান (আ.) এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণের জন্যে তার দেশীয় কারুকার্য খচিত একটি জিনিস তৈরি করান, আর যেহেতু এটা ছিল রাজকীয় উপঢৌকন। সুতরাং অবশ্যই সেটা রাণীর সাথেই নিয়ে এসে থাকবেন। সাবার প্রথম দূত প্রেরণের সময় উপঢৌকন পাঠানোর কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। পরবর্তী পর্যায়েও উপঢৌকনের উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাণীর সাথেও উপঢৌকন ছিল। কুরআনে বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক পারিষদ যার কিতাব সম্পর্কে জ্ঞান ছিল, সে আবেদন করল, আমি চোখের পলক পড়ার আগেই রাণীর সিংহাসন তুলে নিয়ে আসছি। চোখের পলক পড়ার আগেই সিংহাসন তুলে আনার অর্থ হচ্ছে, যেমন আমাদের ভাষায় তাড়াতাড়ি বা

দ্রুততাকে বুঝানো হয় ঠিক তেমনি আরবী ভাষায় " قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ طَرْفُكَ "তোমার চোখের পলক ফেলার আগেই" অর্থাৎ যথাশীঘ্র সময়কে বুঝতে হবে। কতক তাবিঈন ও বিখ্যাত মুফাস্‌সিরগণও এ শব্দের অনুরূপ অর্থ করেছেন। কাজেই এ আয়াতাংশের দ্বারা বাস্তবিকপক্ষেই চোখের পলক পড়ার আগেই কাজ সমাধা হওয়া বুঝানো মানে ভাষার বাকধারা সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ।" (আরদুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯-২৭০) যারা সাইয়েদ সাহেবের ব্যাখ্যার অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন আহা; তিনি যদি সে সব তাবিঈন ও বিখ্যাত মুফাস্‌সিরদের নাম প্রকাশ করতে পারতেন। তবে قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ আয়াত দ্বারা দ্রুততা বা তাড়াতাড়ির অর্থ বুঝানোকে কেউ অস্বীকার করতেন না। পার্থক্য শুধু এতটুকুন যে, সাইয়েদ সাহেব এ দ্রুততাকে বাকধারার সীমায় সীমিত রাখতে চাচ্ছেন অথচ কুরআন ও জায়গায় তাদের সীমাবদ্ধতার অনেক উর্ধ্বে উঠে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিদর্শন প্রকাশ করতে চায়।

এ জন্যেই তাকে প্রাধান্য দিয়েছে সে ব্যক্তির উপর যে বলেছিল قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ অর্থাৎ আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই নিয়ে আসব। তা না হলে এ ধরনের প্রাধান্য দেয়া অনর্থক বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মূল লক্ষ্য যখন স্থির হল যে, রাণীর দরবারে আসার আগেই যেন সে গুদাম থেকে তা নিয়ে চলে আসে তাহলে যে জ্বিন قَوِىٌّ اَمِيْنٌ ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত বলে দাবী করেছিল তাকেই দায়িত্ব দেয়া যথেষ্ট ছিল। আর এটা তো তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হত না যার উপর এত আলোচনা হতে পারে এবং কুরআনের এর বিবরণ এত গুরুত্বও পেতনা।

বিখ্যাত লেখক নাজ্জার এ সম্পর্কে একটি চমৎকার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। "কিতাবী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে হযরত সুলায়মান (আ) সাবার রাণীর সিংহাসন যে বিশেষ পদ্ধতিতে আনয়ন করেছিলেন বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান সে পদ্ধতির ধারে কাছেও পৌছতে সক্ষম হয় নাই। আর সিংহাসন সম্পর্কিত ঘটনাটি স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ও মযবুত দলীল প্রমাণে অকাট্য সত্য আর যেসব মুফাস্‌সিরদের চূড়ান্ত পর্যায়ের অপব্যাখ্যার জন্য আফসোস, যারা عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ। 'কিতাবী জ্ঞান যার আছে'। এ অর্থের পরিবর্তে যার কাছে সুলায়মানী রাজত্বের মানচিত্র থাকত কাজেই তার জানা ছিল সিংহাসনটি সুলায়মানের কোন ভাণ্ডারে রেখেছে, এরূপ অর্থ করেছেন। অলৌকিক ক্ষমতা বা মু'জিযার যখন অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান তখন অনর্থক ও ভিত্তিহীন অস্বীকার করার মধ্যে লাভ কি? যিনি প্রাকৃতিক নিয়ম ও শক্তিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি যদি এ কোন নিয়মকে

স্থানের দু'টি জায়গায় পত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারিষদবর্গের মধ্যে সাবার রাণীর পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যার জ্ঞান ছিল, সে উপঢৌকন স্বরূপ সাথে করে একটি সিংহাসন নিয়ে আসে। এ পর্যায়ে সে বলে, আমি এখনই নিয়ে আসছি। (আরদুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০)

আমাদের দৃষ্টিতে শেষোক্ত দু'টি বক্তব্যই ভুল এবং কুরআনের স্পষ্ট ব্যাখ্যার বিপরীত। কেননা আলোচ্য সিংহাসনের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে সাবার রাণীর সুলায়মানী দরবারে উপস্থিত হবার আগেই। অবাক হতে হয় এজন্যে যে, প্রকৃতি পূজারীদের ভয়ে এ স্পষ্ট ও পরিষ্কার বক্তব্যকে কেন উপেক্ষা করা হচ্ছে? ঠিক তেমনি খাতাপত্র ও রেজিষ্ট্রারের সাথেও এ ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নাই। তখনো তো রাণী বা তার সহযাত্রীবৃন্দ ও তার উপঢৌকন দরবারে সুলায়মানীতে পৌঁছে নাই। আর যদি এটা মেনেও নেয়া হয়, যে, হযরত সুলায়মান (আ) রাণীর আগমন বার্তা ওহীর মাধ্যমে পাননি বরং হুদহুদ কিংবা রাণীর কোন দূতের মাধ্যমে পেয়েছেন, যে রাণীর আগেই পত্র নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল, তবুও তো কুরআন অথবা ইসরাঈলী বর্ণনার কোনো জায়গায় একথা উল্লেখ নাই যে, রাণীর আগেই তার উপঢৌকন হযরত সুলায়মানের দরবারে পৌঁছেছিল। আর সেজন্যে অনুমানের সে তীর টার্গেটে ঠিকমত লাগে নাই। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সে ব্যক্তির আসেফ হোক কিংবা অন্য নামে পরিচিতই হোক, তিনি ছিলেন হযরত সুলায়মানের সাহাবী এবং খুবই আপনজন। সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.) যেমন নবী করীম (সা.)-এর সাথী ছিলেন, এ ব্যক্তিও তেমনি হযরত সুলায়মানের অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। তাঁর সাহচর্যের কারণে তাওরাত, যাবূর, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত গুঢ় রহস্য এবং হাকীকত সম্পর্কে তিনি বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন। এ কারণে জ্বিনদের জনৈক দৈত্য যখন রাণীর সিংহাসন নিয়ে আসার দাবী জানান, তখন যদিও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উক্ত সময় যথেষ্ট ছিল; কিন্তু হযরত সূলায়মানের গোপন উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এ কাজটি জ্বিনদের কোন বান্দার দ্বারা করানো ঠিক হবেনা, বরং আল্লাহ্‌র কোন খাস বান্দার দ্বারা করানো উচিত, যাতে তাঁর পয়গাম্বরী দৃষ্টিতে সেটা মু'জিযা ও অন্যতম নিদর্শনে পরিণত হয় এবং সাবার রাণীর সামনে তা প্রতীয়মান হয়। হযরত সুলায়মান (আ)-এর এ গোপন উদ্দেশ্যপূর্ণ চাহনীর মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেই আসেফ তৎক্ষণাৎ নিজেকে এ কাজের জন্য পেশ করলেন এবং জ্বিনের প্রস্তাবিত সময়ের চাইতে অনেক কম সময়ে তা উপস্থিত করার ওয়াদা করলেন। কেননা তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর বরকতপূর্ণ চাহনী

ভেঙ্গেচুরে কোন কাজ সম্পন্ন করেন, এটা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তাহলে সেটা মেনে নেয়া যাবে না কেন? এধরনের অলৌকিক কার্যাবলী প্রকাশের জন্য সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে আল্লাহ্‌র বিশেষ কুদ্‌রতী নিয়ম ও প্রাকৃতিক বাণী বাহক বিদ্যমান আছে। বিজ্ঞান অদ্যাবধি যে নিয়মে বা আইন সম্পর্কে অবহিত হতে পারে নাই। যে সব পবিত্র ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ঐশী বাণী বাহক কর্তৃক মু'জিযা প্রকাশিত হয় শুধু তারাই আল্লাহ্‌র সে বিশেষ নিয়ম অবহিত হতে পারেন।

وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ

"মহান আল্লাহ্ চান তাই সৃষ্টি করেন এবং যা পসন্দ করেন"। (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৯৬)

কিতাবী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির পরিচিতি

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, কুরআনে যাকে কিতাবী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ছিলেন আসেফ ইব্‌ন বরখিয়া। (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; তারীখে ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩)

তিনি সুলায়মানের নির্ভরযোগ্য পারিষদ ও লেখক (মন্ত্রী) ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে কতক মুফাস্‌সির তার অন্য নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশই প্রথম বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে তা মেনে নিয়েছেন।

মুফাস্‌সিরগণ এ ব্যপারেও আলোচনা করেছেন যে,তিনি কি মানুষজাতি ছিলেন না কি জ্বিন? দাহ্‌হাক, কাতাদা ও মুজাহিদ (র) বলেন, তিনি মানুষই ছিলেন। (তফ্‌সীর ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড: পৃ. ৩৬৪; তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩)

এ ব্যক্তি সম্পর্কে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে যে, কুরআনের আয়াতাংশ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ বলতে কিতাবী জ্ঞানের অর্থ কি? ওয়হাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, এর সারকথা হচ্ছে তিনি ইস্‌ম আযম বা আল্লাহ্‌র মহান নাম সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন। আর কতক আধুনিক লেখক বলেন যে, এর দ্বারা হযরত সুলায়মান (আ) এর রাষ্ট্রীয় খাতাপত্র ও দরবারী রেজিষ্ট্রার বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি উপঢৌকন বিষয়ক রেজিষ্ট্রারের বিশ্বস্ত পারিষদ ছিলেন। সে কারণে তিনি জানতেন গুদামের কোন অংশ সিংহাসনটি সংরক্ষিত আছে। এ সম্পর্কে সাইয়েদ সুলায়মান নদভী বলেন, আরবী বাকধারায় কিতাব, শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের এ

مُسْلِمِيْنَ বাক্যের اسلام শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন ঈমান, অর্থাৎ রাণী যথার্থই ইসলাম কবুল করেছেন। কিন্তু মুফাস্‌সিরদের জ্ঞানগর্ভ হিক্‌মতপূর্ণ কথাকে সঠিক বলে মেনে নিলেও তাঁদের দলীলের ব্যাপারে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। একথা যদি সত্যি হয় যে, রাণী كُنَّا مُسْلِمِيْنَ বলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাহলে এরপরবর্তী আয়াতের এ দু'টি বাক্যের অর্থ কি হবে?

وَصَدَّهَا مَاكَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ -

"আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যার পূজা করত তাই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করে রেখেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ৪৩)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর (সূর্য) উপসনাই তাঁকে ঈমান আনা থেকে বিরত রেখেছে। কেননা নিঃসন্দেহে সে ছিল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী বাক্য

قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিলাম, আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করছি"। (সূরা নাম্‌ল ঃ ৪৪) অর্থাৎ প্রসাদের ঘটনা থেকে প্রভাবিত হয়ে রাণী বলল যে, এখনো পর্যন্ত আমি শিরকে লিপ্ত থেকে নিজের উপর যুলুম করেছি, এখনই আমি রাব্বুল আলামীনের উপর ঈমান আনলাম।

এ দু'টি বাক্য থেকে জানা যায় যে, "كنا مسلمين" বলার সময় সে মুসলমান হয়নি বরং এরপারে দ্বিতীয় ঘটনা থেকে প্রভাবিত হয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। অথচ এ দু'টি কথা হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারেই উচ্চারিত হচ্ছিল। সুতরাং মুজাহিদ, সাঈদ ও ইব্‌ন জারীর (র) উক্ত আপত্তিকে সমর্থন দিয়ে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ থেকে مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ পর্যন্ত বাক্য সবটুকুই হযরত সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য। আর এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, হযরত সুলায়মান (আ) বললেন, সাবার রাণী আসার আগেই আমাদের জানা ছিল যে, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত আর আমরা সর্বাবস্থায় মুসলমান। সূর্য পূজাই রাণীকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনায় অভ্যস্ত করেছে এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বিরত রেখেছে। ইব্‌ন কাসীর মুজাহিদের এ তাফসীরকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এ মতই অধিক প্রনিধাণযোগ্য। কেননা সাবার রাণী তখনো মুসলমান হয়নি বরং কুরআনের

বক্তব্য হচ্ছে যে, তিনি صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَ 'স্বচ্ছস্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ' সম্পর্কিত ঘটনার পর ঈমান আনেন। সুতরাং كُنَّا مُسْلِمِيْنَ তার বক্তব্য হতে পারেনা। কিন্তু এ তাফসীরে সর্বনামের প্রত্যাবর্তনের দিক বিষয়ে অসংলগ্ন ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বাক্যে যখন قَالَتْ كَانَ هُوَ অংশে قَالَتْ এর বক্তা সাবার রাণী। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং পরবর্তী وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ বাক্যকে যা প্রথম বাক্যের সাথে সংযুক্ত এটা কিভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বক্তব্য হতে পারে? আর যদি বলা হয় যে এ দু'টি হবে দলীলহীন। সর্বনাম প্রত্যাবর্তনের দিক সম্পর্কিত ত্রুটি ছাড়াই যখন কোন আয়াতের সঠিক তাফসীর করা যায়, তখন অনর্থক তা মেনে নেয়ার প্রয়োজন কোথায় বাকী থাকে? সুতরাং আলোচ্য আয়াতের যে তাফসীরে এ দু'টি দুর্বলতাই নাই এবং দু'টি ঘটনাই হিক্‌মত ও কল্যাণের আলোকে আলোকময়- সে তাফসীরটি করেছেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী এবং সংকলন করেছেন হোসাইন আহ্‌মাদ মাদানী। তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) হুদহুদের মাধ্যমে যে বার্তা প্রেরণ করেছিলেন তাতে قَالَ سُلَيْمَانُ শব্দমালা লিখে তিনি সাবার রাণীকে স্পষ্ট ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সাবার রাণী যেহেতু তাওহীদের মূলতত্ত্ব ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি হযরত সুলায়মান (আ) এর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নাই এবং পত্রে উল্লেখিত أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ শব্দের পর যখন وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ অংশ পাঠ করেন। তখন রাজা বাদশাদের চিঠি পত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, সুলায়মান (আ) তার অত্যাচারী দাপটের ক্ষমতায় আমাকে ও আমার রাজত্বকে নিজের অধীনস্ত ও করতলগত বানাতে চান। এ জন্যেই তিনি তাঁর পারিষদবর্গের সাথে পরামর্শ করার পর অবস্থা অনুসন্ধানের সে পদ্ধতি বেছে নেন, যা কুরআনে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর যখন তার এ প্রত্যয় সৃষ্টি হয় যে, বস্তুত সুলায়মানের রাজত্ব তার ধারণার সম্রাটদের থেকে অনেক উর্ধ্বে! তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সুলায়মানের সাথে যুদ্ধ করা উচিত হবেনা এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত। কাজেই রাণী সুলায়মানী দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। হযরত সুলায়মান (আ.) যখন অবহিত হন যে, সাবার রাণী তার খেদমতে উপস্থিত হবার জন্য রওয়ানা দিয়েছে, তখন তিনি চিন্তা করলেন, এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যা দেখে রাণী নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সূর্য পূজা সত্যিই গোমরাহী এবং শুধু এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই সরল ও সত্য পথ।

সাবার সম্প্রদায়ের ধর্ম ছিল সূর্য পূজা এবং তারা এ দর্শনের প্রবক্তা ছিল যে, সমগ্র বিশ্বের ভাল মন্দের ক্ষমতা ও শক্তি নক্ষত্র রাজির কাছেই আর যেহেতু সূর্য সবচেয়ে বড় নক্ষত্র এবং বিশ্বের সমুদয় সৃষ্টির উপর সে প্রভাব বিস্তার কার আছে, সে জন্য সে পূজা পাবার উপযুক্ত। হযরত সুলায়মান (আ) রাণীকে বলতে চাচ্ছিলেন যে, বিশ্বের ছোট বড় সমুদয় বস্তুর উপরই একমাত্র মূল সত্য মহান আল্লাহ্র আধিপত্য বিরাজমান, তিনিই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, নিহারিকা সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। এসব তাঁর সৃষ্টি ও কুদ্রতের বহিঃপ্রকাশ।

সুতরাং মানুষের সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা হল মূলসত্তাকে বাদ দিয়ে প্রকাশমান সৃষ্টিকে পূজা করতে শুরু করা। কেননা এগুলোই মানুষ প্রত্যক্ষ করে এবং অনুভব করে। অথচ প্রকাশমান সৃষ্টিই মূলসত্তা বা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ, মূল স্রষ্টা না থাকলে প্রকাশমান সৃষ্টিই হত না। এজন্যেই পরিবর্তন ও বিকৃতি, অস্তিত্বে আসা ও ধ্বংস, উদয়-অস্ত, ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভঙ্গুর সৃষ্টির নাড়ি নক্ষত্রে বা স্বভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে আর মূলসত্তা (একক সত্তা) এসব পরিবর্তন থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে। এটা চিন্তা করে তিনি রাণীর রাজ সিংহাসনটি ইয়েমেন থেকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যে, তার কাছ থেকেই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাকে বলবেন, দেখো আমার এ দাবীর সপক্ষে তোমার সিংহাসনটি একটি দলীল। ভেবে দেখো, এটা তোমার কর্তৃত্ব ও রাজত্বের একটি প্রকাশমান নিদর্শন ছিল, এজন্যেই একে রাজকীয় সিংহাসন বলা হয়। কিন্তু যখনই তুমি তোমার রাজত্ব থেকে অনুপস্থিত হয়েছ, এ নিদর্শনটিও অথর্ব হয়ে পড়েছে। গতকাল যা ছিল তোমার কর্তৃত্বের প্রতীক আজ তা আমার দরবারের সৌন্দর্য বর্দ্ধন করছে আর তাও এখানে আকৃতির পরিবর্তনের সাথে তোমাকে ক্ষণস্থায়িত্ব ও ধ্বংসের শিক্ষা দিচ্ছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এহেন চিন্তার সমর্থনে আমরা লক্ষ্য করি যখন তিনি রাণীর সিংহাসন আনয়ন করে বিকৃতির নির্দেশ দিয়ে বলেন, نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ يَهْتَدُوْنَ "আমরা দেখি সে কি সঠিক পথের সন্ধান পায় নাকি পথহারাদের দলভুক্ত হয়"? (সূরা নাম্‌ল ঃ ৪১) আমরা এরূপ করছি এটা দেখার জন্য যে, সে এ ঘটনা থেকে প্রভাবিত হয়ে হিদায়েত কবূল করে, নাকি পথভ্রষ্টই থেকে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখানে হিদায়েত বলতে বিশেষ করে ইসলামী হিদায়েতকে বুঝানো হয়েছে, শুধু পথপ্রাপ্তি বুঝানো হয়নি, যা নাকি প্রতিটি ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানতে পারার জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ বর্ণনাভঙ্গীতে হযরত সুলায়মান (আ.) রাণীর কাছে এও প্রকাশ করলেন যে তাঁর মাহাত্ম্য ও অপরিসীম ক্ষমতা শুধু রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনিক দাপটের জন্যেই নয় বরং এর পেছনে মহান

আল্লাহ্‌র সেই কুদ্‌রতী শক্তি তৎপর রয়েছে যা সম্রাটদের অত্যাচারী দাপটের কর্মক্ষমতার চাইতে অনেক উর্ধ্বের নবুওয়াতী মাহাত্মের সাথে আল্লাহ্‌র নিদর্শন নামে পরিচিত। সাথে সাথে উপরোল্লিখিত তাবলীগ ও দাওয়াতের বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি আরো প্রকাশ করলে যে, সূর্য পূজা তো মূল ছেড়ে বাহ্যিকতার, চিরস্থায়ীকে বাদ দিয়ে ক্ষণস্থায়ীর, প্রাচীন থেকে মুখ ফিরিয়ে আধুনিকের, অভাবমুক্ত থেকে মুখ ঘুরিয়ে অভাবীর এবং স্রষ্টা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সৃষ্টির পূজা করা মাত্র। এটা মারাত্মক পথভ্রান্তি ও গোমারাহীর রাস্তা। আর সরল পথ হল শুধু মাত্র মূলসত্তা এক আল্লাহ্‌কেই লাভ-ক্ষতি ও ভাল-মন্দের মালিক মনে করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।

কিন্তু সাবার সম্প্রদায় যেহেতু শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর পূজাতে বিশ্বাসী ছিল, সেহেতু রাণী এ সূক্ষ্ম যুক্তি বুঝতে সক্ষম হননি এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সঠিক তত্ত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। সে সিংহাসনের পুরো ঘটনা থেকে ফলাফল বের করে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) বুদ্ধি বিলোপকারী অলৌকিক ঘটনার দ্বারা তাঁর অতুলনীয় জাঁকজমক প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে তাঁর আনুগত্যশীল ও বাধ্যগত জন্য প্রভাবান্বিত করছেন। সুতরাং রাণী অনুরূপ চিন্তা করে জবাব দিল, আপনি যদি এ ধরনের অসামান্য প্রদর্শনী নাও করতেন তাহলেও আগে থেকেই আপনার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল এবং আমরা আপনার অনুগত নির্দেশ পালনকারী হিসেবে গণ্য হয়েছি। রাণীর এ উত্তর লিপিবদ্ধ করার পর আল্লাহ্ মাঝখানে তাদের শতাব্দীর গোমরাহী ও ঘটনার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে না বুঝার কারণও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সূর্য পূজার চিরাচরিত অভ্যাস এখানে তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে এবং সে কাফিরই রয়ে গেছে। এদু'টি বক্তব্যই নিম্ন বর্ণিত আয়াতে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ - وَصَدَّهَا مَاكَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ -

"সে বলল, এটা তো যেন তাই, আমাদের ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ৪২)

অতঃপর হযরত সুলায়মান (সা.) দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রদর্শন করেন। স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদের ঘটনাটি পূর্বের ঘটনার চাইতে অনেক বেশী স্পষ্টও উজ্জ্বল। রাণী যখন স্বচ্ছ ও পরিস্কার প্রবাহমান পানি মনে করে তার কাপড় গুটিয়ে পানিতে

নামতে উদ্ধত হন, তখন তাকে বলা হয় যে. আপনি যে জিনিসকে পানি ভাবছেন এটা আসলে স্ফটিকের প্রতিচ্ছবি, পানি নয়। রাণী যখন এ বাস্তব অবস্থা অবহিত হন তখন তাঁর বিবেক সে দিকে ধাবিত হয়ে যে. এসব প্রদর্শনের পেছনে সুলায়মানের উদ্দেশ্য কি? এবার তাঁর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বার উম্মোচিত হয় রহস্য অনুধাবনে সক্ষম হয় যে. আমি যেভাবে প্রতিচ্ছবিকে মূল মনে করে ভুল করেছি ঠিক তেমনি আমিও আমার জাতি সূর্য পূজায় লিপ্ত থেকে মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত আছি। অথচ সেটা মূলসত্তা এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টির একটি প্রদর্শন মাত্র। এর চাইতে বড় যুলুম আর কি হতে পারে যেমন মূলকে বাদ দিয়ে বাহ্যিক প্রকাশ্য বস্তুকে পূজা করা হচ্ছে? এখন তিনি সুলায়মানের পত্রে উল্লেখিত وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ বাক্যের মূল অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হন। সুতরাং রাণীর বিবেকে এ ধারণার উদ্রেক হতেই তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন ঃ

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"হে পরোয়ারদেগার! আমি নিজের উপর যুলুম করেছি আর এখন আমি সুলায়মানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলামান হচ্ছি"। (সূরা নাম্‌ল ঃ ৪৪)

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا -

"বেদুঈনরা বলে আমরা ঈমান এনেছি, আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা ঈমান আন নাই এবং এটা বল যে আমরা অনুগত ও বাধ্যগত হয়েছি"। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৪)

আর كُنَّا مُسْلِمِيْنَ বাক্যে اسلام অর্থ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ এবং اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বাক্যে اسلام অর্থ দ্বীন ইসলাম। এ দু'টি অর্থের পার্থক্য কুরআনের উক্ত আয়াতগুলোতেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রথম বাক্যে সাবার রাণী এমন কোন বিবরণ দেননি যা দ্বারা শিরকের প্রতি তার অনীহা এবং তাওহীদ গ্রহণের আলোচনা আছে। এজন্যেই মহান আল্লাহ্ তার এ বক্তব্যের পরই বলেন. সূর্য পূজা তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে. সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তী বাক্যে রাণী প্রকাশ্যভাবে স্বীকার কর যে, আমি ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থে নয় বরং ইসলাম ধর্মের পারিভাষিক অর্থেই ঈমান এনেছি, যা মূলত সুলায়মানের জন্য নয় বরং সুলায়মানের সাথে রাব্বুল আলামীনের জন্যেই ঈমান এনেছি। আর খুব সম্ভব এ পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম বাক্যে রাণী নিজের সাথে রাষ্ট্রীয় পারিষদবর্গ ও

প্রজামণ্ডলীকে শামিল করে বহুবচন প্রয়োগ করেছেন। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুগত্যের প্রশ্নে রাণী ও তাঁর পারিষদবর্গের মধ্যে পরস্পর পরামর্শের পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটি রাণীর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এজন্যে এটা প্রকাশের সময় রাণী একবচন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যদিও সে যুগের সাধারণ নিয়মানুযায়ী বাদশাহ্ বা রাজার ধর্ম এমনিতে প্রজাদের গৃহীত হয়ে যেত। সম্ভবত তার জাতিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকবে। মোটকথা এ তাফসীর খুবই সূক্ষ্ম আর সবদিক থেকেই বলিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য।

তাওরাতে সাবার রাণীর আলোচনা

তাওরাতের সালাতীন পুস্তকে হযরত সুলায়মান (আ.) ও সাবার রাণীর সাক্ষাতের ঘটনাটি বর্ণিত আছে। "আর যখন সদাপ্রভুর নামের কল্যাণে সুলায়মানের যশ ও খ্যাতি সাবার রাণীর কানে পৌছল, তখন সে কতগুলো কঠিন প্রশ্ন ও সমস্যা সম্পর্কে যাচাই করার জন্য অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে সুগন্ধী ছড়ানো উট নিয়ে তাঁর প্রতি রওয়ানা হন এবং বহু সোনা-দানা ও মণিমুক্তা সাথে নিয়ে জেরুযালেম উপস্থিত হন। অতঃপর তার অন্তরে যা কিছু ছিল সব বিষয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে খোলামেলা আলোচনা করেন। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। বাদশাহর কাছে এমন কোন কথাই গোপন বা অজানা ছিল না, যার উত্তর তিনি দিতে পারতেন না। অতঃপর সাবার রাণী যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামগ্রিক প্রজ্ঞা, নির্মিত প্রাসাদ, দস্তরখানায় পরিবেশিত বিভিন্ন খাবার ও নিয়ামত, অনুচরদের আনুগত্যের ধরন ধারণ, সেবকদের উপস্থিত কর্মচঞ্চলতা, তাদের পোশাক ও পানীয় পরিবেশনকারীদের শৃঙ্খলা, সদাপ্রভুর কাছে যাওয়া আসার জন্য তাঁর সিড়ি প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁর সংজ্ঞা হারানোর উপক্রম হয়। আর সে বাদশাহকে বলে যে, যা কিছু শুনেছি তার সবই সত্য, আর যা শুনেছি তা বাস্তবের অর্ধেকও ছিলনা, কেননা আপনার প্রজ্ঞাশীলতা ও সৌভাগ্যের কৃতকার্যতার খ্যাতি যা আমার কাজে পৌছেছে বাস্তবে তার চাইতে বহুগুণে বেশী আছে। আপনার লোকজন ন্যায়পরায়ণ, আপনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সদাচারী, যারা সর্বদা আপনার দরবারে উপস্থিত থাকে। সদাপ্রভু আপনার হিক্‌মতের কথা শুনেন। আপনার সদাপ্রভু কল্যাণময় হোন। তিনি আপনার উপর সন্তুষ্ট এবং আপনাকে ইসরাঈলের সিংহাসনে তিনি বসিয়েছেন এজন্যেই সদাপ্রভু ইসরাঈলীদের সর্বদা ভালবেসেছেন"। (সম্রাট পুস্তক, অধ্যায়-১, শ্লোক ১-১০)

তাওরাতের বর্ণনায় যদিও রাণীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি, কিন্তু তার সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্যে বুঝা যাচ্ছে যে, সে ইসরাঈলী খোদার প্রতি ঈমান এনেছিল। কেননা তার আলোচনা থেকে ঈমানী ভাষা প্রকাশিত হয়েছে। তবে কুরআন ও তাওরাতের আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর মাহাত্ম্য সহ সাবার রাণীর সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা ছিল একজন দৃঢ়চেতা নবীসুলভ আচরণ। কুরআনের বর্ণনার আরো দেখতে পাওয়া যায় তাঁর তাবলীগ ও দাওয়াত আর নবুওয়াতী প্রক্রিয়ার কর্মতৎপরতা। কিন্তু তাওরাতের বর্ণনায় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রজ্ঞাময় ও রাজকীয় কর্তৃত্ব ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশিত হয়না। এটা মূলত বনী ইসরাঈলের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। কেননা তারা হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বিশ্বাস করত যে, তিনি নবী নন তিনি শুধু একজন সম্রাট ছিলেন। কুরআন শরীফ যেহেতু আকীদা ও আমল সংশোধনের সাথে সাথে পূর্ববর্তী উম্মাত ও তাদের নবী-রাসূল সম্পর্কিত ঘটনাবলীতে ইসরাঈলী পরিবর্তন ও বিকৃতি এবং তাদের ভ্রান্তি ও বাহুল্যযুক্ত বর্ণনার সংশোধনের দাবীদার। কাজেই এক্ষেত্রেও কুরআন ঘটনার সঠিক তত্ত্ব পরিবেশন করেছে এবং প্রাচীন গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত ভুলভ্রান্তিগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

সাবার রাণী ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর বিয়ে

বিভিন্ন তাসফীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সাবার রাণীর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সুলায়মান (আ) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁকে তাঁর রাজত্বে চলে যাবার অনুমতি দেন। সময় সময় হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর সাথে গিয়ে সাক্ষাত করতেন। (তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪)

কিন্তু কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে হাঁ অথবা নাসূচক কোন বর্ণনা নেই।

ইসরাঈলী বর্ণনা

সাবার রাণী বিল্‌কীস ও হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কিত বর্ণিত বিবরণ ছাড়া এ পর্যায়ে আরো অনেক বিস্ময়কর ও দুর্লভ কথা জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, যার সবগুলোই আদ্যোপান্ত ইসরাঈলী ও ইয়াহূদী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। সুতরাং তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছে যে, এ পর্যায়ে ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে একটি বিস্ময়কর রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এটা আবূ বকর ইব্‌ন শাইবা (র.) ইব্‌ন সায়িব (র)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। এ রিওয়ায়েত সম্পর্কে ইব্‌ন আবূ শাইবা (র) বলেন, এ ঘটনাটি

অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু আমার মতে ইব্‌ন আবূ শাইবার এরূপ বলা উচিত নয় বরং উক্ত রিওয়ায়েতটি প্রত্যাখানযোগ্য। আর নিঃসন্দেহে উক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে আতা ইব্‌ন সায়িব (র)-এর সন্দেহ হয়েছিল যে, তিনি এ রিওয়ায়েতটি ইব্‌ন আব্বাস (র)-এর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করেন। তবে অনুমান করা যায় যে, এ ধরনের বর্ণনাশৈলী মূলত আহলে কিতাবের পুস্তিকা থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকে। আর ঘটনার বিবরণও সেভাবেই দেয়া হয়েছে। যেমন কা'ব আহ্‌বার ও ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন কাহিনী তাদের গ্রন্থসমূহ থেকে সংকলন করে এ উম্মাতকে শুনাতেন। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। সে সব কাহিনীতে বিস্ময়কর ও দুর্লভ এবং প্রত্যাখানযোগ্য কথা আর বাস্তব-অবাস্তব, বিকৃত ও পরিবর্তিত সব ধরনের ঘটনাই সংকলন করতেন। অথচ মহান আল্লাহ্ আমাদের এসব বাহুল্য ও বাজে-উদ্ভট কথা থেকে অকাট্যভাবে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। আর আমাদের এমন জ্ঞানগর্ব কুরআন দান করেছেন, যা ঘটনার বিশুদ্ধতা সৎউদ্দেশ্যের সাবলীলতা, সমার্থের স্পষ্টবাদিতা এবং বাক্য বিন্যাসের প্রাঞ্জলতা ও অলংকারিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে খুবই উন্নতমানের ও উচ্চ পর্যায়ের। (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৬৮)

কাসাসুল কুরআনে ঘটনার বিশ্লেষণ পর্যায়ে বারবার বলা হচ্ছে যে, অমুক বর্ণনাটি শুদ্ধ, অমুক বর্ণনা ইসরাঈলী রিওয়ায়েত ইত্যাদি। তাহলে ইসরাঈলীয়াত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে স্পষ্ট আলোচনা দরকার। বনী ইসরাঈলী রিওয়ায়েতের মূল উৎস বেশীর ভাগই তাওরাতের উপর নির্ভরশীল। ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় তাওরাত শব্দের অর্থ শরী'আত। এ জন্যে ইসরাঈলী বর্ণনা সাধারণত সৃষ্টি রহস্যের কাহিনীপুস্তক, ভ্রমণপুস্তক, ওল্ড টেষ্টামেন্ট, সংখ্যা পুস্তক ও ইস্তিসনা পুস্তকে ব্যবহৃত হয়। তাওরাত ব্যতীত তাদের অন্যতম উৎস হল 'নবীইম' এটা ইবরানী ভাষা রীতিতে নবী শব্দের বহুবচন। ইবরানী ভাষার কোন একবচন শব্দের সাথে ইয়া ও মীম বৃদ্ধি করে বহুবচন বানানো হয়। নাবীইম হল বনী ইসরাঈলী নবীদের ওয়ায নসীহত, উপদেশ, দানশীলতা এবং বনী ইসরাঈলী কালাম শাস্ত্র ও ইতিহাসের ভাণ্ডার। তন্মধ্যে ইউশা পুস্তক, বিচার-মীমাংসা পুস্তক, শ্যামুয়েল পুস্তক, যুগ পুস্তক ও সম্রাট পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে নাবীইমকে ও তাওরাতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। 'তারকুম' হল এর তৃতীয় অংশ। ইবরানী ভাষায় 'তারকুম' অর্থ অনুবাদ। ইয়াহূদী আলিমগণ তাওরাত ও নাবীইমের ব্যাখ্যা করেছেন আরামী ভাষায়। এ সম্পর্কে তাঁদের দাবী হল যে, তাঁরা এ ব্যাখ্যাও তাফসীর তাঁদের নবীদের কাছ থেকে শুনেছেন। এর চতুর্থ অংশের নাম মাদারেশ। ইসলাম ধর্মে হাদীসের যে মর্যাদা, ইয়াহূদীদের কাছে মাদারেশের ঠিক সে মর্যাদা। পঞ্চম অংশকে বলা হয় তালমূদ। এটা হল বনী

ইসরাঈলের ফিকহ্ শাস্ত্র। উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়া কতগুলো কাহিনী ও বর্ণনা রয়েছে। ইয়াহূদীরা সেগুলোকে ধর্মীয় সংকলনের মতই হৃদয়ে হৃদয়ে সংরক্ষণ করে রাখছে এবং বর্ণনা করে আসছে। ইয়াহূদীদের রেওয়ায়েত পর্যায়ের এসবগুলো অংশকেই ইসরাঈলীয়াত বলা হয়। তন্মধ্যে কতগুলো রিওয়ায়েত সে সব ইয়াহূদী আলিমদের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝেও সংকলিত হয়ে খ্যাতি লাভ করেছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। আর এজন্যেই একদল পূতপবিত্র মুহাক্কিক আলিম সর্বদা সেসব বর্ণনা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন এবং সেগুলো থেকে ইসলামী রিওয়ায়েতকে পবিত্র ও মুক্ত করে চলে আসছেন। যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত কুরআন ও হাদীসের বিষয়বস্তুর সমর্থন করে তারা শুধু সেসব রেওয়ায়েত বর্ণনায় নীরব সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্রের অলৌকিকত্ব

সাহিত্য বিশারদগণ বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) সাবার রাণীকে ইসলামী দাওয়াত প্রসঙ্গে যে পত্র প্রেরণ করেন, দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত যত পত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তন্মধ্যে সেটা ছিল এক অনন্য ও অতুলনীয় পত্র। সুধারণার উপর ভিত্তি করেই এ দাবী করা হচ্ছে না বরং এ দাবীর ভিত্তি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর তা হল- ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম অথচ সংক্ষিপ্ত কিন্তু লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিক থেকে খুবই স্পষ্ট, বিশুদ্ধতা ও অলংকারিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই উন্নত বর্ণনাভঙ্গী ও শব্দ বিন্যাসের আলোকে সীমাহীন মাধুর্যপূর্ণ ও সুমিষ্ট গাম্ভীর্যভরা ও হৃদয়গ্রাহী। মোটকথা, সামগ্রিক গুণে গুণান্বিত এমন কোন পত্র কোন মহান ব্যক্তির ইতিহাস গ্রন্থে এটা ছাড়া আর একটিও পাওয়া যাবেনা, যা এর সমতুল্য হতে পারে। পত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে যাতে ত্রুটি পরিলক্ষিত না হয় সেজন্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কলেবরে মহান আল্লাহ্‌র রবুবিয়াত (পালন) খালেকিয়াত (সৃষ্টিকর্তা) সার্বভৌমত্ব সাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ, নবুওয়াতী পদ্ধতিতে সত্যবার্তার ঘোষণা, প্রশাসক ও পরাক্রমশীলতা কর্তৃত্বের প্রদর্শন এবং নিজস্ব সত্তার পরিচিতি ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যার সম্পর্কে এ প্রবাদ বাক্যটিই প্রযোজ্য "কলসীতে বন্দী যেন অতল সমুদ্র"। পত্রের ভাষা ও শব্দমালা অধ্যয়ন করলে উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রময় দিকগুলো অনুধাবন করতে পারবেন। এখন বলুন, সামগ্রিক শব্দ সংযোজন ও অর্থের মানদণ্ডে পত্রটি অলৌকিক না তো আর কি? পত্র এরূপ:

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ-

"নিশ্চয়ই এটা সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই : দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।" (সূরা নাম্‌ল ঃ ৩০-৩১)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর উপর বনী ইসরাঈলের অপবাদ

বিগত পৃষ্ঠাসমূহে ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে, বনী ইসরাঈলরা তাদের উপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাবগুলোকে বিকৃত করেছিল এবং তাদের পার্থিব উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সব ধরনের পরিবর্তন সাধন করেছিল। সুতরাং হযরত দাঊদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ব্যাপারে তারা এত প্রগলভতা অবলম্বন করে যে, তারা তাঁদের নবুওয়াত ও রিসালত পর্যন্ত অস্বীকার করে এবং বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ ও অনর্থক অপবাদ লাগিয়ে দেয়। অন্যান্য বহু অপবাদের মধ্যে অন্যতম অপবাদ ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) যাদুকর এবং এর মাধ্যমে তিনি সম্রাট সুলায়মান হয়েছিলেন এবং জ্বিন, মানুষ ও পশু-পাখিকে অনুগত করে রেখেছিলেন। কুরআন শরীফ নিজের দায়িত্ব পালনের পর বনী ইসরাঈলের আরোপিত অপবাদের যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছে ও প্রত্যাখান করেছে আর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুওয়াতী মাহাত্ম্যকে করেছে প্রস্ফুটিত ও উজ্জ্বল। কুরআন বলেছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুওয়াতী আঁচল যাদুর অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগে শয়তানরা (জ্বিন ও মানুষ) বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের যাদুবিদ্যা শিক্ষা দেয় এবং তা লিপিবদ্ধ করে। ফলে ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্‌র কিতাবকে (তাওরাত ও যাবূর) পশ্চাতে ফেলে যাদুকেই ভাবতে শুরু করে আসমানী বিধান এবং তা শিখতে ও শেখাতে তৎপর হয়ে উঠে। তাদের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সত্যপন্থী পথহারাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং বলেন যে, এটা মারাত্মক পথভ্রষ্টতা ও কুফরী কাজ। একাজ থেকে তোমরা বিরত হও। কিন্তু শয়তানের প্রতারণার কারণে তারা তখন বলতে শুরু করে দেয়, এটা তো সুলায়মানের শেখানো বিদ্যা। এর মাধ্যমেই তো সুলায়মান এতবড় রাজত্বের অধিকারী হয়েছেন। এরূপ কথা বলে তারা নিজেদের গোমরাহীতে নিমজ্জিত রাখে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উপর অপবাদ রটিয়ে বেড়াত।

ঐতিহাসিক সুদ্দী বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুগেই বনী ইসরাঈলের এ পথভ্রষ্টতা শুরু হয়েছিল। তাদের মাঝে এ কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে যে, জ্বিনেরা গায়েবের খবর বা অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে। সুতরাং হযরত সুলায়মান (আ.) যখন তা জানতে পারেন তখন তিনি শয়তানদের সমস্ত লিখিত

..।গুলিপি সংগ্রহ করে তাই সিংহাসনের নীচে পুঁতে রাখেন, যাতে জ্বিন ও মানুষ কারো পক্ষে সেখানে পৌছার সাহসই না হয়। এছাড়া তিনি রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করে দেন, যে ব্যক্তি যাদু করবে অথবা জ্বিনেরা গায়বী ইল্‌ম রাখে এ বিশ্বাস পোষণ করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইন্তিকালের পর শয়তান পুঁতে রাখা লিখিত ভাণ্ডার বের করে নেয় এবং বনী ইসরাঈলের মাঝে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় যে, যাদুবিদ্যা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আয়ত্তে ছিল। তিনি এর বলেই জ্বিন, মানুষ, পশু পাখি ও বাতাসের উপর কর্তৃত্ব করবেন। এভাবে বনী ইসরাঈলের মাঝে যাদুবিদ্যা চালু করে দেয়। (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪)

কুরআন শরীফে এ ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাকে যে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাহল বনী ইসরাঈল নবী করীম (সা.) সত্য নবী বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও এবং পূর্বযুগের বহু কিতাবে তাঁর নবুওয়তের সুসংবাদ বিদ্যমান আছে, তবুও তারা একগুয়েমী ও হঠকারিতার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করছে এবং আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহকে পশ্চাতে ফেলে শয়তানের আনুগত্য করছে। হযরত সুলায়মানের যুগে যাদু সম্পর্কে ঠিক সেরূপটি করেছিল, আর অদ্যাবধি তারা অনর্থক হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি কুফরীর (যাদুবিদ্যার) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছে। সুতরাং কুরআন শরীফ এ সম্পর্কে পূর্বাপর বাস্তব ঘটনা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ- فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ- وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ أَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ - وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْابِهٖ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-

"যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের কাছে রাসূল (মুহাম্মদ সা.) আসলেন, যিনি তাদের কাছে যা রয়েছে তার সমর্থক, তখন যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল যেন তারা জানে না। এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করেন নাই বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। আর যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকে একথা না বলে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করোনা। তারা তাদের কাছ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না; আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নাই। আর তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছি, যদি তারা জানত।" (সূরা বাকারা ঃ ১০১-১০২)

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে যে সব তথ্য প্রতিভাত হয়েছে মুফাস্‌সিরীগণ সেগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা এ তিনটি কথা ছাড়াও বিগত আলোচনায় যে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, ঘটনার অবশিষ্ট বিবরণ সম্পর্কে কুরআন শরীফ নীরবতা অবলম্বন করেছে। যেহেতু এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সে বিবরণের কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং এ পর্যায়ে আমরা সাধারণ তাফসীর থেকে ভিন্ন পন্থায় অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেছি। যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতিকেই এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুসরণ করা হয়েছে। সর্বজন স্বীকৃত আলিম আনওয়ার শাহ সাহেবের তাফসীরের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

"শয়তানরা যখন বনী ইসরাঈলকে যাদু শিখিয়ে পথভ্রষ্ট করে ফেলে এবং তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, জ্বিন জাতি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে। আর যখন হযরত সুলায়মান (আ) ইন্তিকাল করেন এবং আল্লাহ্‌র কোন নবীও সে সময় তাদের মাঝে ছিল না। বনী ইসরাঈলকে সৎপথ দেখানো এবং তাদের সামলিয়ে রাখার জন্য অলৌকিক পদ্ধতিতে শতাব্দী কাল ধরে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে উত্তরাধিকারী ধারা চলে আসছিল, তারই এক পর্যায়ে আসমান থেকে হারূত-মারূত দু'জন ফিরিশ্‌তাকে নাযিল করা হয়। তাঁরা বনী ইসরাঈলকে তাওরাত থেকে সংগৃহীত আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর রহস্যাদি সম্পর্কিত এমন বিদ্যা শিখান যা যাদুবিদ্যার তুলনায় অনেক বৈশিষ্টমণ্ডিত এবং যাদুটোনার

অপবিত্র প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। এ শিক্ষার ফলে একজন ইসরাঈলী অতি সহজেই বুঝতে পারত যে, এটা 'যাদু' আর ওটা রহস্য জ্ঞানের মহান বিদ্যা। উল্লেখিত ফিরিশ্‌তাদ্বয় যখন বনী ইসরাঈলকে এ বিদ্যা শিখাতেন তখন তাদের উপদেশ দিতেন যে, এখন যেহেতু তোমাদের কাছে প্রকৃত তত্ত্ব উন্মোচিত হয়েছে এবং তোমরা হক ও বাতিলের মাঝে যে পার্থক্য তা চাক্ষুসভাবে প্রত্যক্ষ করেছ, কাজেই এখন যদি আল্লাহ্‌র কিতাবের বিদ্যাকে পশ্চাতে ফেলে পুনরায় যাদুর দিকে ধাবিত হও, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা কাফির হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, এখন আর কোন অজুহাত তোমাদের জন্য বাকী রইল না। আমাদের বিদ্যমান থাকাটা যেন তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা যে, আমাদের শিক্ষা লাভের পর তোমরা শয়তানের অনুসরণ করে যাদুর মধ্যেই উন্মাদ হয়ে থাকছ, না কি তার চাইতে শক্তিশালী ও সত্য তত্ত্ব কিতাবুল্লাহ্‌র বিদ্যার অনুসরণ করছ? কিন্তু বনী ইসরাঈলের বক্র স্বভাবজাত অভ্যাস এ স্থানেও আপন ঐতিহ্য প্রকাশ না করে ছাড়ে নাই। তারা এ পবিত্র মহান বিদ্যাকেও অবৈধ ও হারাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে। যেমন-স্বামী স্ত্রীর মাঝে অন্যায়ভাবে বিচ্ছেদ ঘটানো ইত্যাদি। তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে জগাখিচুড়ী লাগিয়ে তাকেও এক বিস্ময়কর ব্যাপারে পরিণত করে। হককে বাতিলের সাথে মিশিয়ে অথবা কোন পবিত্র বাক্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবকে অবৈধ ও হারাম কাজে ব্যবহার করা সম্পর্কে হক্কানী উলামাদের ব্যাখ্যা রয়েছে যে, এটাও যাদুকরী কাজের রূপ ধারণ করে আর সেজন্যই এটাও হারাম ও কুফরী কাজ।

(মুযিহুল কুরআন, শাহ আবদুল কাদের (র) প্রসঙ্গ আয়াত فقبضت قبضة من اثر الرسول ও কিতাবুন্নবুওয়াত, হাফেয ইবন তাইমিয়া)

আনওয়ার শাহ সাহেবের এ তাফসীর অনুযায়ী وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ আয়াতে ما শব্দটি নাবোধক নয় বরং সম্বন্ধবোধক اَلَّذِیْ। অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কেননা আয়াতে سحر ও ما انزل শব্দদ্বয়ের মাঝে معطوف ও معطوف عليه সম্পর্ক বিদ্যমান। আরবী ভাষার মূলনীতি অনুযায়ী বাক্যের প্রথম অংশ থেকে عطف এর পরবর্তী শব্দকে ভিন্ন করে বুঝানোর জন্য عطف শব্দ ব্যবহৃত হয় কাজেই আলোচ্য আয়াতে শয়তানের মাধ্যমে প্রচলিত سحر বা যাদু একটি ভিন্ন বিষয় এবং ফিরিশ্‌তাদের আনীত আসমানী বিদ্যা সম্পূর্ণ পৃথক আরেকটি বিষয়, যা পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শেখানো হয়।

সুতরাং ফিরিশতার প্রতি যাদুবিদ্যার সম্বন্ধ আরোপ করা সঠিক হতে পারে না। উক্ত তাফসীরটি অর্থের ধারাবাহিকতা পূর্বাপরের সামঞ্জস্য বিধান এবং তথ্য

ও তত্ত্বের স্পষ্ট পরিবেশনার প্রেক্ষিতে খুবই দৃঢ় আর এজন্যেই আমরা একেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

এছাড়া বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফাররা থেকেও একটি তাফসীর বর্ণিত আছে। তিনি ماانزل শব্দের ما অব্যয়কে নাবোধক স্বীকার পূর্বক বলেন যে, আয়াতের অর্থ এই, "বনী ইসরাঈলের মাঝে শয়তানের মাধ্যমেই যাদুবিদ্যা প্রসার লাভ করে আর তাদের এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক যে হযরত সুলায়মান (আ.) এ বিদ্যা জানতেন। আর এটাও অমূলক যে ব্যবিলন শহরে হারূত-মারূত দু'জন ফিরিশ্‌তা নাযিল হয়ে বনী ইসলাঈলকে যাদু শিখাতেন এবং শিক্ষা দেয়ার সময় তাদের সতর্ক করতেন যে, তোমাদের পরীক্ষার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে। তোমরা যদি একান্ত শিখতেই চাও তাহলে অবশ্যই আমরা শেখাব। কিন্তু তোমরা কাফির হয়ে যাবে। এজন্যে তোমাদের কুফরী অবলম্বন না করার উপদেশ দিচ্ছি। অতঃপর বনী ইসরাঈল যখন বাড়াবাড়ি শুরু করত, তখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর যাদু শিখাতেন। তাদের মাঝে এরূপ কাহিনী খ্যাতি লাভ করেছে এসবই মিথ্যা আর এমন কোন ঘটে নাই।"

এ আয়াতের তৃতীয় তাফসীরটি ইমাম কুরতুবী (র.) থেকে বর্ণিত আছে। ইব্‌ন জারীর (র.) ও এ তাফসীরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তাহল ماانزل আয়াতের ما শব্দটি নাবোধক এবং হারূত-মারূত-শয়তান শব্দ থেকে بدل হয়েছে এবং এর অর্থ এই যে, "বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষার জন্যে আসমান থেকে ফেরেশ্‌তারা যাদুবিদ্যা নিয়ে এসেছিল এটা ভুল, বরং শয়তানরাই যাদু শিক্ষা দিত। তন্মধ্যে ব্যবিলন শহরে হারূত-মারূত নামে দু'জন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব (যাদুকর) ছিল, তারা বনী ইসলাঈলকে তাদের ধর্মীয় জীবনের ভর্ৎসনা করে বলত যে, দেখ, তোমরা যদি আমাদের কাছ থেকে যাদু শিক্ষা কর তাহলে তোমরা কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু বনী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টতার নমুনা এটাই ছিল যে, এত কিছু শোনার পরও তাদের কাছ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের যাদু শিখত এবং আল্লাহ্‌র কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করত ?

আমাদের ধারণায় এ দু'টো তাফসীর ও সাধারণ তাফসীর থেকে খুবই ভাল। কেননা সাধারণ তাফসীর অনুযায়ী ما অব্যয়কে الذى। অর্থে স্বীকার করে এমন ভাবার্থ নেয়া যে, ব্যবিলন শহরে হারূত-মারূত নামে দু'জন ফিরিশতা বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হন এবং তাদের যাদু শেখান আর সাথে সাথে সতর্ক করে দেন যে, তোমরা এ বিদ্যা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না। শিক্ষা গ্রহণ করলে কাফির হয়ে যাবে। এটা

অকারণে কতগুলো অভিযোগ ডেকে আনা এবং سحر ও ما انزل শব্দদ্বয়ে দলীলহীনভাবে একই বিষয় মেনে নেয়া। উক্ত তাফসীরগুলো ছাড়াও আলোচ্য আয়াতের এমন কতগুলো বিস্ময়কর উক্তি সাহাবা (রা.) থেকে এবং একটি মারফূ হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অথচ মূলত এগুলো সাহাবাদের উক্তি ও নয় আর মারফূ' হাদীসও নয়। বরং কবি আহবার এর অন্যান্য ইয়াহূদী আলিমদের বর্ণিত কাহিনী, যেগুলোকে বণী ইসরাঈলের রূপকথার ভাণ্ডার বলাই যুক্তিযুক্ত। এসব কাহিনীর সারসংক্ষেপ এই একদা হারূত-মারূত ফিরিশ্তা আল্লাহ্র দরবারে মানব জাতির অন্যায় অপরাধ সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলল যে, এ সৃষ্টি কতই না নিকৃষ্ট ও অপমানিত। আল্লাহ্র সব ধরনের অনুগ্রহ তাদের প্রদান করা সত্ত্বেও তারা তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করছে। তাদের এ বিদ্রূপ আল্লাহ্ পসন্দ করেননি। তিনি তাদের বলেন, তোমরা যদি পার্থিব গণ্ডিতে ও দুনিয়ার ঝামেলায় নিমগ্ন হতে তাহলে এরূপই করতে। তখন ফিরিশতারা তাদের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে বিশ্বস্ততার দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। অতঃপর তাদের পরীক্ষার জন্যে পৃথিবীতে পাঠানো হল। এখানে থাকতে থাকতে এক সময় যোহরা নাম্নী এক অপরূপা রমনীর প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় এবং দু'জনই তার প্রেমে আটকা পড়ে। অতঃপর তারা যোহরার সান্নিধ্যে যাবার আকাঙ্ক্ষি হয়ে উঠে। যোহরা তাদের বলল, তোমরা যতক্ষণ মদপান, নরহত্যা ও প্রতিমা পূজা না করবে ততক্ষণ আমাকে লাভ করতে পারবে না। সুতরাং যোহরার প্রেমে উম্মত্ত এ দু'জন ফিরিশতা তিনটি অপরাধই করে বসল। অতঃপর তাদের একান্ত সান্নিধ্যের অবস্থায় যোহরা জিজ্ঞেস করল যে, তারা কিভাবে আসমানে যায়? ফিরিশতাদ্বয় তাকে ইস্ম আযম শিক্ষা দিল আর যোহরা তখন ইস্ম আযম পাঠ করে আসমানে উঠে গেল। আর ফিরিশতা দু'জন আল্লাহ্র শাস্তিতে নিমজ্জিত হয়। অতঃপর তাদের ব্যাবিলনের একটি কূপে বন্দী করা হয়। বর্তমানে কেউ যদি তাদের ডেকে যাদু শিখতে চায়, তখন প্রথমে তাকে নিষেধ করে এবং কাফির হয়ে যাবার ভয় দেখায়। কিন্তু যখন সে শেখানোর জন্য জিদ ধরে বাড়াবাড়ি করে তখন যাদু শিক্ষা দেয়। এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কোন জিনিস কি তোমার নযরে পড়েছে? লোকটি বলে যে, আমি একটি জ্যোর্তিময় ব্যক্তিকে ঘোড়ায় চড়ে চলে যেতে দেখলাম। ফিরিশতারা তখন বলে যে, এটা ছিল তোমার ঈমান, এখনই তা তোমার ভিতর থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আর তুমি যাদুকর হয়ে গেছ। এ দু'জন ফিরিশ্তা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র শাস্তির কারণে এভাবেই কূপে উল্টা হয়ে ঝুলতে থাকবে।

এ বর্ণনাটি যে অমূলক ও মিথ্যা তা এমনিতেই স্পষ্ট। এ জন্যে মুহাক্কিক আলিমগণ এ ঘটনাটি মিথ্যা ও অমূলক হবার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং ইসলামী রেওয়ায়েতের আঁচলকে পবিত্র ও সংরক্ষিত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ইব্ন কাসীর প্রথমেই মারফূ' রিওয়ায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, এ পর্যায়ে নির্ভুল তথ্যটি এই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে যে হাদীসটি মুসনাদে আহ্মদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তা মূলত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কা'বুল আহবার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এ রিওয়ায়েতের সম্বন্ধ আরোপ করা ঠিক নয়। সতরাং যে হাদীসটিকে মারফূ' বলা হত তা কা'ব আহ্বার (রা) থেকে বর্ণিত বলে প্রমাণিত হল। এ রিওয়ায়েত ইসরাঈলী গ্রন্থ থেকে তিনি সংকলন করেছেন। (তাফসীর ইব্ন কাসীর, ১ম খণ্ড)

এ ফায়সালার পর সাহাবা (রা) ও তাবিঈন (রা)-দের প্রতি আরোপিত বক্তব্যের সমালোচনার বিশ্লেষণ সম্পর্কিত সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

'হারূত-মারূতের কাহিনীটি (যাহরা ও ব্যবিলনের কূপের কাহিনী) তাবিঈনদের একটি বিশেষ শ্রেণী বর্ণনা করেছেন, যেমন মুজাহিদ, সুদ্দী, হাসান বাসরী, কাতাদা, আবুল আলিয়া, যুহরী, রাবী ইব্ন আনাস, মুকাতিল ও ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ। অতঃপর মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন আলিমদের অনেকেই তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসব সংকলনের অবস্থা এই যে, এ সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ বনী ইসরাঈলের কাহিনী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কেননা চিরসত্যবাদী-সাদিকুল মাসদূক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান অভ্যাস এই ছিল যে তিনি নিজে থেকে কোন কিছুই বলতেন না, তাঁর কাছে ওহী হিসেবে যা কিছু আসত তিনি তাই বলতেন। আলোচিত বিষয় সম্পর্কে কোন সহীহ্ রিওয়ায়েত হাদীস শাস্ত্রের ভাণ্ডারে পাওয়া যায় না। আর কুরআন শরীফের বর্ণিত পরবর্তী আলোচনা ও এসম্পর্কে স্পষ্ট নয়। সুতরাং এ পর্যায়ে কুরআন শরীফ যতটুকু আলোকপাত করেছে, তাই সত্য। আর আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করি। এর সঠিক বিবরণ ও ব্যাখ্যা আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়াই আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ্ই এর সঠিক তত্ত্ব জানেন। (তাফসীর ইব্ন কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১)

কুরআন শরীফে এ ঘটনাটি একটি উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাহল- বনী ইসরাঈল হযরত সুলায়মান (আ) কে যাদু বিদ্যার প্রতি যে সম্বন্ধ আরোপ করত তা মূলত গুরুতর অপবাদ ও মিথ্যাচার। এ কাজটা ছিল শয়তানের। হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন একাজ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। বনী

ইসরাঈল শয়তানের অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে ফেলে দেয়। পবিত্র কুরআন ঘটনার বাকী বিবরণ উপেক্ষা করে সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণের উপর বিশ্বাস করাই যথেষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই স্বতঃসিদ্ধ সঠিক পন্থা। কেননা বিবরণের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। অন্যান্য মুহাক্কিক আলিমগণও ইব্ন কাসীরের এ অভিমত সমর্থন করেছেন। ইব্ন তাইমিয়া ও আবূ হাইয়ান আন্দুলুসী (র) তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (বাহ্রুল মুহীত, ১ম খণ্ড)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকাল

কুরআন শরীফের সূরা সাবায় হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কিত ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একদা হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশে জ্বিনদের একটি বড় দল একটি বিরাট অট্টালিকা নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় সুলায়মানের মৃত্যুর পরোয়ানা এসে পৌছল; কিন্তু জ্বিনেরা তা বুঝতে পারল না, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর রলো বেশ কিছুদিন পর উইপোকা যখন লাঠির ভিতর খেয়ে খেয়ে ফাঁকা করে দিল এবং লাঠি শক্তিহীন হয়ে পড়ল। হযরত সুলায়মান (আ) লাঠিতে ভর দিয়ে তাদের কাজ তদারক করছিলেন এমতাবস্থায় তিনি পড়ে গেলেন। তখন জ্বিনেরা জানতে পারল যে, বহুদিন আগেই হযরত সুলায়মান (আ) ইন্তিকাল করেছেন, কিন্তু আফসোস! আমরা জানতেই পারিনি। হায়! আমাদের যদি গায়েবের ইল্ম থাকত তাহলে এতদিন পর্যন্ত কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হতো না। কেননা আমরা তো এতদিন সুলায়মানের ভয়ে মগ্ন ছিলাম। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ -

"যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জ্বিনদের তার মৃত্যু বিষয় জানাল কেবল মাটির (উই) পোকা যা সুলায়মানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলায়মান পড়ে গেল, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।" (সূরা সাবা ঃ ১৪)

কথিত আছে যে, জ্বিনেরা যখন এ রহস্য ভেদ অবগত হল তখন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যেজন্যে তারা আফসোস করতেছিল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান রাখত তাহলে অনেক আগেই তারা মুক্তি পেত।

এ ক্ষেত্রে কুরআন শরীফ যে উদ্দেশ্য নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর ঘটনা তুলে ধরেছে, ঠিক তেমনি উদ্দেশ্য নিয়ে বনী ইসরাঈলের নির্বুদ্ধিতার প্রতি ও অংগুলি নির্দেশ করেছে। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি জ্বিনেরা অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানী থাকতই তাহলে দীর্ঘ দিন যাবত হযরত সুলায়মানের ভয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ অথবা অন্য কোন শহর নির্মাণের কষ্টকর কাজে লিপ্ত থাকত না। সুতরাং হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর অভিনব রহস্য তারা যখন বুঝতে পারল, তখন জ্বিনেরা নিজে থেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, আমাদের অদৃশ্য জানার দাবী অকাট্যভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন শরীফ এতটুকুই আলোকপাত করেছে। এর চেয়ে বেশী বিবরণে যায়নি। কারণ এর আসল উদ্দেশ্য হল দাওয়াত ও তাবলীগ, সে দৃষ্টিতে বিস্তারিত বর্ণনার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কাজেই সে বিবরণের গোপন কুঠুরীতে হানা দেয়া আমাদেরও দরকার নাই। হযরত সুলায়মান (আ) কতদিন পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? কি অবস্থায় ছিলেন ? মানুষ ও জ্বিন উভয়েরই এ ব্যাপারে কোন কিছু জানা ছিলনা। না কি শুধু জ্বিনেরাই জানত না যারা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে অনেক দূরে কোন একটি শহর নির্মাণ কাজে লিপ্ত ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব বিস্তারিত জানার দরকার নাই।

তবে অবশ্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগৃহীত একটি রেওয়ায়েতে আছে, মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সংবাদ দিল যে, তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা বাকী আছে, তখন তিনি ভাবলেন যে, জ্বিনেরা হয়ত কোন নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখে দেবে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ জ্বিনদের দ্বারা একটি স্ফটিক মণ্ডিত। কক্ষ তৈরি করান আর তাতে কোন দরজা রাখেন নি। অতঃপর তিনি তাতে ঢুকে বন্ধ করে দেন এবং লাঠিতে ভর দিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যান। এ অবস্থায়ই মুত্যুর ফিরশ্‌তা তাঁর কাজ সমাধা করেন। প্রায় এক বছর পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায় দাঁড়ি ছিলেন। আর জ্বিনেরা ছিল নির্মাণ কাজে লিপ্ত। অতঃপর যখন তারা নির্মাণ সমাপ্তে করে অবসর হয় তখন হযরত সুলায়মান (আ) এর লাঠিতে উঁই পোকা সৃষ্টি হয়। এবসব পোকা লাঠি খেয়ে শক্তিহীন করে দেয়ার ফলে হযরত সুলায়মান (আ)-এর ভার সামলাতে অক্ষম হয়ে যায়। আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারে যে, বেশকিছু দিন আগে

সুলায়মানের ইন্তিকাল হয়েছে। আর তারা নিজেদের অজ্ঞতার জন্য পরিতাপ করতে থাকে। (তাফসীরে ইব্ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২৯-৫৩০)

মোটকথা এধরনের আরো কিছু ইসরাঈলী রিওয়ায়েত সংকলিত হয়ে তাফসীর গ্রন্থসমুহে বর্ণিত হয়েছে। তাত্ত্বিক মুহাক্কিকগণ এসব বর্ণনার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে তাওরাতে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ হযরত সুলায়মান (আ) জেরুজালেমে সমগ্র ইসরাঈলের উপর ৪০ বছর রাজত্ব করেন। অতঃপর তাকে তাঁর বাপদাদার সাথে সেহুন শহরে সমাহিত করা হয়। অতঃপর তাঁর পুত্র রজআম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজ্য পরিচালনা করেন। (সালাতীন ১. অধ্যায় ১১, শ্লোক ৪২-৪৩)

কাযী বায়যাভী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত দাঊদ (আ) এর মৃত্যুর সময় সুলায়মানের বয়স ছিল ১৩ বছর, সে সময় তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ৫৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (তাফসীর, সূরা সাবা : বায়যাভী) কাযী বায়যাভীর এ বক্তব্য সম্ভবত তাওরাত থেকেই গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ঘটনা প্রবাহ যে ধারাবাহিকতা ও বিস্তারিত পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সূক্ষ্মদর্শীদের জন্য তা বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আহবান করে।

তাতে রয়েছে নসীহতের সুন্দর বার্তা যা তত্ত্বদর্শীদের দৃষ্টির সামনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষ প্রনিধাণযোগ্য ঃ

১. পূর্ববর্তী উম্মাতের লোকেরা আল্লাহ্র সত্য দ্বীনে নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু বিকৃতি সাধন করেছে। তন্মধ্যে লজ্জাজনক বিকৃতি হল, আল্লাহ্র সত্য নবীদের এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের উপর অপবাদ আরোপ করা এবং তাঁদের প্রতি অমূলক ও অশ্লীল বিষয়ের সম্বন্ধ আরোপের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে বনী ইসরাঈলের পদক্ষেপ সবচাইতে অগ্রণী ছিল। তারা একদিকে কাউকে নির্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহ্র নবী ও রাসূল স্বীকার করে আর অপর দিকে বিনাদ্বিধায় তাঁর উপর লজ্জাস্কর ও অনৈতিক বিষয়ের অপবাদ আরোপ করতে শুরু করে। যেমন হযরত লূত (আ) ও তাঁর কন্যাদের সম্পর্কিত ব্যাপারে করেছে। (তাওরাত, জন্ম অধ্যায় ১৯, শ্লোক ৩০-৩৮)

এ ছাড়া তারা কতক নবী-রাসূল ও আল্লাহর সম্মানিত পয়গাম্বরদের রিসালাত ও নবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করাকে গৌরবজনক কাজ মনে করে, যেমন ঃ- হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কিত ব্যাপার

কুরআন শরীফ দ্বীনের ব্যাপারে সত্যবাদিতা ও হকের প্রচার সম্পর্কে যে দায়িত্ব পালন করেছে এবং ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের প্রকৃত আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছে, তা নিঃসন্দেহে কুরআনের অগণিত অনুগ্রহ রাজির মধ্যে অন্যতম বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা কুরআন সেসব নবী-রাসূলদের আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে বনী ইসরাঈলের আরোপিত যাবতীয় উদ্ভট ও বাজে কাহিনীকে প্রমাণ সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁদের পবিত্রতা নবুওয়াতের আঁচলে আরোপিত কলুষতা থেকে নিষ্কলুষ করে দেখিয়েছেন। তাছাড়া কুরআন তাঁদের প্রকৃত তত্ত্বকে দৃশ্যমান করে দৃষ্টিহীন গোপন অন্ধদের আত্মার আবর্জনার যবনিকা ছিন্ন করে দিয়েছে।

২. শত সহস্র নসীহত উপযোগী কথা এই যে, বনী ইসরাঈল যে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল এবং কুরআন শরীফ সুস্পষ্ট দলীল উপস্থাপন করে যেসব বিষয়কে প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে, আমাদের আঁচল ও সে সব প্রত্যাখ্যাত বিষয়ের কলুষতা থেকে পবিত্র থাকে নাই। আমরা তো কুরআনের পরিষ্কার ও আলোক উজ্জ্বল রাস্তা ছেড়ে বনী ইসরাঈলের বিকৃত রিওয়ায়েত সমূহকে ইসলামী রিওয়ায়েতের মর্যাদা দিতে শুরু করেছি। "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় শুধু এতটুকু বলেছিলেন যে, আহলে কিতাবের যেসব রিওয়ায়েত কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার বিপরীত নয় সেগুলো সংকলন করা বৈধ হবে।" আমরা এ উক্তির মৌলিক শর্ত "কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার বিপরীত নয়" কে উপেক্ষা করে সবধরনের ইসরাঈল রিওয়ায়েতকে শুধু সংকলনই করি নাই বরং কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা করার সময় সেগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেছি এবং স্থানে স্থানে কুরআনের তাফসীর করতে গিয়ে সে গুলোই পরিবেশন শুরু করেছি। এর ফলে একদিকে অমুসলিমরা এসব বর্ণনাকে ইসলামী বর্ণনা বলে প্রকাশ করেছে এবং তাতে রঙ-রস লাগিয়ে ইসলামের নির্মল ও পবিত্র শিক্ষার উপর আঘাত হানতে শুরু করেছে। আর তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অপকৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যেই যেসব নাস্তিক ও ধর্মহীনতার পতাকাবাহী রয়েছে তারা এসব রিওয়ায়েতের ছত্রছায়ায় কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রামণিত ও ওহীপ্রাপ্ত বিশ্বাস, হাশর-নশরের বর্ণনাও জান্নাত জাহান্নামের বিবরণকে অবিশ্বাস করার

রাস্তা বের করেছে এবং এ জাতীয় বিশ্বাসের প্রতিটি ব্যাপারেই বলতে শুরু করেছে যে, এটা তো আমাদের মুফাস্সিরদের অভ্যাস অনুযায়ী ইসরাঈলী আকীদা বিশ্বাস থেকেই গ্রহণ করেছি। অথচ উক্ত বর্ণনার জন্য কুরআন শরীফ অথবা হাদীসে রাসূলের অকাট্য দলীল সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে। সুতরাং স্যার সৈয়দ আহম্মদ, মৌলভী মুহাম্মদ হাসান আমরভী, মৌলভী চেরাগ আলী, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মুহাম্মদ আলী লাহোরী প্রমুখের তাফসীর ও তাফসীর ভিত্তিক প্রবন্ধই এসব নাস্তিকতার মূলসূত্র। মোটকথা, উল্লেখিত দু'টি পথই ভ্রান্ত। ইসলামী শিক্ষার বিপরীত ইসরাঈলী বর্ণনাকে ইসলামিয়াত তথা কুরআনী তাফসীরে স্থান দেয়া মারাত্মক ভুল ও ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ, সেটা যতই না সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বর্ণনা করা হোক। তদ্রুপ নাস্তিকতার পথে আহ্বান করার জন্যে এসব সংকলিত রিওয়ায়েতকে ঢাল বানিয়ে কুরআন ও হাদীসের দলীলকে অস্বীকার করা অথবা তাফসীরের নামে অতি সংগোপনে অর্থগত বিকৃতির পদক্ষেপ নেয়া মূলত ইসলামী শিক্ষাকে ধ্বংস করা এবং এর নাম নিশানা মিটিয়ে দেয়ার নামান্তর।

মুহাক্কিক আলিমগণ যে পথ অবলম্বন করেছেন,সেটাই শুধু সঠিক ও সরল পথ। তারা কুরআন-হাদীসের উপস্থাপিত দলীলের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন এবং তাতে নাস্তিকতাপূর্ণ ব্যাখ্যাকে বিকৃত ব্যাখ্যা হিসেবে মনে করেন। এছাড়া কুরআন হাদীসের আঁচলকে ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে পবিত্র বলে প্রমাণিত করে মূল বিষয়ের আলোকে সবকিছু সামনে তুলে ধরেন।

৩. রাজকীয় কর্তৃত্ব পরিচালনায় নবী-রাসূল ও পার্থিব রাজা-বাদশাদের জীবনে সর্বদা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল এবং আছে। প্রথমোক্ত মহান ব্যক্তিদের জীবনের প্রতিটি দিক এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয়-ভীতি, আদল ও ন্যয়বিচার সত্যের দাওয়াত ও হিদায়েত এবং সৃষ্টির সেবার আদর্শে সমুজ্জ্বল। তারা কোন ক্ষেত্রে বৈধ উপায়ে-রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দাপট প্রদর্শন করেন, তবু তাতে অহংকার ও ঔদ্ধত্বের পরিবর্তে পরিস্ফুটিত হয় আল্লাহর নির্দেশিত হুকুমের তাবেদারী। অর্থাৎ তাদের ক্রোধ নিজ স্বার্থে নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয় বরং মহান আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত ইউসুফ, হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর পবিত্র জীবনকাল এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্মকালের প্রতিটি শাখায় ব্যক্তি স্বার্থ ও দলীয় প্রাধান্য ও দাপটের প্রদর্শনী, দুর্বলদের উপর নিঃপীড়ন ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মৌলিক কর্মসূচী হিসেবে পরিগণিত হত।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফির'আউনের এ ঘোষণার প্রতি চিন্তা করা হোক, সে ঘোষণা দিয়েছিল انا ربكم الاعلى। অর্থাৎ আমি তোমাদের সর্ববৃহৎ রব, অন্য কেউ নয় পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মানের এ চিঠির বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন, الا تعلوا علي واتوني مسلمين অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করোনা, আর আনুগত্য স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।" (সূরা নামল ঃ ৩১) দু'টি বাক্যেই রাজকীয় ক্ষমতা প্রদর্শনের বিষয়ে বিদ্যমান; কিন্তু ফিরিশ্‌তাগণের ঘোষণায় আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ, আল্লাহর সৃষ্ট জীবের উপর নিঃপীড়নমূলক দাপট এবং খোদাই দাবীর জন্য অহংবোধের মত বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। অথচ সুলায়মানের চিঠির ভাষায় প্রাপকের সামনে স্বীয় সার্থ ও ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রদর্শনের ব্যাপার নয় বরং এক আল্লাহর হিদায়েত, আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার প্রচার এবং শিরক থেকে অসুন্তুষ্টি প্রকাশ করার সাথে সাথে একত্ববাদের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। নবীদের ওয়ারিস আলিম সামাজের সত্য খিলাফত ও পার্থিব রষ্ট্রপ্রধানদের মাঝে এ রকম পার্থক্য বিদ্যমান থাকাই উচিত।

৪. যে ব্যক্তির জীবন নিখুঁতভাবে আল্লাহর জন্যে নিবেদিত হয়ে যায়, আল্লাহও সমুদয় সৃষ্টিকে তাঁর অনুগত করে দেন। অতঃপর তাঁর অবস্থা এরূপ হয়ে যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার একটি পদক্ষেপ ও পড়েনা। আর সে তখন যদি এমন কাজ করে দেখাতে পারে যা পার্থিব কোন কারণ বা মাধ্যম ছাড়াই বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

তখন অসীম শক্তিসম্পন্ন ও সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিরা তা দেখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না, যে ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এ অলৌকিক কাজটি সংঘটিত হয়েছে, সে আল্লাহর কুদরতী হাত হার মাথায় উপর বিরাজমান। এছাড়া তারা এ অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের মানদণ্ডে ওযন করে তা অস্বীকার করতে উদ্যত হয়। নিঃসন্দেহে এটা মারাত্মক ভুল ও পথভ্রষ্টতা। এ পর্যায়ে সে পথই স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সরল পথ, যে সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআন হাদীসের আলোকে সর্বদা দিক নির্দেশনা দান করেছেন। তাদের মতে "সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয় সর্বদা সংঘটিত হচ্ছে, কাজেই একে অস্বীকার করা মানে হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিষয়কে অস্বীকার করা। কেননা প্রাকৃতিক নিয়ম ও স্বাভাবিক বিধানের রহস্যের স্রষ্টার জন্য কোন একটি বিধানকে ভঙ্গ করার অধিকার রয়েছে। বরং এতে মনে হয় খুব সম্ভবত যেসব বিষয়ের মু'জিযা প্রথম থেকে ভিন্নরূপ প্রাকৃতিক ও কুদরতী বিধানের আওতায় সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলো সাধারণ নিয়ম থেকে বিশেষ নিয়মের আওতাধীন। আর যেহেতু পার্থিব জ্ঞান

বিজ্ঞান সে বিধানের প্রান্ত সীমায় পৌছাতে সক্ষম নয় এবং তা উদ্‌ঘাটন করার ক্ষমতা রাখেনা, সেহেতু আমরা নিজেদের সংকীর্ণ বুদ্ধির মাপকাঠিতে মনে করি যে, এসব বিষয়গুলো সাধারণ নিয়ম ভঙ্গকারী ; অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়: বরং প্রকৃতিক বিধানের সাথেই এগুলোর সম্পর্ক বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু এতটুকুন যে, কতগুলো সাধারণ আর কতগুলো বিশেষ গুণে গুণান্বিত। প্রাকৃতিক বিধানের বন্টন সম্পর্কে ইসলামী মনীষীগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যে কারণে তাঁরা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করার মত ক্ষমতা রাখেন। তাঁদের সাধ্যমত্র সব বিষয় প্রকাশিত হয় সেগুলো বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে দৃশ্যমান হয়ে থাকে। যেমন, মু'জিযা ও কারামতের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

৫. শয়তানী নিদর্শনের মধ্যে সবচাইতে জঘন্য কাজটি হল স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পার্কের মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং শত্রুতার বিষময় পরিস্থিতির উদ্ভব করা। যার ফলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ কাজটি এ কারণে জঘন্য যে, সাধারণত এর ফলে মিথ্যাচার, অপবাদ, কুকথা চরিত্রহীনতা, দুষ্কর্ম ও অশ্লীলতা এমনকি কুফর পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে যায়। এ কারণে শয়তানের কাছে এ কাজটি খুবই পসন্দনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইব্‌লীস প্রতিদিন প্রত্যুষে তার সিংহাসনটি পানির উপর স্থাপন করে অতঃপর তার দল বলকে মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য যমীনের বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয়। তাদের মাঝে যে সবচাইতে বেশী বিপর্যয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, সে ইব্‌লীসের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। সুতরাং প্রতিটি শয়তান কর্মস্থল থেকে ফিরে, এসে নিজেদের কাজের বিবরণ প্রদান করে। যেমন কেউ এসে বলে, আমি অমুক ব্যক্তিকে তার মুখ দিয়ে অশ্লীল বাক্য বের করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে চিমটি কাটছিলাম। কিন্তু ইব্‌লীস এ ধরনের কাজের তেমন প্রশংসা করেন, বরং এটাকে একটা সাধারণ ফিত্‌না বলে মনে করে। ইত্যবসরে কেউ যদি এসে বলে যে, আমি তো অমুক দম্পতির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি এবং তাদের মধুর সম্পার্কের মাঝে তিক্ততা ও ফাটল ধরাতে পেরেছি। তা শোনে ইব্‌লীস তাকে গলায় মিলিয়ে নেয় এবং ধন্যবাদ ও বাহবা দিয়ে তাকে বলে যে, তুমি একটা কাজের মত কাজ করছ। (সহীহ্ মুসলিম)

জ্বিন ও মানুষের যাদুবিদ্যা স্বাধারণত এমন কুমন্ত্রণা ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় যা উভয়ের মাঝে কুধারণা, অশ্লীল কথাবার্তা এবং তিক্ততা সৃষ্টি করে। অতঃপর এ অবস্থা, ধীরেধীরে ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতার পর্যায়ে পৌছে, পরিশেষে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে বিচ্ছেদ বিরহ।

হযরত আইউব আলাইহিস্ সালাম

কুরআন শরীফে হযরত আইউব (আ)

কুরআন শরীফের চারটি সূরায় সূরা নিসা, সূরা আন'আম, সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাদ-এ হযরত আইউব (আ)-এর বর্ণনা এসেছে। সূরা নিসা ও আন'আমে নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের তালিকায় শুধুমাত্র তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ-

"এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মান।" (সূরা নিসা ঃ ১৬৩)

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ -

"এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুন"। (সূরা আন'আম ঃ ৮৪)

সূরা আম্বিয়া এবং সূরা সাদ এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাঁদের উপর যাচাই বাছাইয়ের এক চরম মুহূর্ত নেমে এসেছিল। বিপদ-আপদ চতুর্দিক থেকে তাঁদের ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া অনুযোগ অভিযোগের একটি শব্দ ও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে নাই। পরিশেষে মহান আল্লাহ্ তাঁর করুণার ছায়াতলে তাঁদের স্থান দিলেন এবং বিপদাপদের ঘনঘটা দূরীভূত করে মেহেরবানী ও অনুগ্রহের সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিলেন। এজন্যেই কুরআনে বর্ণিত ঘটনা পরিবেশনের পূর্বে ইতিহাসের আলোকে হযরত আইউব (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা হওয়া উচিত বলে মনে হয়। এতে আমরা এ মহান ব্যক্তির সঠিক পরিচিতি লাভ করতে পারব। কুরআনে তাঁর ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে সপ্রশংসা আলোকপাত করা হয়েছে এবং তাঁর জীবনকে এক কল্যাণময় ও উন্নত নৈতিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

হযরত আইউব (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব

হযরত আইউব (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দু'টি উৎস হতে পারে। প্রথমত তাওরাত, দ্বিতীয়ত, সেসব সংগৃহীত তথ্য, যেগুলোকে আরব ঐতিহাসিক ও ইসলামী ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছেন। আর যদি এগুলোর সাথে বাইরের কোন তথ্য শামিল করে দেয়া হয় তাহলে বিষয়বস্তুটি আরো বেশী আলোকিত হয়ে উঠে।

'সিফরে আইউব' নামক পুস্তিকা হল হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ। গোটা তাওরাতে হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে যে সব বর্ণনা স্থান পেয়েছে, তার সমন্বিত পুস্তিকা হল 'সিফরে আইউব'। এতে রয়েছে তাঁর পূত-পবিত্র জীবনের বিস্তারিত আলোচনা। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে 'সিফরে আইউব' এ হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে দু'টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১. তিনি ছিলেন আইয নামক প্রদেশের বাসিন্দা। "আইয নামক অঞ্চলে আইউব নামে একজন বুযুর্গ ও সত্যবাদী লোক বাস করতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ ভীরু মুত্তাকী এবং পাপকাজ থেকে তিনি দুরে থাকতেন"। (প্রথম অধ্যায়, শ্লোক -১)

২. সাবা ও ব্যাবিলনীয়রা তাঁর পালিত পশুর উপর একবার আক্রমণ চালায় এবং লুটপাট করে সেগুলো নিয়ে যায়। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় তিনি উপরোক্ত দু'টি জাতির উত্থানের সময়কালের সময় সাময়িক ছিলেন।

ইউবাব ও আইউব

'সিফরে আইউব' বর্ণিত এ দু'টি তথ্য ছাড়া ও আরেকটি ঐতিহাসিক বিষয় পাওয়া যায়, যা হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে গবেষণার কাজে সাহায্য দিতে পারে। আর তা হল-তাওরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে ইউবাব নামে এক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষকদের ধারণা যে, আইউব আর ইউবাব একই ব্যক্তির দু'টি নাম। মূলত হিবরু ভাষায় 'ইউবাব' শব্দটিকে আওব বলা হয়েছে। পরে আরবী সাহিত্যে তা আইউব নাম ধারণ করেছে। কিন্তু এ বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও বিভিন্ন ভাষায় আইউব, ইউবাব ও আওব একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। হযরত আইউব (আ.)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তারপরও কিছু বিশ্লেষণের দাবী থেকে যায়। তাওরাতের বর্ণনা মতে-ইউবাব দু'জন পৃথক-পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। একজন ছিলেন বনী একতান গোত্রের আর অপরজন বনী আসম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। একতান গোত্রীয় ইউবাব ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম বহু পূর্বেকার লোক। কেননা তাঁর বংশ তালিকার পঞ্চম স্তরে গিয়ে হযরত নূহ্

আলাইহিস্ সালামের সাথে পৌছে যায়। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : ইউবাব পিতা একতান, পিতা-ঈর, পিতা-সিলাহ্, পিতা-ইরেফকাসাদ, পিতা- সাম, পিতা-নূহ্ (আ.) (জন্ম পুস্তিকা, অধ্যায় ১০, শ্লোক ২১-২৪) আর আসম গোত্রীয় ইউবাব যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বেকার লোক ছিলেন। কিন্তু প্রথম ইউবাবের চাইতে এর সময়কাল অনেক পরবর্তী যুগ ছিল। এজন্যেই হযরত ইসহাক (আ.)-এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসম হল ইসহাক তনয় ঈসার একটি উপাধি। তিনি ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ ভাই, তিনি কিনান মাতৃভূমি ছেড়ে তার চাচা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কাছে হেজাযে (আরবে) চলে আসেন এবং তাঁর কন্যা মহল্লাহ মতান্তরে বাশামাকে বিয়ে করেন। তারপর তিনি আরবের এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এটা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ আরবের শেষ সীমায় অবস্থিত, শেখ সোঈর পর্বতমালার শাখাগুলো লম্বভাবে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। অথবা এটা বলা যায় যে, এ স্থানটি উমান থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত বিস্তৃত ও প্রশস্থ। (দায়রাতুল মা'আরেফ; বুস্তানী ২য় খণ্ড; গণনা পুস্তক-অধ্যায় ২, শ্লোক-১৪)

এই ঈসো বা আসমের গোত্রে শতাধিক রাজকীয় ও ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। ঐতিহাসিকদের মতে তাঁদের রাষ্ট্র পরিচালনা প্রায় ১৭০০ খৃ. পূর্ব সাল থেকে শুরু হয়েছিল। সুতরাং হযরত মূসা (সা.)-এর যুগে বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে ফিরে আসে, তখন বনী আসম ছিলেন সাঈর অঞ্চলের রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তাওরাতে আছে, তখন হযরত মূসা (আ.) কাদেস থেকে আসওয়ামের বাদশাহর কাছে এই বলে একজন দূত পাঠালেন যে, আপনার ভাই ইসরাঈল বলেছেন, আমাদের উপর এমন সব বিপদ আপতিত হয়েছে যে সম্পর্কে আপনি অবহিত। আর বনী ইসরাঈলের সবগুলো দল কাদেস থেকে রওয়ানা হয়ে হুর পর্বতের কাছে এসে উপস্থিত হল। আর সদা প্রভু হুর পর্বতে মূসা ও হারূনের সাথে কথা বলেন। এ পর্বতটি আসম শাসিত রাজত্বের সীমান্তের সাথে মিলিত ছিল । (গণনা পুস্তক, অধ্যায় ২, শ্লোক ২২-২৩)

তাওরাতে আসম গোত্রীয় রাজাদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়-বনী ইসরাঈলের মধ্যে তালূতের যে বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এর পূর্বে আদূম রাজত্বের বিশালতা ছিল উল্লেখযোগ্য এবং তার ১০০০ খৃ: পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ গোত্রের ৮ জন রাজ রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ইউবার ইব্‌ন যাবিহ্ ছিলেন রাজা। (জন্ম পুস্তক, অধ্যায় ২৩, শ্লোক ৩২-৩৯)

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে হযরত আইউব (আ.) আর ইউবাব যদি একই ব্যক্তির দু'টি নাম হয়ে থাকে, তাহলে উপরোক্ত তথ্যটি কার সম্পর্কে প্রযোজ্য? এর উত্তরে ঐতিহাসিকগণ দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মাওলানা আযাদ বলেছেন, তিনি ছিলেন এক্‌তান গোত্রীয় আরবী লোক। সুতরাং তিনি হযরত আইউব (আ.) অথবা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সময়সাময়িক অথবা কমপক্ষে হযরত ইসহাক (আ.) ও হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমত তাওরাতের বর্ণনা থেকে অধিকাংশ গবেষক এমত পোষণ করেন যে, হযরত আইউব (আ.) ছিলেন আরব অধিবাসী এবং আরবেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'সিফরে আইউব' গ্রন্থটি মূলত আরবী ভাষায় রচিত হয়েছিল পরে হযরত মূসা (আ.) তা প্রাচীন আরবী থেকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করান। 'সিফরে আইউব' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি আইযের দেশে বাস করতেন। এ অধ্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, তাঁর পশুপালের উপর সাবা গোত্রীয় লোকেরা আক্রমণ চালিয়েছিল। উপরোক্ত দু'টি বক্তব্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, জন্ম পুস্তক ও প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর বংশ তালিকায় বলা হয়েছে, আউয পিতা-আরা, পিতা-সাম, পিতা-নূহ্ (আ.) আর সর্বসম্মতভাবে একথা স্বীকৃত যে, আরামী গোত্র আরব আরবীয়দের প্রাথমিক গোত্রগুলোর অন্যতম। (তর্জমানুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬)

আরব ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকিরও এমত পোষণ করেছেন যে, হযরত আইউব (আ.) ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর নিকটবর্তী যুগের ব্যক্তিত্ব তিনি আরো বলেন. হযরত আইউব (আ.) হযরত লূত (আ.)-এর সমসাময়িক ও দ্বীনে ইব্‌রাহীমের অনুসারী ছিলেন। (ফাত্‌হুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৬)

আর ঐতিহাসিক নাজ্জার মিসরী আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, হযরত আইউব (আ.)-এর যুগ ছিল হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর একশ বছর পূর্বের যুগ। (কাসাসুল আম্বিয়া পৃ. ৪১৫)

মাওলানা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী বলেন, হযরত আইউব (আ.) আদূম গোত্রীয় লোক ছিলেন। খৃ. পূর্ব ১০০০ থেকে খৃ. পূর্ব ৭০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর যুগ অতিবাহিত হয। সুতরাং তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আরদুল কুরআন' এ উল্লেখ করেন, হযরত আইউব (আ) যে আসম গোত্রের লোক, এ ব্যাপারটা 'সিফরে আইউব' পুস্তক থেকে প্রমাণিত। আইয দেশে একজন সৎকর্মশীল, সত্যবাদী. আল্লাহ্ ভীরু এবং অন্যায় থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তি হিসেবে হযরত আইউব (আ) পরিচিত ছিলেন। তাওরাতে দু'জন আউযের নাম বিদ্যমান। একজন তো অতি প্রাচীন। যিনি আইয-পিতা-আরাম, পিতা-সাম, পিতা-নূহ্

(আ.)। আহলে কিতাবদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, তিনি দ্বিতীয় আউয ছিলেন। আউয যে আসম গোত্রীয় আরবী লোক তার বড় প্রমাণ হল, 'সিফরে আইউব' গ্রন্থে আইউবের সঙ্গী-সাথীদের আবাসভূমির যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা হলো ইয়ামান, নিমাতান ও সোহান। প্রথমোক্ত স্থানটি আদূমী রাজত্বের একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল। আইউবের যুগ সম্পর্কীয় প্রশ্নের ফায়সালাও অতি সহজ ব্যাপার। কেননা কালদান ও সাবা গোত্রীয় লোকেরা তাঁর সমসাময়িক ছিলেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। সাবা গোত্রের উত্থান ছিল ১০০০ খৃ. পূর্ব থেকে ৭০০ অব্দ পর্যন্ত। সুতরাং এ দু'টি যুগের সীমার মধ্যে কোথাও হযরত আইউবের যুগ নির্ধারণ করতে হবে। (আরদুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪-৩৬)

এখানে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয় ঐতিহাসিক সাবা ও কালদান গোত্রকে সমসাময়িক হিসেবে প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন; কিন্তু এর ফল দাঁড়াচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন এবং থেকে অপরের বিপরীত ফায়সালা পেশ করছেন। সাইয়িদ সুলায়মান নদভীর বক্তব্যে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকূবীর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেন, "يوباب هو ايوب بْن زارح الصديق" ইউবাব আইউব সাদীক ইব্‌ন যারিহ্ ছিলেন। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে আমাদের ধারণা তৈরী হয় এই নিঃসন্দেহে একথা ঠিক যে, আইউবই ইউবাব এবং তিনি একতান গোত্রের নন বরং আদূম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত আইউব (আ.)-এর যুগ

তাঁর কর্মকাল সম্পর্কে সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (র) যে গবেষণা লব্ধ অভিমত পেশ করেছেন , তা সঠিক নয়। তিনি বলেছেন, হযরত আইউব (আ.) সময়কাল ১০০০ খৃ. পূর্ব থেকে ৭০০ খৃ. পূর্ব পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে ছিল। তাঁর এ বক্তব্য অযৌক্তিক ও অশুদ্ধ। বরং সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য হল, হযরত আইউব (আ.)-এর সময়কাল ছিল হযরত মূসা (আ.) হযরত ইসহাক (আ.) ও হযরত ইয়াকূব (আ.) এর মধ্যবর্তী যুগ, যা ১৫০০ খৃ. পূর্ব থেকে ১৩০০ খৃ. পূর্ব অব্দের প্রান্তে অনুসন্ধান করতে হবে।

আমাদের এ গবেষণা কয়েকটি প্রামণিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেগুলো এতই স্পষ্ট যে, এদের দলীল নামে অভিহিত করলে, অত্যুক্তি হবে না। ১. প্রথম প্রমাণ-তাওরাত গবেষকদের সর্বসম্মত অভিমত হল, হযরত আইউব (আ.)-এর পুস্তিকা হযরত মূসার (আ.) পূর্ববর্তী যুগে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) সে গ্রন্থটা প্রাচীন আরবী থেকে হিব্রু ভাষার রূপান্তরিত করান। গোটা তাওরাতের মধ্যে 'সিফরে আইউব' পুস্তিকাটি সবচে প্রাচীন।

২. দ্বিতীয় প্রমাণ-যেসব ঐতিহাসিক বলেছেন যে, হযরত আইউব (আ.) ছিলেন আদূম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, তারাও তাঁর ও আদূমের মাঝ্যে দু'টি মাধ্যমের অধিক মাধ্যম আছে বলে বক্তব্য পেশ করতে পারে নাই, অর্থাৎ আইউব পিতা- যিরাহ. পিতা-মোছস, পিতা- ঈসো বা আদূম (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৬)

৩. তৃতীয় প্রমাণ- সেসব ঐতিহাসিক হযরত আইউব (আ.)-এর বংশ তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে যখন মাতৃধারা তালিকা তুলে ধরেন, তখন হযরত লূত (আ.) তনয়াদের থেকে শুরু করে হযরত ইউসুফের ছেলেদের অধঃস্তন স্তরে পৌছতে পারেন না যেমন- ইব্‌ন আসাকির বলেন, হযরত আইউব (আ.) ছিলেন হযরত লূত (আ.)-এর কন্যার ছেলে। কাযী বায়যাভী উল্লেখ করেন, তিনি (আইউব) ছিলেন ইয়াকূবের কন্যা লিইয়ার ছেলে অথবা মীশা ইব্‌ন ইউসুফের কন্যা মাখীরের ছেলে, অথবা আফরাঈন ইব্‌ন ইউসুফের কন্যা রহমতের ছেলে। (তাফসীরে বায়যাভী, সূরা আম্বিয়া)

৪. চতুর্থ প্রমাণ- সাইয়িদ সুলায়মান নদভী (র.) আইয়ের যে বংশ তালিকা পেশ করেছেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আইউবের বংশ তালিকা কোন প্রতিবাদ- সমালোচনা ছাড়াই সঠিক হতে পারে। অর্থাৎ ইউবাব (আইউব) পিতা-যারিহ, পিতা-আউয, পিতা- দীসান, পিতা-ঈসো, পিতা- ইসহাক (আ.) এর তালিকার যদিও সাধারণ ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তালিকা থেকে শুধুমাত্র দীসান নামটি অতিরিক্ত, তবু এতে এমন পার্থক্য সূচিত হয় না যে, তাঁর সময়কাল পিছিয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর পরবর্তী সময়ে চলে যাবে এবং ১০০০ খৃ. পূর্ব থেকে ৭০০ অব্দের মর্ধবর্তী সময়ে পৌছে যাবে।

উপরোল্লিখিত তথ্য প্রমাণের মধ্যে প্রথমটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কেননা তাওরাত গবেষকগণ ইতিহাসের আলোকেই এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, 'সিফরে আইউব' গ্রন্থটি হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী সময়ে রচিত। কাজেই এটা শুধু নিদর্শনই নয়, বরং অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রমাণ যদিও নাম নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনা সাপেক্ষে হতে পারে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তাওরাত ও ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে বংশ তালিকার যে ধারা তুলে ধরা হয়েছে, তা হযরত ইউসুফের প্রপৌত্র অথবা হযরত লূত (আ.)-এর প্রপৌত্র হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত মতই নয় বরং তা একটি বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর চতুর্থ প্রমাণটিতেও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আইউব (আ)-এর সময়কাল হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বেই ছিল এবং তা ১৫০০ খৃ. পূর্ব থেকে ১৩০০ খৃ. পূর্ব অব্দের

মধ্যবর্তী যুগে হতে পারে। ইমাম বুখারী (র) ও সম্ভবত এ গবেষণা পেশ করেছেন। কাজেই তিনি 'কিতাবুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে নবীদের যে ধারাবাহিক তালিকা উপস্থাপন করেছেন, তাতে তিনি হযরত আইউব (আ.) কে হযরত ইউসুফ (আ.) এর পরবর্তী এবং হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

ভুল বুঝাবুঝির অবসান

আইউবের বংশ তালিকায় তাওরাতে উল্লেখিত নাম এবং আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণিত নামের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, সে পার্থক্যটা মৌলিক নয়, বরং নামের ব্যাপারে এ ধরনের সামান্য পার্থক্য সাধারণত ভাষার উচ্চারণ গত পার্থক্যের জন্য লেখনীতে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ তাওরাতে বর্ণিত আউয আর আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণিত মোস্। ঠিক তেমনি তাওরাতে উল্লেখিত যারিহ্, ঐতিহাসিকদের বর্ণিত যিরাহ্ মূলত একই শব্দ। তবে যেসব ঐতিহাসিক মোস অথবা আমোসকে আইউব এবং যারিহ্ এর মাঝে বর্ণনা করেছেন। সেটা সঠিক নয়। হাফিয ইবন হাজার (র) ও স্পষ্টভাবে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, কেউ কেউ হযরত আইউব (আ)-এর বংশ তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে রদম ইব্ন ঈস্ বলে তাকে রদম গোত্রীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে ইয়াহূদী ও খৃস্টান আলিমদের মতামত

হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য উদ্ঘাটনের পর এ বাস্তবতা স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন যে, হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে ইয়াহূদী খৃস্টান আলিমদের মাঝেও বিরাট মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে কতকের ধারণা যে, এ নামটি কাল্পনিক আইউব কোন ব্যক্তির নাম নয়। যেমন- রাব্বী হামানী দেয়, মীকাইলিস, সিমলার ও ইস্তিয়ান প্রমুখ আলিমগণ উক্ত ধারণার প্রবক্তা। তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যেসব ঘটনা ও বিবরণ বর্ণিত হয়েছে, সবই মিথ্যা ও কাল্পনিক। তাঁদের মতে 'সিফরে আইউব' গ্রন্থটি যদিও ইতিহাসের দৃষ্টিতে অতি প্রাচীন; কিন্তু সেটাও কাল্পনিক। তবে ক্যান্ট ও আন্টাল নামক ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত আইউব (আ.) একজন প্রকৃত ও বাস্তব ব্যক্তির নাম। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সহীফাকে কাল্পনিক ও মিথ্যা বলা জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট। (নাজ্জার রচিত কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪১৫) তবে তাঁকে প্রকৃত ব্যক্তি হিসেবে মেনে নেয়া সত্ত্বেও তাঁর সময়কাল নির্ধারণের ব্যাপারে ইয়াহূদী-নাসার আলিম-ঐতিহাসিকদের

মাঝেও মতভেদ বিদ্যমান। আরব ঐতিহাসিকদের মাঝে ও মতভেদ আছে। তাদের মতভেদগুলো নিম্নের ছক অনুযায়ী প্রদর্শিত হল ঃ

ক্রমিক নং	নাম	অভিমত
১.	বুস্তানী	হযরত আইউবের সময়কাল ছিল ইব্রাহীমের ১০০ বছর পূর্ববর্তী যুগে
২.	ইব্ন আসাকির	হযরত ইব্রাহীমের পরবর্তী নিকটতম যুগ
৩.	ক্যান্ট	হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সমসাময়িক
৪.	আন্টাল	হযরত মূসার সমসাময়িক ঐতিহাসিকের
৫.	তাবারী	হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর পরবর্তী যুগ
৬.	ইব্ন খাইসামা	হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সমসাময়িক
৭.	ইব্ন ইসহাক	হযরত সুলায়মানের পরবর্তী যুগ
৮.		তিনি ইসরাঈলী ছিলেন কিন্তু যুগ জানা যায়নি
৯.		বখতে নসরের সমসাময়িক
১০.		বনী ইসরাঈলী কাযীদের সমসাময়িক
১১.		ইরানী শাহ আরদেশিরের সমসাময়িক

মোটকথা হযরত আইউব (আ.)-এর ব্যক্তিত্বকে যদি ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করা হয় তবে নিশ্চিতরূপে যে ফলাফল উদ্ঘাটিত হবে তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. হযরত আইউব (আ.) আরবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আরবী ছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত।

২. গোটা তাওরাতের মাঝে 'আইউব পুস্তিকা' প্রাচীনমত সহীফা এবং আরবী ভাষা থেকে হিব্রু ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৩. হযরত আইউব (আ.) আদূম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৪. তাঁর সময়কাল হযরত ইয়াকুব ও হযরত মূসার মধ্যবর্তী যুগে ছিল।

কুরআন শরীফে আইউব (আ.)-এর বর্ণনা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে যে তথ্যগুলো পাওয়া গেল সেগুলো সংক্ষিপ্তাকারে দৃষ্টির সামনে রাখা উচিত। সূরা আম্বিয়া ও সূরা সা'দে বর্ণিত আছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ -

"আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম তার দুঃখকষ্ট দূরীভূত করে ছিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৩-৮৪)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ اِذْنَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ- هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ - وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ - وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهٖ وَلَا تَحْنَثْ - اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا- نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ -

"স্মরণ কর. আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। (আমি তাকে বললাম) তুমি তোমরা পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরো আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। আমি তাকে আদেশ করলাম, তুমি এক মুঠো ঘাস লও এবং তা দ্বারা আঘাত কর, শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম। কত উত্তম বান্দা সে। সে ছিল আমার অভিমুখী।" (সূরা সা'দ ঃ ৪১-৪৩)

এসব আয়াতে হযরত আইউব (আ.)-এর ঘটনাকে যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু অলংকার শাস্ত্র ও অর্থগত দিক থেকে ঘটনার যতটুকু সত্যতা ও গুরুত্ববহ হওয়ার কথা ছিল তা এমন অতুলনীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে, যা 'সিফরে আইউব' নামক দীর্ঘ কলেবরের বিরাট পুস্তকেও পরিদৃশ্য হয় না। যিনি ছিলেন একজন পূত-পবিত্র ব্যক্তিসত্তা এবং আল্লাহ্‌র কাছে নবী-রাসূলদের দলভুক্ত, তাঁর নাম আইউব (আ.)। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ "তোমরা আমার বান্দা আইউবকে স্মরণ কর," তিনি সহায় সম্পদ, ধন ঐশ্বর্য, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দিক থেকেও একজন

সৌভাগ্যশালী সুখী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ করে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন যে, ধন-সম্পদ, পরিবার পরিজনও জানমালসহ বিপদে পতিত হলেন। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হল, পরিবার, পরিজন একে একে ধ্বংস হল এবং তাঁর শরীর আক্রমণ করল দূরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু তবুও তিনি না কোন অনুযোগ করলেন; বরং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে শুধু অবস্থা পেশ করলেন এই বলে ঃ

اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّ عَذَابٍ –

"যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহবান করে বললেন, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে"। শিষ্টাচার ও আদর রক্ষাকারীদের এটাই নিদর্শন যে, তিনি আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে বলেন নাই, "হে আল্লাহ্ আপনি আমাকে বিপদে ফেলেছেন, কেননা তিনি জানেন, বিপদ আপদ আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি; কিন্তু শয়তানী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কাজেই তিনি বললেন, শয়তান তো আমাকে বিপদাপদ ও যন্ত্রণার স্পর্শে কষ্ট দিচ্ছে। অতঃপর তিনি পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মার্জিত অথচ অলংকৃত বাক্যে পেশ করে বললেন ঃ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ। "হে আল্লাহ্! "বিপদ আমাকে ঘিরে ফেলেছে।" অতঃপর বললেন ঃ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ "আর আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" তাঁর এহেন আহবানে আল্লাহ্ সাড়া দিলেন। তাঁর ধন-সম্পদ যা কিছু বিনষ্ট হয়েছিল, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়েছিল, মহান আল্লাহ্ সেগুলোর কয়েকগুণ বেশী তাকে দান করলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার জন্য একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেন এবং বলেন ঃ

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ وَوَهَبْنَالَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ –

"তুমি পায়ের সাহায্যে ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের জন্য সুশীতল পানি ও পানীয়। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ, আমার অনুগ্রহ স্বরূপ তাদের মত আরো অনেক দিলাম। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম,. তার দুঃখ-কষ্ট, দূরীভূত করে দিলাম। তাকে তার পরিবার পরিজন এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো অনেক ফিরিয়ে দিলাম।" (সূরা সা'দ ও আম্বিয়া)

এসব কিছুই হয়েছে এজন্যে যে, রহমত বা করুণা হল তাঁর পবিত্র সত্তার একটি গুণ। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ –

"আমার করুণা প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপৃত, মুত্তাকীদের জন্য আমি তা অবধারিত করব। যাতে জ্ঞানী ও অনুগত লোকেরা তা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।" এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ، رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। আমার পক্ষ থেকে রহমত ও জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।"

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে আমি আইউবকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত নেকবান্দা হিসেবে পেয়েছি এবং সর্বাবস্থায় তিনি আমার অভিমুখী। তাঁর বাণী ঃ – إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ "আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, কত উত্তম বান্দা সে। সে নিশ্চয় আমার অভিমুখী।" (সূরা সা'দ ঃ ৪৩)

এ চার-পাঁচটি আয়াতে হযরত আইউবের যে বিবরণ তুলে ধরা হল তাতে কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। কেননা এ বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে 'সিফরে আইউবে' দীর্ঘ ৪২টি অধ্যায় ও কয়েক'শ শ্লোক ব্যবহার করতে হয়েছে।

তাফসীর ভিত্তিক কয়েকটি পর্যালোচনা

এ পর্যায়ে তাফসীর ভিত্তিক কয়েকটি পর্যালোচনা পেশ করা প্রয়োজন যা হযরত আইউব (আ.)-এর ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্ক রাখে।

১ ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোতে হযরত আইউব (আ.)-এর ব্যাধি সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আর এমন কতগুলো রোগব্যাধির কথা তার প্রতি আরোপ করা হয়েছে, যে কারণে তাঁকে ঘৃণা করার কারণ হতে পারে এবং মানুষ এসব রোগী থেকে দূরে থাকতে চায়। যেমন কুষ্টরোগ অথবা ফোঁড়া ক্ষত ইত্যাদি। এমন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, শরীর পঁচে গলে গিয়েছে এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে এক ঘৃণ্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এসব বর্ণনা পরিবেশন করার পর কতক মুফাস্সির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, কোন নবীর শরীরে এমন রোগব্যাধি আক্রমণ করতে পারে না, যা মানুষের দৃষ্টিতে ঘৃণাও অবহেলার কারণ হতে পারে এবং উক্ত ব্যাধির কারণে মানুষ রোগী থেকে পালিয়ে দূরে সরে যায়। কেননা এ অবস্থা নবুওয়াতের আসল উদ্দেশ্য তাবলীগ ও পথপ্রদর্শনের মর্যাদার পরিপন্থী এবং হিদায়েতের এক বিরাট অন্তরায়। আর তারা উক্ত বর্ণনার দু'টি জবাব প্রদান করেছেন।

এক. সম্ভবত হযরত আইউবের ব্যাধিসমূহ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই হয়েছিল এবং বিপদাপদ ও পরীক্ষার মাধ্যমে, তাকে যাচাই করা হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। অতঃপর যখন তিনি পূর্ব সুস্থ হয়ে উঠেন তখন নবুওয়াতের পদমর্যাদায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হয়।

দুই. ইসরাঈলী বর্ণণাগুলোর অধিকাংশই অনির্ভরযোগ্য ও অতিরঞ্জনে ভরা। এছাড়া কুরআন শরীফ ও হাদীসে রাসূলে করীম (সা.) এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সম্পর্কে না কোন প্রশ্ন উঠতে পারে আর না এর উত্তর দানের প্রয়োজনীয়তা থাকে। এটাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং তাই সঠিক ও যথার্থ। কুরআন শরীফে যেহেতু ব্যাধির কোন বিস্তারিত আলোচনা নেইএবং সমস্ত হাদীস ভাণ্ডারে এর বিবরণ নেই। সেহেতু নিছক ইসরাঈলী বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত করা অযৌক্তিক ও অনর্থক।

২. مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ আয়াতাংশের মর্ম কি? ইসরাঈলী বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ হযরত আইউব (আ.)-কে যাচাই করার জন্য তাঁর ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এমনকি তাঁর শরীরের উপরে ও শয়তানের অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, হযরত আইউব (আ.) আদব ও শিষ্টাচারের প্রতি যত্নশীল ছিলেন বিধায় কথাটাকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে আল্লাহ্র কাছ থেকে আসে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ। আর যে বিষয়কে আমরা অকল্যাণ বা মন্দ বলে থাকি তা আমাদের পক্ষে হয়তো মন্দ হতে পারে। কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি জগতের সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে সেটাকেও শুভ হিসেবে মানতে হবে। আমাদের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন পর্যায় কতগুলোকে মন্দ বানিয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সেটাও ছিল মূলত কল্যাণ ও শুভ কাজ। সুতরাং এই বাস্তবতা প্রকাশের জন্য আল্লাহ্ ভীরুদের পদ্ধতি হল, যখন তাঁরা কল্যাণ লাভ করেন তখন ব্যাপারটিকে আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে থাকেন, আর যখন কোন অকল্যাণ বা বিপদ তাঁদের আক্রমণ করে তখন তা নিজের প্রতিই আরোপ করেন। সুতরাং কুরআনে একটি স্থানে ব্যাপারটিকে এ পদ্ধতিতেই পরিবেশন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَ مَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

"তুমি যখন কোন কল্যাণ লাভ কর তখন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আর যখন তুমি কোন মন্দ বা অকল্যাণ লাভ কর তখন তা তোমার নিজের কাছ থেকে।"

এসব মনীষী অপর একটি ব্যাখ্যায় বলেন, সূরা আম্বিয়াতে হযরত আইউব (আ.) এর যে বক্তব্য এভাবে তুলে ধরা হয়েছে رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ "হে

আমার প্রতিপালক! আমাকে দুঃখ-কষ্ট পেয়ে বসেছে"। তাতে মূলত আইউবের রোগ ব্যাধির কথাই বলা হয়েছে। সূরা সা'দ এর উক্ত আয়াতে أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ -- "শয়তানের কষ্ট ও যন্ত্রণা বলতে কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা বুঝানো হয়েছে।" কেননা শয়তান সব সময় তাঁর উপর ভীড় করে থাকত এবং আপতিত বিপদের কারণে আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞতা ও হতবিহবল হয়ে ধৈর্যহারা হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালাত। হযরত আইউব (আ.)-এর ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও আল্লাহ্মুখী প্রেরণা তথা আধ্যাত্মিক চেতনায় ভর দিয়ে থাকা তাঁর আত্মিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত এবং তিনি দৈহিক অসুস্থতার তুলনায় আত্মিকভাবে বেশী পেরেশান থাকতেন।

৩. আয়াতাংশ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ "আমি তাঁকে তার পরিবার পরিজন দান করলাম এবং তাদের মতই তাদের সাথে প্রদান করলাম"। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ আইউবকে সুস্থতা দানের পর তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবার-পরিজনের স্থলে পূর্বের চাইতে অধিক সংখ্যক পরিজন দান করলেন এবং গোত্রের যেসব লোক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদের পুনরায় তাঁর পাশে একত্রিত করে দিলেন। অথবা এর অর্থ এই যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিজনদের দেহে তাজা প্রাণ দান করলেন এবং আরো বেশী সংখ্যক পরিজন দান করলেন। ইব্ন কাসীর হাসান ও কাতাদার সূত্রে এই দ্বিতীয় অর্থই পরিবেশন করেছেন। (ইব্ন কাসীর, সূরা সা'দ)

শাহ্ আবদুল কাদের (রা.)-এর অভিমতও ছিল এটা (মযিহুল কুরআন ঃ সূরা সা'দ) ইমাম রাযী ও ইব্ন হাইয়ান-এর অভিমত ছিল ১ম অর্থের অনুরূপ আয়াতে অবশ্য দু'টি অর্থেরই ব্যবহার বিধিবদ্ধ।

৪. সূরা সা'দে বর্ণিত হয়েছে, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ "আমি তাকে নির্দেশ দিলাম, এক মুঠো ঘাস লও এবং তা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভংগ করো না।" এর দ্বারা কোন্ ঘটনার দিক ইঙ্গিত করা হয়েছে? কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীসে এর কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে মুফাস্সিরগণ বলেন, হযরত আইউব (আ.)-এর সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর তাঁর একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কেউ তাঁর দুঃখের সাথী রলো না। তখন তার সৎকর্মশীলা স্ত্রী হযরত আইউবের সেবা শুশ্রুষায় সর্বদা লিপ্ত থাকতেন এবং দুঃখ কষ্টের অংশীদার থাকতেন। একদা তিনি আইউবের চরম কষ্টের সময় অস্থির অপ্রকৃতিস্থ হয়ে এমন কথা বলে ফেলেন যা আইউবের ধৈর্যগুণে আঘাত লাগে এবং আল্লাহ্র প্রতি অভিযোগের সূত্র ফুঠে উঠে। এ আচরণ হযরত আইউব

(আ.) সহ্য করতে পারেন নি। তিনি কসম করে বলেন, আমি তোমাকে একশ বেত্রাঘাত করব। অতঃপর যখন আইউবের পরীক্ষার দিনগুলো ফুরিয়ে যায় এবং তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন, তখন তাঁর সে পূরণ করার প্রশ্ন দেখা দেয়। একদিকে জীবন সঙ্গিনীর অপরিসীম বিশ্বস্ততা, সহমর্মিতা ও সর্বোত্তম সেবা যত্নের বিষয়, অপরদিকে কসম বাস্তবায়নের প্রশ্ন। হযরত আইউব (আ.) কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় নিমজ্জিত। তখন আল্লাহ্ নেক স্ত্রীর নেকী ও স্বামীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ককে জীবিত করে দিলেন এবং আইউবকে নির্দেশ দিলেন যে, একশ' তৃণকে এক মুঠোতে ভরে জীবন সঙ্গীনীকে আঘাত করো, তাহলে শপথ পূরণ হয়ে যাবে।

৫. সূরা সা'দে বর্ণিত হয়েছে اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ - "আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়"। (৪২) এ সম্পর্কে আল্লামা ইব্ন কাসীর (র.) তাঁর তাফসীরে বলেন, মহান আল্লাহ্ আইউবকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি স্থান ছেড়ে উঠে পড় এবং যমীনে আঘাত কর। হযরত আইউব (আ) তখন আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করলেন। এরপর আল্লাহ্ তার জন্য একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দেন, তিনি তাতে গোসল করেন। ফলে তাঁর শরীরের বাহ্যিক সমস্ত ব্যধি দূর হতে শুরু করে। অতঃপর তিনি আরও আঘাত করলেন। দ্বিতীয় আরো একটি ঝর্ণা প্রবাহ শুরু হল। তিনি তা থেকে পানি পান করলেন। ফলে তার শরীরের আভ্যন্তরীণ রোগের যেসব প্রভাব ছিল, তাও নিরাময় হয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। (তাফসীর ঃ সূরা সা'দ)

হাফিয ইব্ন হাজার ও ইব্ন জারীর ও কাতাদার সূত্রে এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। (ফাত্হুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৬)

ঝর্ণা একটি ছিল কি দু'টি সে আলোচনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়া মহান আল্লাহ্ যে পদ্ধতিতে হযরত আইউব (আ.)-এর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন সে দিকে লক্ষ্য করা দরকার। কেননা সেই প্রাকৃতিক পদ্ধতিটি আজ অবধি খণিজ ঝর্ণা হিসেব সৃষ্টি জগতের উপকারার্থে সৃজন করে রেখেছেন, যাতে গোসল করলে অথবা পানি পান করলে অনেক রোগব্যাধি দূর হয়ে যায়, মানুষ পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে এ ঝর্ণাটি ছিল হযরত আইউব (আ.)-এর একটি মু'জিযা আর সাধারণের জন্য কোন কারণের অধীন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, হযরত আইউব (আ.) যখন গোসল করতেছিলেন তখন আল্লাহ্ কয়েকটি স্বর্ণের ফড়িং তাঁর উপর বর্ষণ করেন। হযরত আইউব (আ) তা দেখে মুঠি ভরে ভরে কাপড়ে রাখতে থাকেন।

আল্লাহ্ হযরত আইউব (আ.) কে ডেকে বলেন, হে আইউব। আমি কি তোমাকে সবধরনের ধন-সম্পদ দিয়ে ধনী বানাই নাই, আবার এ কি করছ ? হযরত আইউব (আ.) বললেন, হে পরোয়ারদেগার! সত্যিই আমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু আপনার অনুগ্রহ থেকে কেউ কি কখনো ভ্রুক্ষেপহীন হতে পারে? আপনার বরকতময় নিয়ামত থেকে কেউ অমুখাপেক্ষী নয়। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

এ রিওয়ায়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাফিয ইব্ন হাজার (র.) লিখেন ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী হযরত আইউব (আ.)-এর এ ঘটনা সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণিত হয় নাই, যে কারণে উপরোল্লিখিত বর্ণনা পেশ করেই তিনি ক্ষান্ত হয়ে যান। কেননা তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর হাফিয ইবন হাজার (র.) নিজের পক্ষ থেকেই বলেন যে, এ পর্যায়ে হযরত আনাস (রা.) এর একটি রিওয়ায়েত সঠিক লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছে। ইব্ন আবু হাতিম ও ইব্ন জুরায়জ (র.) উক্ত বর্ণনাটি পেশ করেন, আর ইব্ন হিব্বান ও হাকিম তা সংশোধন করেন। বর্ণনাটি এরূপ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত আইউব (আ.) তের বছর পর্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় নিমজ্জিত ছিলেন। তাঁর বিপদের দিনগুলোতে সবাই দূরে সরে যায়, এমনকি তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন দূরের ও কাছের পরিচিত সবাই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে প্রিয়জনদের মধ্যে তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সকাল সন্ধ্যা তাঁর কাছে আসত। একদা তাদের একজন অন্যজনকে বলল, মনে হয় আইউব (আ) গুরুতর কোন পাপ করেছেন যে কারণে তারই প্রতিশোধ স্বরূপ এ কঠিন বিপদে পতিত হয়েছেন। যদি একথা ঠিক না-ই হতো, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর উপর দয়া করতেন এবং তিনি আরোগ্য লাভ করতেন। দ্বিতীয় লোকটি হযরত আইউবের কাছে গিয়ে একথা শুনালো। আইউব (আ) তা শুনে খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে সিজ্দাবনত হয়ে দু'আ করতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণ পরেই হযরত আইউব (আ.) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য স্থান ছাড়লেন তখন তাঁর স্ত্রী তার হাত ধরে নিয়ে গেলেন। হাজত শেষ হবার পর সেখান থেকে বলে আসতেই তাঁর উপর ওহী নাযিল হল, তুমি ভূমিতে পা দিয়ে আঘাত কর। যখন তিনি আঘাত করলেন তখন পানির ঝর্ণ উতলে উঠল। তিনি তাতে শরীর ধৌত করার পর তাঁকে পূর্বের চাইতে স্বাস্থ্যবান মনে হতে লাগল। তাঁর স্ত্রী যেখানে অপেক্ষা করছিলেন, হযরত আইউব (আ.) সম্পূর্ণ সতেজ ও সজীবতাপূর্ণ অবস্থায় তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। সত্যিই তাঁকে চিনতে না পেরে স্ত্রী হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আইউব কোথায়? তিনি বললেন,

আমিই তো আইউব। অতঃপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার ঘটনা শুনালেন। দৈনিক খাবারের জন্য হযরত আইউব (আ.)-এর কাছে ছিল এক পুটুলী গম আর এক পুটুলী যব। আল্লাহ্ তাঁর সম্পদে যখন বৃদ্ধি ঘটাতে লাগলেন, তখন গমকে স্বর্ণে আর যবকে রূপায় পরিবর্তন করে দিলেন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ, ৩২৬)

প্রায় এ ঘটনার আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী·ঐ পৃ. ৩২৭) ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, বিপদের সময়কাল ছিল তিন বছর আর হাসান (র) বলেন সাত বছর। (তাফসীর ইব্ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮)

সিফরে আইউব

সিফরে আইউবও এ ধরনের বর্ণনার উৎস হল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। কেননা উক্ত সহীফাতেই হযরত আইউব (আ.) সম্পর্কে এমন দু'টি কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে, যা কুরআন শরীফে নেই। এক, হযরত আইউবের কয়েকজন বন্ধু তাঁকে বলেছিল, তুমি বোধ হয় কোন মারাত্মক পাপ করেছ, আর তার কারণেই এ বিপদে পতিত হয়েছে।

দুই, হযরত আইউব (আ.) তা সমর্থন করেননি বরং তাদের সাথে এ ব্যাপারে তর্ক করেছেন। তাঁর তর্কযুদ্ধ খুবই দীর্ঘ, যা সহীফার অধিকাংশ অধ্যায় জুড়ে স্থান পেয়েছে। অবশেষে বন্ধুরা যখন কোনক্রমেই তাঁর কথা বিশ্বাস করল না। তখন তিনি অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন, আমার সত্যতা প্রমাণ কর এবং আমাকে আরোগ্য দান কর। এ প্রসঙ্গে সিফরে আইউবে বর্ণিত আছে যে, তখন তেইমনিল ইয়াকার বললেন, আমি যদি তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি কি অসন্তুষ্ট হবে? স্মরণ কর, দেখ, কখনও কি কোন নিষ্পাপ ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে এবং সত্যবাদী মার খেয়েছে? (শিফরে আইউব, অধ্যায় ৪, শ্লোক-৭) তখন দোফর নু'মানী উত্তর দিতে গিয়ে বলল, বেশী কথা জবাব কি দেয়া হয়না এবং বেশী কথার কারণে কোন লোক নিষ্পাপ প্রমাণিত হয়েছে? জেনে রাখ, আল্লাহ্ তোমার পাপের প্রতিশোধ খুব কমই গ্রহণ করেছেন। তুমি কি অনুসন্ধান করে আল্লাহ্ রহস্য উদঘাটন করতে পার? (অধ্যায় ১১, শ্লোক ১-৭)

হযরত আইউব (আ.) বন্ধুদের এহেন দোষারোপ মেনে নিতে পারেননি এবং তর্কের সময় তাদের বলেন যে, আমি নিস্পাপ আর এসব বিপদাপদ তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ হয়ে থাকে। এর কি রহস্য তা আমি উদ্ঘাটন করতে পারব না। সুতরাং আল্লাহ্ আইউবের এ বক্তব্য সত্য প্রমাণিত করেন এবং তাঁর বন্ধুদের অপরাধী স্বাব্যস্ত করেন।

"অতঃপর সদাপ্রভু যখন আইউবের সাথে কথোপথকন শেষ করেন তখন সদাপ্রভু আলাফর তেইমনিকে বলেন, তোমার ও তোমার বন্ধু উপর আমার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হল। কেননা তোমরা আমার সম্পর্কে সত্য কথা বলা নাই, যেমনটি বলেছে আমার বান্দা আইউব। (সিফরে আইউব, অধ্যায় ৪২, আয়াত-৭)

সিফরে আইউব গ্রন্থে হযরত আইউবের যেসব বন্ধুদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলেন তেইমনী আলীফর সূখী, বলদু, নুমানী ও দুফর। তাওরাত বিশেষজ্ঞগণের দাবী যে, 'সিফরে আইউব' গ্রন্থটি প্রাচীন আরবী ভাষার সঙ্গীতবিহীনং কবিত্বের অতুলনীয় সঞ্চয়ন এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম পদ্য ভাণ্ডার। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধুমাত্র 'রগবীদ' এর তুলনা করতে পারে। কেননা এর রচনাকাল সম্পর্কে যে ধর্মটি মেনে নেয়া হয়েছে তা 'রগবীদকে' ৫০০ খৃ. পূর্ব অব্দের অথবা এরও পূর্বের যুগে নিয়ে যেতে চায়।

তাঁর ইন্তিকাল

সিফরে আইউবে বর্ণিত আছে যে, বিপদ থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত আইউব (আ.) একশ' চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। অতঃপর তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করেন।

"এরপর আইউব একশ' চল্লিশ বছর জীবিত থেকে তাঁর ছেলে, পৌত্র প্রপৌত্র এমনি চার স্তর পর্যন্ত দেখার সুযোগ পান। তিনি বৃদ্ধকালে ইন্তিকাল করেন।" (সিফরে আইউব, অধ্যায় ৪২, শ্লোক ১৬-১৭)

শিক্ষণীয় বিষয়

হযরত আইউবের (আ.) জীবনে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, স্বাধীনচেতনা ও দৃঢ়তা, বিপদাপদে কৃতজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার সে চরম আদর্শ বিদ্যমান, তা জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিম্নে তার বিবরণ তুলে ধরা হল ঃ

১. আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে তাদের যতটুকু নৈকট্য অর্জিত হয় সে অনুপাতে। বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের তাপ তাকে ততটুকু পেয়ে থাকে। বিপদ আসার পর যখন তাঁরা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এর মোকাবেলা করেন তখন সে বিপদই তার নৈকট্যের মর্যাদা উন্নত থেকে উন্নতর পর্যায়ে পৌছে দেয়। এ বিষয়টিকে মহানবী (সা.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلانْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ ثُمَّ الاَمْثَلَ فَالاَمْثَلَ–

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানবকুলের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন নবীগণ, অতঃপর সৎকর্মশীলগণ, অতঃপর উত্তম ব্যক্তিগণ অতঃপর পরবর্তী উত্তম ব্যক্তিগণ।" (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড)

নবীজী (সা.) আরো বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صَلَاحَةٌ زِيْدَ فِيْ بَلَائِهِ -

"মানুষকে তার দ্বীনী মর্যাদা অনুসারে যাচাই করা হয়ে থাকে, যে যদি তার দ্বীনের ব্যাপারে খুবই দৃঢ় ও মজবুত থাকে, তাহলে বিপদের মাত্রা ও বাড়িয়ে দেয়া হয়।" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮)

২. সম্মান-প্রতিপত্তি ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য, স্বচ্ছলতা ও আনন্দঘন পরিবেশে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উপকার স্বীকার করা কোন কঠিন সমস্যার ব্যাপার নয়, আর যদি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা না থাকে তাহলে তো আরো সহজ। কিন্তু দুঃখ কষ্ট, বিপদাপদ যন্ত্রণা-ক্লেশ ও দারিদ্র্যের পরিবেশে তাক্‌দীরের উপর তৃপ্ত থাকা এবং অভিযোগ অনুযোগের কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ না করেই ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রমাণ দেয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। কেননা-যখন কোন নেকবান্দা এ ধরনের কষ্টের অবস্থায় দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্যের আঁচল হাত থেকে ছেড়ে না দেন এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পারাকাষ্ঠা অবিরাম প্রদর্শন করেন, তখন আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম রহমত বা দয়ার মাঝে চঞ্চলতা সৃষ্টি হয় এবং সে ব্যক্তির উপর দয়া অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করেন। কল্পনাতীতভাবে তার উপর সীমাহীন করুণা ও অনুকম্পা আসতে থাকে এবং ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় বিষয়ের সফলতা তিনি লাভ করেন। এ পর্যায়ে হযরত আইউবের জীবন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعٰبِدِيْنَ -

"যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, আমি তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম আর তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে আরো দিয়েছিলাম, আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদাতকারীরে জন্য উপদেশ স্বরূপ।" সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৩-৮৪)

মানব জাতির উচিত, কোন অবস্থাতেই যেন আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হয়। কেননা হতাশা হল কাফিরদের নীতি। আর এটাও অনুধাবন করা উচিত যে, দুঃখ-কষ্ট বিপদাপদ শুধু পাপের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই আপতিত হয় না; বরং কখনো কখনো তা পরীক্ষা ও যাচাইয়ের জন্যও হয়ে থাকে এবং ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য আল্লাহ্র রহমত আলিঙ্গন করতে আসে। হাদীসে কুদ্সীতে আছে, মহান আল্লাহ্ বান্দাদের লক্ষ্য করে বলছেন ঃ

اَنَا عِنْدَ الظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ

"আমি বান্দাদের ধারণার অতি নিকটবর্তী "।

বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার ধারণা বাস্তবায়িত করি।

৪. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় ও প্রিয় জিনিষ। এ জন্যেই একটি হাদীসে উল্লেখ আছে শয়তানের কুমন্ত্রণার মধ্যে সবচে জঘন্য কুমন্ত্রণা যা শয়তানের খুব প্রিয়, তা হল দাম্পত্য জীবন ফাটল ধরানোর জন্যে কুধারণা, বিদ্বেষ ও দুশমনীর বীজ বপন করা। আর এ জন্যেই সহীহ্ হাদীসে, সে স্ত্রীর জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে তার স্বামীর কাছে সৎকর্মশীলা ও বিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বস্ততা ও প্রেম ভালবাসার মর্যাদা ও মূল্য সে মুহূর্তে আরো বেশী বেড়ে যায় যখন স্বামী বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে এবং তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন তাকে একা ফেলে পালিয়ে যায়। সুতরাং হযরত আইউব (আ.)-এর সতী সাধ্বী প্রিয়তমা স্ত্রী তাঁর বিপদের দিনগুলোতে যেরূপ অতুলনীয় বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, সহমর্মিতা ও সেবা শুশ্রুষার প্রমাণ দিয়েছেন এর দৃষ্টান্ত বিরল। মহান আল্লাহ্ তাঁর সম্মানে আইউবের কসম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে ভিন্ন একটি নির্দেশ প্রদান করেন। এতে আল্লাহ্র কাছে সে নেক স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদার স্থান নির্ণয় করা যায়।

৫. আরাম আয়েশ ও শান্তির দিনে ও কৃতজ্ঞতা বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য-সহিষ্ণুতা এমন মহামূল্যবান রত্ন যে ব্যক্তি এ রত্নের অধিকারী, সে দ্বীন দুনিয়ার কোথাও বিফল হবে না। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রিযামন্দী সবসময় তার সাথী হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْتَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزِيْدَنَّكُمْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ -الَّذِيْنَ اِذَا
اَصَابَهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰه وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ-

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম

কুরআন শরীফে হযরত ইউনুস (আ.) এর বর্ণনা

কুরআন শরীফের নিম্নে বর্ণিত ছয়টি সূরায় হযরত ইউনুস (আ.)-এর আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ সূরা নিসা, আন'আম, ইউনুস, আস্ সাফ্ফাত, আম্বিয়া ও আল-কালম্। এর মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টি সূরায় শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দু'টি সূরায় যুন-নূন ও সাহেবুল হূত অর্থাৎ মৎসওয়ালা বলে তাঁর গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নে এর একটি ছক প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	আয়াত নং	আয়াত নং	সংখ্যা
১.	নিসা	১৬৩	১
২.	আন'আম	৮৭	১
৩.	ইউনুস	৯৮	১
৪.	আম্বিয়া	৮৭,৮৮	২
৫.	আস সাফ্ফাত	১৩৯-১৪৮	১০
৬.	আল কালাম	৪৮-৫০	৩

প্রকাশ থাকে যে, সূরা নিসা ও আন'আমে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-এর তালিকার মাঝে তাঁর নামটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্যান্য সূরায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। হযরত ইউনুস (আ.)-এর পবিত্র জীবনের যে পার্শ্বটি নবুওয়াতী মর্যাদার সাথে জড়িত, সে দিকটিই এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। এ জীবনাংশেই তিনি পথপ্রদর্শন করেছেন এবং দীনের দাওয়াতে সময় অতিবাহিত করেছেন।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর জীবনী ও ঘটনা প্রবাহ

কুরআনের আলোকে হযরত ইউনুস (আ.)-এর জীবনী ও তৎসম্বলিত ঘটনা যদিও সংক্ষিপ্ত। তবে প্রকাশ ভঙ্গীর দিক থেকে ঘটনা খুবই স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। কিন্তু কতক তাফসীর ভিত্তিক খুটিনাটি আলোচনা এর কিছু অংশকে করেছে কুরুক্ষেত্রের শামিল। যে কারণে প্রথমেই কুরআনের আলোকে ঘটনাটির বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। অতঃপর তাফসীর ভিত্তিক আলোচনায় অগ্রসর হলে ঘটনার মূল সূত্র বুঝতে সাহায্য পাওয়া যাবে। (রূহুল মা'আনী, সূরা ইউনুস)

হযরত ইউনুস (আ.) কে আল্লাহ্ আটাশ বছর বয়সে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং 'নীন্‌বী' অঞ্চলের লোকদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ইউনুস (আ.) বহুদিন পর্যন্ত তাঁদের মাঝে দ্বীন প্রচার করতে থাকেন এবং একত্ববাদের দাওয়াত দিতে থাকেন; কিন্তু তারা সত্যের বাণী প্রচারের প্রতি কর্ণপাত তো করে নাই, বরং একগুয়েমী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভঙ্গীতে শিরক ও কুফরীতে নিমজ্জিত হতে থাকে। এ ছাড়া বিগত অবাধ্য জাতিদের মতই আল্লাহ্‌র নবীর সত্য দীনের দাওয়াতকে বিদ্রুপ ও উপহাস করতে শুরু করে। তখন বিরামহীন অবাধ্যতা চরম বিরোধীতা ও দুশমনীর প্রভাবে হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন এবং তাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিলের জন্য বদদু'আ করেন। আর তিনি রাগান্বিত হয়ে তাদের মাঝ থেকে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্য রওয়ানা হন।

ফুরাত নদীর তীরে গিয়ে দেখতে পান একটি নৌকা যাত্রীবোঝাই করে পাড়ি দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হযরত ইউনুস (আ.) নৌকায় চড়ে বসলেন। ইতিমধ্যে নোঙ্গর তুলে নৌকা ছেড়ে দিল। কিছু দূর এগোতেই নৌকার যাত্রীরা ঝড়ো হাওয়া কবলিত হল। নৌকা তখন চরমভাবে আন্দোলিত হলে লাগল এবং যাত্রীরা ডুবে যাবে বলে প্রমাদ গুনতে লাগল এবং তাদের ধারণানুযায়ী বলতে লাগল যে, মনে হয় কোন গোলাম তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে এ নৌকায় উঠেছে। যতক্ষণ তাকে নৌকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া না হবে, আমাদের মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এ ধরনের কথোপকথন হযরত ইউনুস (আ.) শুনতে পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠেন যে, নীন্‌বীতে আল্লাহ্‌র ওহীর জন্য অপেক্ষা না করে আমি চলে এসেছি এটা আল্লাহ্ পসন্দ করেন নাই।

সুতরাং এখন আমাকে পরীক্ষা করার নির্দশন শুরু হয়েছে। এরূপ ভাবনায় পড়ে তিনি নৌকার যাত্রীদের বললেন, আমিই সেই গোলাম যে তাঁর প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। আমাকে নৌকা থেকে বাইরে নিক্ষেপ করো। কিন্তু

মাঝি-মাল্লা ও যাত্রীগণ তাঁর পবিত্র আচরণ, সৎস্বভাব ও মিষ্টি মধুর ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, তারা তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর পরামর্শ করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে লটারীর মাধ্যমে তা নির্ণয় করবে। সুতরাং তিনবার লটারী দেয়া হল এবং প্রতিবার হযরত ইউনুস নবীর নাম লটারীতে উঠল। পরিশেষে বাধ্য হয়ে তারা ইউনুস (আ.) কে সমুদ্রে নিক্ষেপ করল অথবা তিনি নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর অমনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মাছকে শুধু গিলে ফেলার অনুমতি দেয়া হয়, খাদ্য হিসাবে ইউনুসকে ভক্ষণ করার জন্য নয়। কাজেই তার শরীরের সামান্য পরিমাণ ক্ষতিও হয়নি (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫১)

হযরত ইউনুস (আ.) যখন নিজেকে মাছের পেটে জীবিত দেখতে পান, তখন আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার ওহীর অপেক্ষা না করে, তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে, উম্মাত ও দাওয়াতে দ্বীন থেকে অসুন্তুষ্ট হয়ে নীন্‌বী থেকে চলে এসেছি। হে আল্লাহ্! আমার এ অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ -

"(ইলাহী) তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি নিঃসন্দেহে নিজের উপর যুলুম করেছি।"

মহান আল্লাহ্ হযরত ইউনুস (আ.)-এর দরদ মিশানো কাকুতি শুনে তা কবূল করেন। মাছকে নির্দেশ দিলেন, হে মাছ! তোমার উদরে আমার আমানত ইউনুসকে এখনি উদ্‌গীরন কর। সাথে মাছ সমুদ্র সৈকতে হযরত ইউনুসকে উদ্‌গীরন করে দিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বলেন, মাছের পেটে থাকার দরুন তাঁর শরীর পাখীর সদ্যজাত বাচ্চার শরীরের মত নরম তুলতুলে হয়ে পড়েছিল। (তাফসীরে ইব্‌ন কাসীর।) আর তাঁর শরীরে একটি লোমও ছিলনা। মোটকথা, হযরত ইউনুস (আ.) কে খুবই হাল্‌কা, কৃশকায় ও দুর্বল অবস্থায় স্থলভাগে রেখে দেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর জন্য একটি লতাগুল্ম চারা উৎপন্ন করে দিলেন। এর ছায়ায় তিনি কুটির বানিয়ে থাকতে লাগলেন। কিছুদিন পর আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে লতা-গুল্মের শিকড়ে পোকা ধরল এবং শিকড় কেটে ফেলল। লতা শুকাতে শুরু করে, তা দেখে হযরত ইউনুস (আ.) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বললেন, হে ইউনুস। সাধারণ তুচ্ছ এ লতাটি শুকিয়ে যাচ্ছি দেখে তুমি চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছ, অথচ নীন্‌বীর

লক্ষাধিক অধিবাসী যেখানে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণী বাস করে সেগুলোকে ধ্বংস করতে আমার মনে বিরক্তির উদ্রেক হবেনা? তুমি এ লতাগুল্মকে যতটুকু ভালবাস; নীন্‌বীর এ প্রাণীগুলোকে আমি কি তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসি না। আর তুমি এ চিন্তা না করে ওহীর অপেক্ষা না করে বরং তাদের জন্য বদ্‌দু'আ করে তাদের মাঝ থেকে পালিয়ে এসেছ। এটা কি কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় হয়েছে? নিজের জাতির উপর আযাব নাযিল করার জন্য বদ্‌দু'আ করত তাদের ঘৃণা করে তাড়াহুড়ো করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এমন কি ওহীর জন্যও অপেক্ষা করলে না।

ওদিকে ইউনুস (আ.) বদ্‌দু'আ করে নীন্‌বী থেকে পালিয়ে যাবার পর সেখানকার অধিবাসীগণ বদ্‌দু'আর কিছুটা প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে শুরু করল। অধিকন্তু হযরত ইউনুস (আ.) এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াতে তাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হল যে, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সত্য নবী ছিলেন। সুতরাং এখন ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই তো হযরত ইউনুস (আ.) আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তারা এরূপ ভেবে রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল এবং হযরত ইউনুসকে খুঁজতে শুরু করল এ উদ্দেশ্যে যে, তাঁর হাতে ধরে ইসলামের আনুগত্যের বাইয়াত করবে। সাথে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা ইস্তিগফার করতে লাগল এবং সবধরনের পাপ কর্ম পরিত্যাগ করে বসতি এলাকা ছেড়ে খোলা মাঠে চলে এল। এমনকি চতুষ্পদ জন্তুগুলোকেও সাথে নিয়ে এল। দুধপানরত শিশুদের বিচ্ছিন্ন করা হল তাদের মায়েদের কাছ থেকে। এভাবে সর্বপ্রকার পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র দরবারে বিলাপ করতে করতে সমবেত কণ্ঠে স্বীকার করল যে, رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا جَاءَ بِهٖ يُوْنُسُ "হে আমাদের প্রতিপালক! ইউনুস যে বাণী তোমার কাছে নিয়ে এসেছে তা আমরা বিশ্বাস করলাম।" অবশেষে আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবূল করলেন, ঈমানী সম্পদে তাঁদের ভরপুর করে দিলেন এবং তাঁর আসন্ন আযাব থেকে তাদের রক্ষা করলেন। যা হোক হযরত ইউনুসকে পুনরায় নীন্‌বী যাবার নির্দেশ দেয়া হল (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২)।

অতঃপর তিনি তাঁর জাতির মাঝে থেকে তাদের পথ প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ্‌র এতগুলো সৃষ্টি তার কল্যাণ থেকে যেন বঞ্চিত না থাকে। সুতরাং হযরত ইউনুস (আ.) সে নির্দেশ পালন করে নীন্‌বীতে ফিরে এলেন। জাতির লোকেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হল এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে দ্বীন-দুনিয়ার সফলতা লাভে ধন্য হল।

এ ধারাবাহিক ঘটনাটি তাফসীরে কুরআনের আলোকে বিশুদ্ধ অনুবাদ, যা জটিল ব্যাখ্যা থেকে পবিত্র এবং বিভিন্ন সূরার সমস্ত আয়াতের সারনির্যাস এবং কোন বক্রতা ছাড়াই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। কিন্তু এ তত্ত্বগুলো তখনি প্রকৃতভাবে ফুটে উঠবে যখন তাঁর জীবনী সম্পর্কে মতভেদের পর্যালোচনাগুলো একে এক তুলে ধরা হবে এবং এ ধারাবাহিক বিবরণকে তুলানমূলক বিচার করা যাবে। তবে এর পূর্বে কুরআনের আয়াতগুলো থেকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ –

"তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন বিশ্বাস করল তখন আমি তাদের পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি থেকে মুক্তি দিলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" (সূরা ইউনুস ঃ ৯৮)

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ – فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ – وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ –

"আর স্মরণ কর যুন-নূন অর্থাৎ মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে আহবান করেছিল, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র মহান। আমি তো সীমালংঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদের উদ্ধার করে থাকি।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ – اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ – فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ – فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ – فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ – فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ – وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ – وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ – فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ –

"আর ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন। স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌছল। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাজিত হল। পরে এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তা হলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এর উদার থাকতে হত। অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে আর সে ছিল রুগ্ন। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম, আর আমি তাকে প্রেরণ করলাম লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি। অতঃপর তারা ঈমান এনেছিল, ফলে আমি তাদের কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৩৯-৪৮)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْنَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ
لَوْلَا اَنْ تَدَارَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ - فَاجْتَبٰهُ
رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মাছওয়ালার মত অধৈর্য হইও না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার কাছে না হলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।" (সূরা কালাম ঃ ৪৮-৫০)

বংশ পরিচয়

ইসলামী ঐতিহাসিকগণ ও আহলে কিতাব এ ব্যাপারে একমত যে হযরত ইউনুস (আ.)-এর পিতার নাম ছিল মাত্তা। তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে এর চাইতে বেশী জানা যায় না। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫)

তবে কতক লোক বলেন যে, মাত্তা হলো ইউনুস (আ.)-এর মায়ের নাম। কিন্তু এটা মারাত্মক ভুল। কেননা বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত যে, মাত্তা তার পিতা নাম (বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া)

আহলে কিতাবগণ বলেন, ইউনুসের নাম ছিল ইউনাহ, আর তাঁর পিতা নাম আম্‌তা। আমাদের ধারণা মতে ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা, আর ইউনাহ্ ইব্‌ন আমতার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই বরং এটা আরবী ও হিব্রু ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য।

সময়কাল নির্ধারণ

হাফিয ইবন হাজার (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সময়কাল নির্ধারণ করা ইতিহাসের আলোকে খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ইরানে যখন তাওয়ায়েফ রাজত্বের যুগ ছিল। সে যুগেই নিন্‌বী অঞ্চলে হযরত ইউনুস আবির্ভূত হন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫০) আধুনিক বিশেষজ্ঞগণ ইরানের (পারস্যের) রাজত্বকালকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১. আলেকজাণ্ডারের আক্রমনের পূর্ব পর্যন্ত, ২. পার্থুবী রাজত্ব বা তাওয়ায়েফুল মুলুকী। ৩. সাসানী যুগ।

প্রথম যুগকে উত্থান বা উন্নতির যুগ ধরা হয়। এ যুগের শুরু ৫৫৯ খৃ. পূর্ব অব্দ থেকে প্রায় ৩৭২ খৃ. পূর্বাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ দু'শতাব্দীকাল পর্যন্ত গিয়ে উত্থানের যুগ থেকে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় যুগ প্রায় ৩৭২ খৃ. পূর্বাব্দ থেকে শুরু হয়ে ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়। এ যুগকেই বলা হয় তাওয়ায়েফুল মুলুকীর রাজত্ব কাল। (আদিও অন্ত পুস্তক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩)

এর পর আসে তৃতীয় যুগ বা সাসানী বংশের রাজত্ব কাল। এর প্রথম রাজা ইরদেশীর ইব্‌ন বাবকান ছিল সাসানী গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

এ তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ইব্‌ন হাজারের উদ্ধৃতি মোতাবেক হযরত ইউনুস (আ)-এর সময়কাল ৩৭২ খৃ. পূর্বাব্দ থেকে হযরত ঈসার (আ.) জন্মের মধ্যবর্তী সময়ে হওয়া উচিত; কিন্তু ইতিহাসের সূক্ষ্মবিচারে এ বক্তব্যটি ভুল। কেননা ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যাবিলিয়ন রাজবংশের দ্বারা এ্যাশিরীয়দের এ বিখ্যাত নীন্‌বী শহরটি ৬১২ খৃ. পূর্বাব্দে ধ্বংস হয়েছিল। অধিকন্তু আহলে কিতাবদের বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত ইউনুস (আ)-এর যুগের পরবর্তী ৬৯০ খৃ. পূর্বাব্দে নীন্‌বীর অধিবাসীগণ যখন আবার কুফরী ও শিরক, অত্যাচার নিঃপীড়ন এবং সীমালংঘনের চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন নাহোম নামক জনৈক ইসরাঈলী নবী তাদের হিদায়েত করেন ও বুঝিয়ে সুজিয়ে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তারা কোন ভ্রুক্ষেপই যখন করল না তখন তিনি তাদের ভবিষ্যত বাণী শুনালেন যে, অচিরেই নীন্‌বী ধ্বংস হয়ে যাবে। এর সত্তর বছর পর ৬১২ খৃ. পূর্বাব্দে নীন্‌বী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং ইউনুস (আ) এর সময়কাল ৬৯০ খৃ. পূর্বাব্দের ও আগে হওয়া প্রয়োজন। সম্ভবত আবদুল কাদের (র.)-এর বক্তব্যটিই সঠিক। তিনি বলেন, হযরত ইউনুস (আ.) ছিলেন হায্‌কীলের অন্যতম বন্ধু, ইবাদত বন্দেগীতে নিবেদিত প্রাণ এবং দুনিয়াবী ব্যাপার থেকে বিরাগী থাকতে ভালবাসতেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ এল যে ইউনুসকে নীন্‌বী অঞ্চলের মুশরেকদের মূর্তি পূজা থেকে বিরত

রাখার জন্য সেখানে প্রেরণ কর। কিন্তু এক্ষেত্রে হায্কীলের নাম নিয়ে আরব ঐতিহাসিদের মাঝে সাধারণ ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। তারা ধরে নিয়েছেন যে, হায্কীল ছিলেন একজন বাদশাহ। অথচ বনী ইসরাঈলের মাঝে এ নামের কোন বাদশাহই ছিল না। সুতরাং এ নাম দ্বারা যথার্থই বিখ্যাত নবী হায্কীলকেই বুঝানো হয়েছে।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, হযরত ইউনুস (আ.) ছিলেন ইসরাঈলী বংশের নবী। ইমাম বুখারী (র.) 'কিতাবুল আম্বিয়া' অধ্যায়ে নবীদের আলোচনা প্রসঙ্গে যে ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছেন, তাতে হযরত ইউনুস (আ.) কে তিনি হযরত মূসা ও শু'আয়েব আর হযরত দাঊদ (আ)-এর মধ্যবর্তী স্থানে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর দাওয়াতের ক্ষেত্র ও অঞ্চল

ইরাকের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ অঞ্চল নীন্বীর আধিবাসীদের হিদায়েতের জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়। এ্যাশিরীয়দের রাষ্ট্রীয় রাজধানী ছিল নীনবী শহর আর মুসেল অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শহর। হযরত ইউনুস (আ.) যে সময়ে নীন্বীর অধিবাসীদের হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, তখন ছিল এ্যাশিরীয় রাজত্বের উত্থানের যুগ, কিন্তু তাদের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ছিল গোত্রীয় পদ্ধতি পরিচালিত। প্রতিটি গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক রাজা থাকত। নীন্বী শহরটি ছিল সমস্ত গোত্রীয় রাজত্বের কেন্দ্রীয় রাজধানী। যার ফলে উত্থান ও উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল এর মর্যাদা ও খ্যাতি কুরআন শরীফে এই শহরের জনগোষ্ঠির সংখ্যা এক লাখেরও বেশী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফে দুর্লভ সূত্রে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত। তাতে এর জনসংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোটা তাওরাতের মধ্যে ইউনুস নামে যে সহীফাটি প্রচলিত, তাতে ও এ সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও মাকহুল (র) প্রমুখ থেকে اَوْ يَزِيْدُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে দশ হাজার থেকে সত্তর হাজার পর্যন্ত ছিল বলে বর্ণিত আছে। আমাদের মতে প্রাগুক্ত সংখ্যাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

কয়েকটি তাফসীর ভিত্তিক পর্যালোচনা

সূরা আম্বিয়াতে وَذَاالنُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে মুফাস্সিরীন বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। কতক মুফাস্সির বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর জাতির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওহীর অপেক্ষা না করে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা না জেনেই পালিয়ে

যান। তিনি ধারণা করেন যে, তার এ তাড়াহুড়োর জন্য তাঁকে পরীক্ষা এবং সংকীর্ণতায় ফেল হবে না। এ তাফসীর অনুযায়ী مُغَاضِبًا শব্দটি জাতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত আর لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ এর অর্থ لَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ অর্থাৎ সংকীর্ণ অবস্থায় ফেলবে না। قدر শব্দটি ضيق সংকীর্ণ অর্থে বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত। এটাই জমহুর আলিমদের অভিমত। এছাড়া ইব্‌ন আব্বাস (র.) দাহ্‌হাক, কাতাদা ও হাসান (র.) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবন কাসীর ও ইব্‌ন জারীরের কাছে এ বক্তব্যটিই গৃহীত।

আর কতক মুফাস্‌সির مغاضبا শব্দের প্রথম তাফসীরের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে لن نقدر عليه অংশের قدر শব্দের অর্থ ক্ষমতা বা শক্তি বলেছেন। তাঁরা আয়াতের অর্থ করেছেন এরূপ, "ইউনুস মনে করেছে যে, আমি তাঁকে ধরতে সক্ষম হব না"। আতিয়া-আউফী এ বক্তব্য পেশ করেছেন। কিন্তু এ তাফসীর প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা কুফরী। সুতরাং একজন সাধারণ মুসলমান যখন এমন ধারণা পোষণ করতে পারেনা, একজন নবী কেমন করে তা করতে পারেন? উত্তরে মুফাস্‌সিরীগণ বলেন, রাসূলদের সাথে আল্লাহ্ যে ব্যবহার করেন তা সাধারণ মানুষের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বিষয়গুলো সাধারণ ও বিশেষ নেক্কারদের বেলায় অতি নগন্য ও ক্ষমাযোগ্য দৃষ্টিতে দেখা হয় তা নবীদের বেলায় কঠিন সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই নবীদের থেকে যদি সাধারণ একটা পদস্খলন ঘটে যায়, তখন আল্লাহ কঠিন শব্দ প্রয়োগে এতে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন, যাতে তাঁরা তা অনুভব করতে পারেন। আল্লাহ্‌র কাছে তাঁদের মর্যাদা এতই বেশী যে, তাঁদের দ্বারা অতি সাধারণ পদস্খলনও শোভা পায়না। তবে সাথে সাথে তাঁদের অবাঞ্ছিত ঘটনা সম্পর্কে এমন কথা বলে দেয়া হয়, যাতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র কাছে এ ব্যাপারটি যদিও গুরুতর সমালোচনা ও কঠিন হাতে ধরার মত কাজ, কিন্তু তবু তাঁর দরবারে গৃহীত হবার ব্যাপারে এবং নির্বাচিত ব্যক্তিত্বের মাঝে কোন পরিবর্তন আসে নাই। আর যেহেতু ভুলের ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ সতর্ক করে দেয়া হয় এবং তারা অপমানিত লজ্জিত হয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে মার্জনা পেয়ে যান। সে কারণে আল্লাহ্‌র নৈকট্য তাদের অবশিষ্টই থেকে যায়। এ পর্যায়ে হযরত আদম, নূহ্, দাঊদ, সুলায়মান (আ.) ও অন্যান্য নবীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত ঘটনা জ্বলন্ত সাক্ষী। এ ক্ষেত্রেও হযরত ইউনুস (আ) মূলত এমন ধারণা পোষণ করেন নাই এবং করতে পারেনও না। কিন্তু যেহেতু তিনি নবী এবং ওহীর মাধ্যমে তিনি নির্দেশ লাভ করেন, সেহেতু তাঁর চলে যাবার ব্যাপারটি তাঁর জন্য সমীচীন ছিলনা বিধায় আল্লাহ্ তাঁর এ বিষয়টিকে কঠিন ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন; কিন্তু এর সাথে বলে দিয়ে দিয়েছেন ঃ

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ-

"নিশ্চয় ইউনুস অন্যতম নবী, অতঃপর তাকে সৎকর্মশীলের অন্তর্ভুক্ত করেন।"

তাঁর সম্মান মর্যাদা ও উচ্ছাসনকে সংরক্ষিত রেখেছেন, যাতে কেউ ভুল বুঝাবুঝিতে না পড়ে এবং নবীদের সাথে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবহারকে বক্রদৃষ্টিতে দেখার সুযোগ না পায়।

কতক মুফাস্‌সির বলেন ঃ مُغَاضِبًا এর সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে, অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ) যখন দেখলেন যে, আযাবের সময়ে আযাব এল না তখন রাগান্বিত হয়ে চলে গেলেন এই ভেবে যে, আল্লাহ্ আমাকে আমার জাতির সামনে মিথ্যাবাদী বানিয়ে দিলেন। কিন্তু এ অর্থটি মোটেই সঠিক নয়। কেননা হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর জাতির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আযাবের ভাবষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে নীনবী থেকে চলে যান। একথাটা সর্বসম্মত ও সমর্থিত। অথচ এই স্পষ্ট অর্থ পরিত্যাগ করে সূত্রহীন কাহিনী বাড়িয়ে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। সে কাহিনীতে বলা হয়েছে, তিনি নীনবী অঞ্চল থেকে পালিয়ে গিয়ে এক জঙ্গলে অবস্থান করতে থাকেন, যাতে সেখানে বসে তাঁর জাতির ধ্বংসের অবস্থা জানতে পারেন। অতঃপর যখন শয়তান একটি বৃদ্ধপীরের আকৃতি ধারণ করে এসে তাঁকে বলল যে, আযাব সরে গেছে, তখন তিনি আল্লাহ্র উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে যাত্রা করেন। তারপর নৌকায় চড়ার ঘটনা সংঘটিত হয়। বস্তুত এটা বাস্তব থেকে বহু দূর ও অগ্রহণযোগ্য।

এ পর্যায়ে শাহ আবদুল কাদের (র.) 'মুযিহুল কুরআন' তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত তাফসীরসমূহ থেকে ভিন্ন ভঙ্গিতে একটি ব্যাখ্যা পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে مُغَاضِبًا শব্দটি আল্লাহ্ ও তাঁর জাতি উভয়ের সাথেই সম্বন্ধযুক্ত। আর ইউনুস (আ.) তিনবার রাগান্বিত হয়েছেন। ১. যখন তাঁকে নির্দেশ দেয়া হল যে, নীনবীর অধিবাসীর শির্‌ক কুফরী অত্যাচার নিঃপীড়নের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, তাদের হিদায়েত করতে সেখানে যাও। ২. যখন তিনি জাতির মাঝে সত্যের বাণী প্রচার করতে থাকেন; কিন্তু তারা তাঁরা কোন কথাই মানেনি, তখন তিনি আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে রাগান্বিত হয়ে চলে যান। ৩. যখন তিনি অবহিত হন যে, তাদের উপর আযাব আসে নাই এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কিন্তু শেষোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আমি বিস্মিত এই জন্যে যে, তাঁর জাতির উপর আযাব আসে নাই হযরত ইউনুস (আ.) এটা জানতে পারলেন, কিন্তু তার জাতি যে ঈমান আনয়ন করার কারণে আযাব আসে নাই এটা জানতে পারেননি: আর শয়তান এসে তাঁকে অবহিত করেছে, এ ব্যাপারটার জন্য শরী'আতের প্রমাণ

উপস্থাপন করা প্রয়োজন। অথচ এক্ষেত্রে মোটেই তা প্রমাণিত নয়। সুতরাং শেষোক্ত বক্তব্য কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না।

হযরত শাহ্ আবদুল কাদের أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা অগ্রগন্য, নাকি পরিত্যাজ্য, সঠিক কি বেঠিক এ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর মেধাশক্তির তীক্ষ্মতা প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, "তিনি মনে করেছেন, আমি তাঁকে ধরতে সক্ষম হব না অর্থাৎ মেহেরবাণীর ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারব না, সে এ ব্যাপারে রাগান্বিত হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপারে তো সবকিছুই সহজ। হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ্র সাথে অভিমানের নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি যেন আল্লাহ্র উপর এমন অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, এখন তিনি সন্তুষ্ট হবেন না, কিন্তু তিনি এ বাস্তব সত্যটা বিস্মৃত হয়ে যান যখন পরীক্ষার কলে আটকা পড়েন। অতঃপর আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় নেবেন, তখন সমস্ত রাগ ও অসন্তুষ্টি ভুলে যাবেন এবং তাওবা ও লজ্জা প্রকাশের মাধ্যমে যথাশীঘ্র সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। শাহ সাহেব আবারো বলেন, যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে আসে সেখানে সব কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায় এবং অসম্ভব সম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. সূরা সাফ্ফাত এ নীনবীর অধিবাসীদের ঈমান গ্রহণের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ "অতঃপর তারা ঈমান এনেছে আর আমি তাদের কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।" সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ

لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

"যখন তারা ঈমান আনল তখন আমি তাদের হীনতাজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।"

এ দু'টি আয়াতেই وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ আয়াতাংশ নিয়ে মুফাস্সিরগণ আলোচনার দরজা খোলা পেয়ে যান। তাঁদের যুক্তিতে যতটুকু কুলিয়েছে তার সবই বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কেউ বলেন যে, এ বাক্যের অর্থ হল, "আল্লাহ্ স্বাভাবিক বিধান প্রচলিত রয়েছে যখন কোন জাতির উপর আযাব আসে তখন তা সরে যায় না এবং তখনকার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা এ ধরনের ঈমান 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের পর্যায়ে পড়ে না, বরং স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করা বুঝা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ফির'আউনের ঈমানের কথা ধরা যায়। যখন সে ডুবে মরতে যাচ্ছে তখন আযাবের ফিরিশ্তাদের দেখে বলেছিল, آمَنَّا।

بِرَبِّ مُوسٰى وَهٰرُوْنَ "আমি মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম" কিন্তু ইউনুসের জাতিকে এ স্বাভাবিক নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। তারা শাস্তি অবশ্যম্ভাবী বুঝতে পেরে সবাই আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করল, তখন তাদের উপর থেকে শাস্তি সরিয়ে দেয়া হল। সুতরাং এ বাক্যের পূর্বে যে তথ্যটি তুলে ধরা হয়েছে উক্ত আয়াতে তা হল ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ–

"তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত"। উক্ত তাফসীর জমহুর আলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে এমন কোন বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ইউনুসের সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসে পড়েছিল, আর তারা আযাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তারা আযাবের তাণ্ডবতা প্রত্যক্ষ করে ঈমান আনতে উদ্যত হয়। অতঃপর আল্লাহর স্বাভাবিক বিধানের বিপরীত শুধু ইউনুসের জাতিকে আযাব থেকে মুক্ত করা হয় অর্থাৎ তাদের চাক্ষুস ঈমানকে কবূল করে তাদের উপর আপতিত আযাব দূর করে দেয়া হয়। বরং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইউনুসের সম্প্রদায় যেভাবে ঈমান এনেছে অন্যান্য জনপদবাসীরা কেন সে ভাবে ঈমান গ্রহণ করল না। তাহলে ইউনুস সম্প্রদায় যেভাবে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে ঠিক সেভাবে তারাও আযাব থেকে মুক্তি পেতে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। এ কারণে যে ইউনুস সম্প্রদায়ের মত অন্যান্য জনপদবাসীরা ঈমান এনে কেন নিজেদের আযাব থেকে বাঁচালো না। কিন্তু উপরোক্ত তাফসীর জমহুর আলিমগণের মতের বিপরীত। কেননা এর দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, ইউনুস সম্প্রদায় ব্যতীত যে কোন জাতিই আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ তাদের ঈমান প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু ইউনুস সাম্প্রদায় আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান এনেছে অথচ আল্লাহ্ মেহেরবাণী করে তাদের ঈমান কবুল করেছেন। এটা যেন একই আইনের ভিন্ন ধারা। এ পর্যায়ে কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, ইউনুস সম্প্রদায়ের এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল এবং অন্য সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ্র কি দুশমনী ছিল? যে কারণে একই ধরনের ঈমান ইউনুস-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কবুল করা হল অথচ অন্যদের পক্ষ থেকে হল না? উক্ত তাফসীরের প্রবক্তাগণ এর কি জবাব দেবেন? মুফাস্সির বলেন, যেহেতু ইউনুস-সম্প্রদায় আযাব প্রত্যক্ষ করে ঈমান গ্রহণ করেছিল, সেহেতু আল্লাহ্ শুধু দুনিয়াতেই তা কবুল করে

নিয়েছেন এবং তাদের উপর আপতিত আযাব দূর করে দিয়ে পার্থিব জীবনোপভোগ করার সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু পরকালের আযাব যথারীতি তাদের উপর বাস্তবায়িত হবে। এ বক্তব্যটি ভুল এবং কুরআন শরীফের পূর্বাপর আলোচনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সূরা সাফ্‌ফাত ও সূরা ইউনুসে উদ্ধৃত مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ বাক্যের এ অর্থটি কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে যে, তাদের ঈমান শুধু পার্থিব জীবনের জন্য উপকারী আর পরকালে তারা কাফির-মুশরিক হিসেবেই গণ্য হবে? সূরা ইউনুসে মহান আল্লাহ্‌ ইউনুস-সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং বিগত জাতিসমূহের ঈমান গ্রহণ না করার জন্য তিরস্কার প্রসঙ্গে উক্ত ঘটনাটি পরিবেশন করেছেন এবং একে একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দাবী এই যে, ইউনুস সম্প্রদায় যেভাবে ঈমান গ্রহণ করেছে, অন্যান্য জাতিগুলোরও সেভাবে ঈমান আনা উচিত ছিল। এছাড়া সূরা সাফ্‌ফাতে তাদের ঈমানকে কোন শর্তের সাথে শর্তারোপিত করা হয় নাই। অধিকন্তু কুরআন শরীফে যখন কোথাও اٰمَنُوْا বলা হয় তখন তার দ্বারা সে ঈমানকেই বুঝানো হয়, যা দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত। তবে কুরআনে اَسْلَمْنَا শব্দটিকে অভিধানিক অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন মদীনার বেদুঈনদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু اٰمَنُوْا ও اٰمَنَّا শব্দকে কখনোই অগ্রহণযোগ্য ঈমানের অর্থে ব্যবহার করে নাই। তবে এক্ষেত্রে مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ বাক্যের অর্থ আমরা ইব্‌ন কাসীর (র.) থেকে যা গ্রহণ করেছি তা হবে, অথবা এর দ্বারা বুঝানো হবে যে, অতীত জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যেসব জাতি তাদের নবী-রাসূলদের হিদায়েত কবূল করে নাই এবং তাঁদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে অত্যাচার -নিঃপীড়ন এবং সীমালংঘন করার মত ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, সে জাতি তাদের নবীর বদ্‌দু'আয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং তাদের জনপদে উত্তরসূরী জাতির জন্য শিক্ষণীয় সম্পদের ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। যে জন্যে কুরআন শরীফ যখন আ'দ, সামূদ, সালিহ্‌ ও লূত সম্প্রদায় প্রভৃতি জাতির আলোচনা করে, তখন উপদেশ গ্রহণকারী দৃষ্টিশক্তি তাদের মানস চক্ষে সেসব জনপদের পরিণতি দেখতে পায় এবং কুরআনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইউনুস সম্প্রদায়ের এ ব্যাপারটি সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতেছিল, আর তাহল নীন্‌বীর অধিবাসীরা যদি সত্যিকার অর্থে ঈমান গ্রহণ করেই থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র সে সব গৃহীত বান্দাদের বংশের কোন শাখা-প্রশাখা অদ্যাবধি দৃষ্টিগোচর হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইতিহাস বলছে সেজাতি ও তাদের সভ্যতা দুনিয়া থেকে ঠিক সেরূপ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেরূপ আল্লাহ্‌র আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি নীন্‌বীর মত বিখ্যাত ও সুবিশাল ঐতিহাসিক শহর-যা এ্যশেরীয় সভ্যতার

কেন্দ্রস্থল ছিল তা এমনভাবেই পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল যে, ৩০০ খৃ. পূর্বাব্দ পর্যন্ত এর সঠিক স্থানটি পর্যন্ত নিশ্চিত ও অজ্ঞাত ছিল। (তাফ্সীর তর্জমানুল কুরআন, ২য় খণ্ড)

অতএব কুরআন শরীফ এ সন্দেহের উত্তর প্রথমেই প্রদান করেছে যাতে সন্দেহ পোষণকারীর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ ইতিহাসের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পতিত হয়। তাহল একথা ঠিক যে, ইউনুস-সম্প্রদায় হযরত ইউনুসের জীবদ্দশায় মু'মিন, ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র জাতি হিসেবে প্রশংসার পাত্রে পরিণত হয়। কিন্তু তাদের পবিত্র জীবনের যুগটি দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে নাই। কিছুকাল পর তাদের মাঝে কুফরী, শিরক, অত্যাচার-নিঃপীড়নের সব ক্রুটিগুলোই জড় হয়, সেসব ক্রুটি দূর করার জন্য হযরত ইউনুস (আ.) ইতিপূর্বে সেখানে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতঃপর সে যুগের ইসরাঈলী নবী নাহোম (আ.) তাদের বুঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং হিদায়েতের পথপ্রদর্শন করেন ; কিন্তু তখনো তারা অন্যান্য অতীত জাতির ন্যায় সীমালংঘন, বিরোধিতা ও সত্যদ্রোহিতাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করে নেয়। তখন আল্লাহ্‌র ওহীর আলোকে নাহোম (আ.) তাদের ভবিষ্যদ্বাণী শোনান যে, নীন্‌বী অবিলম্বে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্তর বছরের মধ্যেই ব্যাবেলীয় জাতির আক্রমণে এ্যশেরীয় সম্প্রদায়ের সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল নীন্‌বী শহরটি এমনি বিধ্বস্ত হয়েছিল যে, এর নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না।

সুতরাং কুরআন শরীফ একদিকে ইউনুস-সম্প্রদায়ের ঈমান গ্রহণের প্রশংসা করেছে এবং তাদের অনুমোদন করেছে, অপর দিকে ইঙ্গিত করেছে যে, যারাই এ সৎপথ অবলম্বন করবে তাদেরকে ও জীবনের ও সম্পদের উপভোগের সুযোগ দেয়া হবে অর্থাৎ শাস্তি থেকে মুক্ত করা হবে। কিন্তু ইউনুস সম্প্রদায়ের এ অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। বরং তাদের জীবনে এমন একটি মুহূর্ত এল যখন তারা অত্যাচার, নিঃপীড়ন, কুফরী ও শিরককে জীবনের ব্রত বানিয়ে নিল এবং অতীত সীমালংঘনকারী জাতিদের মতই সৎপথ দেখানো সত্ত্বেও তা গ্রহণ করল না তখন আল্লাহ্ তাঁর আমোঘ বিধান অনুযায়ী এ ধরনের জাতিদের সাথে যা করা বা হবার কথা, তাই করলেন অর্থাৎ ধ্বংস করে দিলেন।

যাহোক জমহুর আলিমদের তাফসীর অনুযায়ী সঠিক বক্তব্য হলএই যে, ইউনুস সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল হয় নাই, বরং কতক প্রাথমিক নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তন্মধ্যে আযাব নাযিল হবার জন্য দু'আ করে ইউনুসের জনপদ ছেড়ে দেয়া ছিল প্রথম নিদর্শন। আর জাতি তা তাৎক্ষণিকভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয় এবং অন্যান্য নিদর্শন ও নমুনা দেখে তারা বিশ্বাস এনে ফেলে যে, ইউনুস নিশ্চয়ই সত্য নবী এবং তারা ঈমান গ্রহণ করে।

عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আয়াতাংশের অর্থ হল, যখন কোন জাতির সীমালংঘন ও বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের জন্য আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়, তখন পরকালীন আযাবের পূর্বেই দুনিয়াতে এমনি অপমান লাঞ্ছনার মুখ দেখতে হয়। তখন পরকালীন আযাবের পূর্বেই দুনিয়াতে এমনি অপমান লাঞ্ছনার মুখ দেখতে হয়। ইউনুস-সম্প্রদায় যখন মুসলমান হল, এ ঈমান গ্রহণ করল, তখন তারা সে পার্থিব অপমান লাঞ্ছনার থেকে বেঁচে গেল, অত্যাচার নিঃপীড়ন ও শিরকের কারণে যে অপমান লাঞ্ছনা ছিল তাদের জন্য অবধারিত, এর অর্থ এই নয় যে, তারা দুনিয়ার আযাব থেকে বেঁচে গেলেও পরকালীন আযাব তাদের ঠিকই ভোগ করতে হবে।

হাফিয ইব্ন হাজার ও ইব্ন কাসীর (র.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (রা) থেকে উক্ত বক্তব্যই উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, সাল্ফে সালিহীন এবং তাফসীর করেছেন।

সুতরাং فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, ইউনুস সম্প্রদায় ব্যতীত অতীত জাতিসমূহের কোন জনপদবাসীই পূর্ণাঙ্গভাবে ঈমান গ্রহণ করে নাই। তারা (ইউনুস সম্প্রদায়) নীনবী নামক শহরের অধিবাসী ছিল। তাদের নবী যখন তাদের আযাব আসার ভীতি প্রদর্শণ করে এবং এর কিছু কিছু নিদর্শন তারা প্রত্যক্ষ করে তখনই তারা ঈমান গ্রহণ করেছিল। তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল জনপদ ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর তারা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা এবং সাহায্যের আবেদন করতে শুরু করেছিল। (তাফসীর ইব্ন কাসীর, সূরা ইউনুস)

আর مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ বাক্যের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা পার্থিব জীবনে আযাব থেকে বেঁচে গেলো, তবে মৃত্যুর ব্যাপারটা সবার জন্যই থেকে গেল। (ঐ) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরবিদ্গণ দু'টি বক্তব্য পেশ করেছেন। কেউ বলেন, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের আযাব দূর হয়েছিল। অপর বক্তব্যে বলেন যে, শুধুমাত্র দুনিয়ার আযাব দূর হয়েছিল। কিন্তু আখিরাতের আযাব ঠিকই থাকবে। বস্তুত ঈমান তো শুধু দুনিয়ার আযাব থেকেই মুক্তি দেয় না বরং আখিরাতের আযাব থেকে ও নাজাত প্রদান করে। (সূরা সাফ্ফাত, ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫১)

এ ক্ষেত্রে হযরত শাহ আবদুল কাদের (র.) নিজস্ব ভঙ্গিতে পৃথক এক তাফসীর পেশ করেন। কিন্তু জমহুর আলিমদের সমর্থনই পাওয়া যায় তাঁর মূল বক্তব্যে। তিনি বলেন, দুনিয়াতে আযাব দেখে ঈমান গ্রহণ করে কেউ কোন দিন সফলকাম হতে পারেনি। কিন্তু ইউনুস সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ্ পক্ষ থেকে তাদের উপর আযাব আসার হুকুম পৌঁছে নাই। হযরত ইউনুস (আ.) এ তাড়াহুড়ায় আযাবের পূর্বাভাষ পরিলক্ষিত হয়, আর তারা ঈমান গ্রহণ করেও বেঁচে যায়। অনুরূপভাবে মক্কার জনগণ যখন ইসলামী সেনাদলকে দেখতে পায় যে, মক্কা বিজয় অভিযানকালে তাদের হত্যা ও ধ্বংস অনিবার্য, তখন তারা ঈমান গ্রহণ করে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। (সূরা ইউনুস, মুযিহুল কুরআন)

ভণ্ড নবীর হঠকারিতা

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা থেকে পাঞ্জাবের ভণ্ডনবী মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জালিয়াতিপূর্ণ স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা করেছিল। মিথ্যাবাদী কাদিয়ানী তার বিরোধীদের এ বলে চ্যালেঞ্জ করে যে, তারা যদি তার বিরোধিতা করতেই থাকে। তবে আল্লাহ্র ফায়সালা অনুযায়ী অমুক সময়ে তাদের উপর আযাব নাযিল হবে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে কোন উত্তর না দিয়ে বরং তাদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন আযাব যখন নাযিল হল না, তখন তার বিফলতা অপমান থেকে বাঁচার জন্য কাদিয়ানীরা বলতে শুরু করল যে, যেহেতু বিরোধীগণ মনে মনে ভয় পেয়ে গেছে, তাই তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন ইউনুস সম্প্রদায় থেকে আঘাত তুলে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআন শরীফের উজ্জ্বল প্রমাণ কাদিয়ানীর এ অপকৌশলকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা ইউনুস-সম্প্রদায় আযাব আসার আগেই প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ঈমান গ্রহণ করে এবং ইউনুসকে সত্য নবী হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁকে খুঁজতে শুরু করে দেয়। অতঃপর তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন তাঁর আনুগত্যকে ধর্মীয় ও ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে বরণ করে নেয়। কিন্তু কাদিয়ানী বিরোধীগণ শুধু তাঁর বিরোধিতা করেই বসে থাকেনি বরং এই মিশনের বিরুদ্ধে ও প্রাণপন চেষ্টা করতে শুরু করে। সুতরাং মিথ্যাবাদী ভণ্ড কাদিয়ানীর অমূলক দাবীর পক্ষে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা এবং একে ছত্রছায়া বানিয়ে মিথ্যা বক্তব্যকে গোপন করার অপচেষ্টা সত্যিই অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ও অনভিপ্রেত ব্যাপার। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, তবুও যদি ধরে নেয়া হয় যে, কাদিয়ানী বিরোধীগণ মনে

মনে ভয় পেয়ে গেয়েছিল। তাহলে যে ব্যক্তি অন্তরে কাউকে সত্য বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু কথায় ও কাজে তাঁর অস্বীকার করে তাকে কি মু'মিন বলা যেতে পারে? যদি তাই হতো তা হলে যে সব ইয়াহূদীদের সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে আল- কুরআনের এ আয়াতে يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ "সে সব ইয়াহূদীরা মুহাম্মদ (স.) কে সত্য নবী হিসেবে চেনে ঠিক যেরূপ চেনে তাদের নিজ সন্তানদের"। অর্থাৎ এ চেনার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তাদের মু'মিন বলা হয় না? হযরত ইউনুস (আ.)-এর সত্যবাদিতা আর মির্যা কাদিয়ানীর নির্জলা মিথ্যাবলার মাঝে এটা কি সুস্পষ্ট পার্থক্য নয় যে, ইউনুস (আ.) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসেন তখন তাদের বিশ্বাসী সত্যবাদী ও অনুগত দেখতে পান আর তারা তাঁকে ফিরে পেয়ে খুবই আনন্দিত হন তিনি তা অবলোকন করেন। অথচ এ জাতিকেই আল্লাহ্র দুশমন, রাসূলে চরম শত্রু সীমালংঘনকারী ও অবাধ্য হওয়ার কারণে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাদিয়ানী দেখতে পায় যে চ্যালেঞ্জ দেবার পর বিরোধী লোকেরা লেখা, বক্তৃতা ও কর্ম জীবনে পূর্বের চাইতে আরো বেশী বিরোধিতা শুরু করে। অধিকন্তু তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মনীষী এখনো জীবিত আছেন শত সহস্রগুণ সম্মান-মর্যাদা নিয়ে। আর মির্যা কাদিয়ানী নিজে এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কিছুকাল আগে দুনিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয় যা ছিল চরম আযাবের বাস্তব উদাহরণ। কি বিচিত্র এ সত্যের বিধান!

৪. সূরা সাফ্‌ফাতে আছে ঃ

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ–

উদ্ধৃত দু'টি আয়াতের এ ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মাছ সম্পর্কিত ঘটনার পূর্বে হযরত ইউনুস (আ) নবুওয়াত পেয়েছিলেন নাকি পরে? ইব্‌ন জারীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইউনুস (আ.) নবুওয়াত পেয়েছিলেন মাছের ঘটনার পরে। মুজাহিদ (র.) বলেন, এ ঘটনার আগেই তিনি নবুওয়াত পান এবং হিদায়েত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যেই তিনি নীন্‌বী পদার্পণ করেন। ইমাম বাগাবী (র.) বলেন, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের ঘটনার পূর্বে নীন্‌বীর অধিবাসীদের জন্য নবী হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এ ঘটনার পর অন্য এক জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। কুরআনে লক্ষাধিক লোক বলতে এই জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। এটা নীনবীর অধিবাসীদের আদমশুমারী নয়।

তবে ইমাম বাগাবীর এ অভিমত সূত্রহীন। কেননা কুরআনে এমন কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না যে, হযরত ইউনুস (আ.) দু'বার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আয়াতের ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এটা আরবী অলংকার শাস্ত্রের বিশুদ্ধ নিয়মানুযায়ী করা হয়েছে।

কেননা আলোচ্য আয়াতের প্রথমে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির আলোচনা এবং পরবর্তীতে সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পালিয়ে যাওয়া, নৌকায় আরোহন, ঘূর্ণাবর্তে পতিত হওয়ার দরুন লটারীতে যাচাই, ইউনুসের নাম লটারীতে উঠা, সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ার পর মাছের পেটে অবস্থান, অতঃপর সুস্থ স্বাভাবিকভাবে মাছের পেট থেকে জীবিত বের হয়ে আসা এবং আল্লাহ্‌র অপার করুণার ছায়াতলে স্থান পেয়ে সফলতা লাভের বিবরণ বিদ্যমান। অতঃপর বলা হয়েছে জাতির প্রতি তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁরা মাত্র কয়েকজন লোক ছিল না বরং তাঁরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর। পরিণতিতে তাঁরা সবাই ঈমানদার হয়ে যায় এবং অবধারিত আসন্ন আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে তাঁরা জীবন উপভোগের সুযোগ লাভ করে।

সুতরাং আয়াতের ধারাবাহিকতার কোন আগপিছ করা হয়নি। আর এ ধারাবাহিক বর্ণনাতে বাগাবীর বক্তব্যানুযায়ী এটাও বলা চলে না যে, مائَةَ اَلْفٍ اَوْيَزِيْدُوْنَ 'লক্ষাধিক জাতি বলতে অন্য এক জাতিকে বুঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনি এটাও পরিষ্কার যে, তিনি মাছের ঘটনার আগে না পরে নবী হয়েছেন এখানে দু'টি অভিমতের কোন স্থান নেই। এ দু'টি বক্তব্যের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ইব্‌ন কাসীর (র.) যা কিছু বলেছেন, তাই যথার্থ। তিনি বলেন, মাছের ঘটনার পূর্বেই হযরত ইউনুস (আ.) কে নবুওয়াত দিয়ে নীন্‌বী পাঠানো হয়। যখন তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসেন, তখন মাছের ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনা থেকে তিনি সাবধান হয়ে যখন আল্লাহ্‌র দরবারে লজ্জিত অপমানিত হয়ে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্ তা কবুল করেন এবং তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে তাঁরা ঈমান কবুল গ্রহণ করেছেন সুতরাং তাদের পথপ্রদর্শন করতে তিনি সেখানে যান।

ইউনার সহীফা

সহীফা ইউনা বা ইউনুসে এসব আলোচনা থেকে ভিন্ন কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তা হল আল্লাহ্ হযরত ইউনুস (আ.) কে নীন্‌বীর অধিবাসীদের হিদায়েত করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তাসীস্ অঞ্চলে পালিয়ে যান। সে ভ্রমণের

পথেই সংঘটিত হয় মাছের ঘটনা। তিনি তখন সতর্ক হন। অতঃপর তাঁকে আবার নীনবী যেতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং কর্তব্য পালনে তৎপর হতে বলা হয়। হযরত ইউনুস (আ.) সেখানে ফিরে গিয়ে হিদায়েত করতে থাকেব। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা তার কথা না মানাতে তাদের চল্লিশ দিন সময় ধার্য করে আযাবের ভয় দেখিয়ে তিনি এক অরণ্যে পালিয়ে যান। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা তৎক্ষণাৎ ঈমান আনয়ন করে। রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সবাই চটের কাপড় পরিধান করে এবং মানুষ ও পশুর দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে পৃথক করা হয়। অতঃপর সবাই মাঠে গিয়ে তাওবা ইস্তিগফার ও বিলাপ করতে থাকে এবং ইউনুসকে খুঁজতে শুরু করে। এদিকে হযরত ইউনুস (আ.) জানতে পারেন যে, চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথচ আযাব নাযিল হয়নি। তখন তিনি আল্লাহ্র উপর বিরক্ত হয়ে দূরে চলে যান এবং আল্লাহ্র দরবারে আবেদন করেন যে, আমি তো এরূপ ধারণা করেই তারসীস পালিয়ে যাই, নীনবীতে আসতে চাইনি। আমি জানতাম তুমি বড়ই দয়ালু এবং আযাব প্রদানে ধীরগতিসম্পন্ন। তুমি তো পরম করুণাময় ও দয়াশীল। আমি তো এখন মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। এখন আমাকে মৃত্যু দাও এখন আমার জীবিত থাকার চাইতে মরে যাওয়াই উত্তম। অতঃপর তিনি একটি কুড়েঘর বানিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। আল্লাহ্ তাঁর ছায়ার জন্য একটি অরণ্যের গুল্মলতা বা লাউ গাছ উৎপন্ন করে দেন। তা দেখে হযরত ইউনুস (আ.) অত্যন্ত খুশী হন। দ্বিপ্রহরের পর পোকা সে লতার শিকড় কেটে দেয় এবং তা শুকিয়ে যায়। হযরত ইউনুস (আ.) অত্যন্ত দুঃখিত হন। তখন আল্লাহ্ বলেন, হে ইউনুস! তুমি সাধারণ একটি অরণ্যের লতা শুকিয়ে যাওয়াতে এতই দুঃখিত হয়ে পড়ছে, অথচ এত বড় একটি জনপদ যার জনবসতি এক লাখ বিশ হাজার এর উপর, তাদের প্রতি কি আমার দয়া ও ভালাবাস থাকতে পারে না? তাওয়াতে এই সহীফাটি 'ইউনা নবীর কিতাব' নামে পরিচিত। ছোট ছোট চারটি অধ্যায়ে এ সহীফাটি লিপিবদ্ধ। এ ঘটনাটি উক্ত সহীফা থেকে সংকলন করা হয়েছে। সহীফাটি এসব বাক্য দিয়ে শুরু হয়েছে।

আর সদাপ্রভুর বাণী ইউনা ইব্‌ন আসতার কাছে পৌছল, সদাপ্রভু তাকে বললেন, তুমি বিখ্যাত শহর নীনুয়ার দিকে রওয়ানা হও। এর বিরোধতাকারীদের আহবান কর। কেননা তাদের দুষ্টামী ও ঔদ্ধত্য আমার পর্যন্ত এসে পৌছেছে।

উক্ত পুস্তিকার প্রবন্ধ নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের দ্বারা সমাপ্ত করা হয়েছে "আর সদাপ্রভু ইউনাকে বললেন, তুমি কি উক্ত অরণ্য লতাগুলোর কঠিন অবস্থার কারণে খুবই ব্যথিত? তিনি বললেন, আমি এতই ব্যথিত যে, আমি এখন মৃত্যু

চাই। তখন সদাপ্রভু বললেন, এই অরণ্যগুলোর জন্য তোমার এতই দুঃখ? এর জন্য তোমার কোন পরিশ্রম হয়নি, তুমি নিজে উৎপন্নও কর নাই। একটি রাতেই তা অংকুরিত হয়েছে এবং সেদিনেই শুকিয়ে গেছে। তাহলে আর কি উচিত নয় যে উক্ত শহরবাসীদের আমি দয়া করি, ভালবাসি? যে শরহটি এতই বড় যে, সেখানে একলক্ষ বিশ হাজারের চাইতে অধিক লোক বাস করে, যারা ডান বাঁ হাতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে জানে না এবং সেখানে পশুও বিচরণ করে ?"

কুরআন শরীফ আর ওই পুস্তিকায় বর্ণিত ঘটনার যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিদ্যমান কিন্তু বিস্তারিত বিবরণে যে সব স্থানে কিছুটা পার্থক্য আছে সেখানে কুরআনের বক্তব্য সঠিক। কেননা কুরআনের ঘোষণা সম্পূর্ণটাই ওহীর সঠিক জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ আর পুস্তিকা হল পরিবর্তিত সমষ্টির অংশমাত্র। এছাড়া হযরত ইউনুস (আ.) এর সহীফা কোন হিদায়েত পুস্তিকা নয় বরং অন্য কিছু থেকে সংকলিত প্রবন্ধ। তন্মধ্যে হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনাগুলোকে লেখার আবেদন তৈরীতে উপস্থাপিত।

৫. হযরত ইউনুস (আ.) নীনবীবাসীদের যে আযাবের ভয় দেখিয়েছিলেন সময়কাল নির্ধারণে নানা রকম মতামত রয়েছে। কেউ বলেন, তিন দিন কেউ বলেন, সাতদিন, আর কেউ বলেন চল্লিশ দিন। ইব্‌ন কাসীর (র.) বলেন, চল্লিশ দিনের বক্তব্যটি অধিক গ্রহণযোগ্য। শাহ আবদুল কাদের (র.) ও এ বক্তব্যে একমত। ইউনাহ পুস্তিকাকে ও চল্লিশ দিনের কথা বর্ণিত আছে।

৬. প্রথমেই বলা হয়েছে যে কুরআন শরীফের যেসব সূরায় হযরত ইউনুস (আ.)-এর আলোচনা বিদ্যমান তন্মধ্যে সূরা আম্বিয়া ও কালামে তাঁর গুণ বাচক নামের মাধ্যমে পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। সূরা আম্বিয়াতে তাঁকে ذوالنون، 'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে। কেননা প্রাচীন আরবীতে মাছকে নূন বলা হয়। সূরা কালমে তাঁকে صَاحِبُ الْحُوْتِ 'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে। মাছকে 'হূত' ও বলা হয়। যেহেতু তাঁর জীবনে মাছ সম্পর্কিত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, সেহেতু মাছওয়ালা তাঁর পরিচিতিমূলক উপাধি।

মৃত্যু

শাহ আবদুল কাদের (র.) বলেন যে শহরে হযরত ইউনুস, (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন, সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। অর্থাৎ নীনবীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। আর সেখানেই তাঁর কবর ছিল। আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার বলেন, ফিলিস্তীন অঞ্চলের বিখ্যাত শহর 'খলীল' এর অদূরে হুলহুল নামে পরিচিত একটি

জনপদ আছে। সেখানকার একটি কবরকে ইউনুসের কবর বলা হয়ে থাকে। এর পার্শ্ববর্তী আরেকটি কবর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা তাঁর পিতা মাত্তার কবর।

আমাদের ধারণা যে, শাহ সাহেবের বক্তব্যটি সঠিক। কেননা হযরত ইউনুস (আ) প্রসঙ্গে তথ্য পরম্পরায় যেসব ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে তাতে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হযরত ইউনুস (আ.) পুনরায় নীন্‌বী ফিরে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝেই জীবন অতিবাহিত করেন। সুতরাং এটাই প্রমাণ্য সত্য হিসেবে জানা যায় যে, তিনি নীনবীতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁর কবর ছিল। নীন্‌বী বিধ্বস্ত হবার পর তা অজ্ঞাত হয়ে যায়। পরবর্তী যুগে সুধারণার বশবর্তী হয়ে হুলহুলের দু'টি অখ্যাত কবরকে হযরত ইউনুস (আ.) ও তাঁর পিতা 'মাত্তার' করব বানিয়ে দেয়া হয়েছে, এখনো অনেক বিখ্যাত ওলী আওলিয়াদের নামে একই মনীষীর একাধিক স্থানে কবর বিদ্যমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অখ্যাত বুযর্গদের নামে বহু কবরকে সম্পর্কিত করে পার্থিব স্বার্থ হাসিল করা হয়ে থাকে।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর মর্যাদা

সহীহ্ হাদীসে নবী করীম (সা.) হযরত ইউনুস (আ.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَنِّىْ خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এরূপ কথা না বলে যে, আমি মুহাম্মদ (সা.) ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চাইতে শ্রেয়"। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ইয়াহূদী কিছু সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য এনেছিল। এক ব্যক্তি কিছু জিনিষ কিনে যে মূল্য দিতে চাইল সেটা ইয়াহূদীর মনঃপূত হল না। সে বলতে লাগল, সেই খোদার কসম! যিনি হযরত মূসাকে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আমি এ দামে আমার জিনিস বিক্রি করব না। জনৈক আনসারী তা শুনে রাগান্বিত হয়ে ইয়াহূদীকে চপেটাঘাত করে বসল এবং বলল, আমাদের মাঝে নবী (সা.) বিদ্যমান আছেন, অথচ তুমি এমন কথা বলতে পারছ? ইয়াহূদী তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে ফরিয়াদ জানালে। হে আবুল কাসেম! আমি তো আপনার চুক্তি ও দায়িত্বে আছি,এ আনসারী আমাকে কেন চপেটাঘাত করল ? নবী (সা.) আনসারীর কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

আনসারী যখন ঘটনা ব্যক্ত করল তখন নবী (সা.)-এর চেহারা মুবারক রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, নবীদেরকে একে অপররের উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের ময়দানে যখন প্রথম শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আসমানে আসীন যত প্রাণী থাকবে সব দিশেহারা হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ্ যাঁদের ব্যতিক্রম রাখবেন তাঁরা হুশ হারা হবেন না।

অতঃপর দ্বিতীয় ফুঁক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম যাঁরা চেতনা ফিরে পাবেন আমি হব তাঁদের প্রথম ব্যক্তি, কিন্তু আমি যখন অচেতনতা থেকে জাগ্রত হব তখন দেখতে পাব যে, হযরত মূসা (আ.) আরশের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন আমি বলতে পারছি না যে, তাঁর বেহুশীর ব্যাপারটি তূর পর্বতের ঘটনার সময় ঘটে যাওয়ার কারণে তখন রক্ষা পেয়েছেন না কি আমার পূর্বেই তিনি সচেতন হয়ে উঠবেন? আর আমি এটাও বলছি না যে, কোন নবীই ইউনুস ইব্ন মাত্তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর যে সব বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। তাতে সমস্ত আলিমগণ একমত। হাদীসের উদ্দেশ্যে হল যে, হযরত ইউনুস (আ.) ঘটনাগুলোকে যারা অধ্যয়ন করবে তাঁদের অন্তরে এ পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোন ক্রুটি বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। সুতরাং কোন কারণ অনুসন্ধানের সুযোগ বন্ধ করার অভিপ্রায়ে তাঁর সম্মান মর্যাদাকে এভাবে প্রস্ফুটিত করা প্রয়োজন মনে করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫১)

আম্বিয়া কিরাম (আ.)-এর মর্যাদা এ পর্যায়ে উক্ত ব্যাপারটার একটা আশু মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। কেননা অন্যান্য হাদীসে হযরত মূসা (আ.) মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। নবীগণকে নিয়ে অযথা বিতর্ক বন্ধ করার অভিপ্রায়ে তাঁর সম্মান মর্যাদাকে এভাবে প্রস্ফুটিত করা প্রয়োজন মনে করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড. পৃ. ৩৫১)

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর মর্যাদা

এ পর্যায়ে উক্ত ব্যাপারটার একটা আশু মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। কেননা অন্যান্য হাদীসে হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা সম্পর্কে যে বিবরণ এসেছে অথচ এখানে لَاتُفَضِّلُوْابَيْنَ الاَنْبِيَاءِ "নবীদের একজনকে অপরজনের উপর প্রাধান্য দিওনা" বলে মর্যাদার ব্যাপারটি সাধারণ করে দেওয়া হেয়েছে। তারপর আবার মর্যাদায় কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিতেও নিষেধ করে দিয়েছেন। এ প্রকৃত রহস্য কি?

আলোচ্য বিষয়টিকে খোলামেলাভাবে বুঝা উচিত যে, একদিকে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, ঃ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ "আল্লাহ্ কতক নবীকে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" অধিকান্তু নবী (সা) বলেন, أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ لَافَخْرَ "আমি বনী আদমের মাঝে শ্রেষ্ঠ সন্তান অথচ এতে গৌরবের কিছু নেই"। অপর দিকে তিনি বলছেন ঃ لَايَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ اَنِّىْ خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنَ مَتّٰى لَاتَفَضَّلُوْابَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ "নবীদের মাঝে কাউকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিওনা এবং তোমাদের মাঝে কেউ যেন না বলে যে, আমি (মুহাম্মদ স.) ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চাইতে উত্তম।" তাহলে কুরআন ও হাদীসের এসব দলীলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে করা যাবে?

এ মাসআলা সমাধানে মুহাদ্দিস ও ব্যাখাকারীগণের একাধিক বক্তব্য বিদ্যমান। যেমন-উক্ত দু'টি বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যায় যে, নবী (সা.) যে হাদীসে নবী-রাসূলদের একে অপর থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে নিষেধ করেছেন, সেটা সূরা বাকারার ঐ আয়াত নাযিলের পূর্ববর্তী সময়ের হাদীস। এ ছাড়া তখনো তিনি নবীদের মর্যাদা, বিশেষ করে সমস্ত নবীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

কিন্তু এ উত্তর কিংবা সমাধান খুবই দুর্বল, এমনকি অগ্রহণযোগ্য। কেননা ইয়াহূদীর সাথে যে ঘটনা ঘটেছে এবং হযরত ইউনুসের মর্যাদা প্রসঙ্গে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলিই মাদানী জীবনের শেষ বছরে হয়েছে। ইতিপূর্বেও নবী (সা.) রাসূলদের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীস ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় যে সমাধানটি পেশ করা হয়েছে তা হল-এসব রেওয়ায়েতে যদিও কতক সনদ সূত্রে নবীদের মর্যাদা সম্পর্কে সাধারণভাবে শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন "لَاتَفَضَّلُوْابَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ" কিন্তু এ বক্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হল শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সত্তা। ইয়াহূদীর ঘটনা এবং হযরত ইউনুস (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস থেকে তাই প্রমাণিত হয়। তিনি যদিও জানেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে সমস্ত আদম সন্তানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি এহেন বক্তব্য পেশ করেছেন। কারণ তিনি বিনয়-নম্রতা ও নিজেকে হীন বলে প্রকাশ করতে ভালবাসতেন।

কিন্তু এ উত্তরটিও শক্তিশালী নয়। কেননা উপরোক্ত বক্তব্যে বিষয়টিকে তিনি সাধারণভাবে পেশ করেছেন। দলীল প্রমাণ ছাড়া একে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সত্তার সাথে নির্দিষ্ট করায় কোন অর্থ হয়না।

ভেড়া-বকরীর মত টেনে হেঁচাড়িয়ে নিয়ে চলে, তখন তাওরাতের সমস্ত কপি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া। অতঃপর বনী ইসরাঈলের কাছে তাওরাতের না কোন কপি সংরক্ষিত ছিল, আর এমন কোন হাফিয ছিল না যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাওরাতকে সংরক্ষণ করতে পারে। সুতরাং বন্দীকালীন পুরো সময়টাতে তারা তাওরাত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অতঃপর দীর্ঘকাল পর যখন তারা ব্যাবিলনের বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে আবার বসতি স্থাপন করল, তখন তারা ভাবতে শুরু করল যে, আল্লাহ্র কিতাব তাওরাত কিভাবে অর্জন করা যায়। তখন হযরত উযায়র (আ.) সমস্ত বনী ইসরাঈলকে সমবেত করেন এবং তাদের সামনে তাওরাত কিতাব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ পড়ে শুনান এবং লিপিবদ্ধ করান।

কতক ইসরাঈলী বর্ণনায় আছে যে, যখন তিনি ইসরাঈলীদের সমবেত করেন তখন সবার উপস্থিতিতে আসমান থেকে দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র অবতীর্ণ হয় এবং হযরত উযায়রের বক্ষে মিশে যায়। অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলকে তাওরাত কিতাবটি ধারাবাহিকভাবে আদ্যপান্ত পাঠ করে শুনান। সতরাং হযরত উযায়র (আ.) যখন এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করেন, বনী ইসরাঈল তখন অপরিসীম আনন্দোল্লাস প্রকাশ করে। তাদের হৃদয়ে হযরত উযায়েরের সম্মান ও মর্যাদা শত সহস্র গুণ বেড়ে যায়। (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫)

ধীরে ধীরে তাদের এ সম্মান ও ভালবাসা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়। অবশেষে তারা হযরত উযায়র (আ.)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। খৃস্টানরা যেরূপ ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে মনে করে। বনী ইসরাঈলের একটি দল তাদের এ ভ্রান্ত আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দলীল উপস্থাপন করে যে, হযরত মূসা (আ.) যখন আমাদের তাওরাত এনে দেন তখন তা তক্তায় লিখা ছিল, কিন্তু হযরত উযায়র (আ.) কোন তক্তা বা কাগজ লিখিত কিতাবের পরিবর্তে তাঁর হৃদয়পাত হতে অক্ষরে অক্ষরে আমাদের সামনে পেশ করেন এবং সংকলন করে দেন। হযরত উযায়র (আ.) যেহেতু এ ক্ষমতা লাভ করেছেন। সুতরাং তিনি আল্লাহ্র পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬)

একটি সন্দেহের জবাব

কুরআন শরীফে ঘোষিত হয়েছে যে, ইয়াহূদীরা হযরত উযায়র (আ.) কে আল্লাহ্র পুত্র বলে মনে করে। বর্তমান যুগের কিছু ইয়াহূদী আলিম এর প্রতিবাদ করে বলে যে, আমরা হযরত উযায়রকে আল্লাহ্র পুত্র মানিনা। কাজেই কুরআনের এ দাবী মিথ্যা। কিন্তু এসব আলিমদের প্রতিবাদও তাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় জুয়াচুরি ও সত্য গোপনের কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত। তা না হলে তারাও তো

জানে এবং তাদের ছাড়া এমন সব লোক যারা ইসলামী রাজ্যগুলো ভ্রমণ করছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় তত্ত্ব সম্পর্কে জানার কৌতুহল পোষণ করেন, তারাও একথা অবহিত যে, আজও ফিলিস্তীন অঞ্চলে ইয়াহূদীদের একটি দল হযরত উযায়র (আ.) কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের মত তারাও উযায়র-এর প্রতিকৃতি বানিয়ে এমন ব্যাপার করে যা আল্লাহ্‌র সাথে করা উচিত নয় অর্থাৎ সামনে রেখে ভক্তি ভরে নত হয়।

হযরত উযায়ের (আ.)-এর পবিত্র জীবনী

হযরত উযায়র (আ.)-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত কোন ঘটনা বা অধিক কোন তথ্য ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। আর পূর্ণাঙ্গ তাওরাতের আযরা পুস্তিকায় তাঁর পবিত্র জীবনের উপর বিস্তারিত কোন কিছুই আলোকপাত করা হয়নি। বরং ঐ পুস্তিকার অধিকাংশই বনী ইসরাঈলের ব্যাবিলনে বন্দীত্ব এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্যে ভরপুর। তবে তাওরাত আর ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ ও কা'ব আহ্‌বার (রা) প্রমুখ থেকে সংকলিত বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকু তথ্য পাওয়া যায় যে, বখ্‌তে নসরের বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণের সময় তিনি অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে তিনি বনী ইসরাঈলের 'ফকীহ্' (ধর্মীয় শাস্ত্র পণ্ডিত) এর পদমর্যাদায় আসীন হন। অতঃপর তিনি নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করেন। (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২)

তিনি এবং নজ্‌মিয়া (আ.) বনী ইসরাঈলের হিদায়েত ও পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করতেন। রাজা ইরদেশীরের যুগে তিনি বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্যা ও জটিলতা দূর করার জন্য রাজদরবারে তার প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন। (আয্‌রা পুস্তিকা)

সবিখ্যাত বক্তব্য অনুযায়ী যেসব মনীষী সূরা বাকারার ঘটনাটিকে তাঁর সাথে ঘটেছে বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এ পর্যায়ে কয়েকটি অতিরিক্ত বিবরণ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম ও কা'ব আহ্‌বার (রা) থেকে সংকলন করেছেন। ইব্‌ন কাসীরও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তাঁদের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া কতক মুফাস্‌সিরীন আলোচ্য আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে সে সব বক্তব্য সংকলন করেছেন।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে একটি সঠিক রিওয়ায়েত সংকলন করা হয়েছিল যে, কোন একজন নবীকে একটি পিপঁড়া কামড় দিয়েছিল। তিনি রাগান্বিত হয়ে পিপঁড়া ঢিবিতে আগুন লাগিয়ে সমস্ত পিপঁড়া জ্বালিয়ে দেন। তখন আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তিরস্কার করে বলেন যে, একটি পিপঁড়ার অপরাধে

তুমি সমস্ত পিপঁড়া জ্বালিয়ে দেয়া কিভাবে বৈধ মনে করলে? উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইব্‌ন কাসীর (র) ইসহাক ইব্‌ন বাশীরের সূত্রে সংকলন করেন যে, মুজাহিদ, ইব্‌ন আব্বাস, হাসান বাসরী প্রমুখ মনীষী বলেন যে, বর্ণিত নবী ছিলেন হযরত উযায়র (আ.)। (আদি ও অন্ত এবং তারীখ তাবারী)

হযরত উযায়র (আ) সম্পর্কে আরো কতগুলো ঘটনা সংকলনে পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ণনা ও বোধগম্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় বরং সেগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট। কাজেই ইব্‌ন কাসীর ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ সেগুলো সংকলন করার পর প্রত্যাখান করেছেন।

হযরত উযায়ের (আ.) ও নবুওয়াতের পদমর্যাদা

একথা স্পষ্ট যে, হযরত উযায়র (আ.) কে পূর্বোল্লিখিত আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত বলে যেসব বর্ণনা ঘোষণা দিয়েছে সেগুলোতে এত প্রকাশ করা হয়েছে যে, হযরত উযায়র (আ.) নবী ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অথচ জমহুর আলিমদের বক্তব্য হল- হযরত উযায়র (আ.) নবী ছিলেন। কুরআন শরীফ ও যে পদ্ধতি ভঙ্গিতে তাঁর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নবী ছিলেন এবং পথভ্রষ্ট ইয়াহূদীদের একদল তাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলতে শুরু করে যেরূপ খৃস্টানগণ হযরত ঈসা (আ.) কে পুত্র বলে। এছাড়া তাওরাতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন।

অধিকন্তু যে সব মুফাস্‌সির একদিকে সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে হযরত উযায়রকে সম্পৃক্ত করেন অপর দিকে তাঁর নবী হওয়াকে অস্বীকার করেন তাদের উচিত গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা যে, সূরা বাকারা আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ কোন মাধ্যম ছাড়াই তাঁকে সম্বোধন করেছেন এবং পরস্পর কথা বলেছেন। আর এটাই তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

যাহোক, হযরত উযায়র (আ.)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে দু'টি বক্তব্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে তিনি যে সন্দেহাতীতভাবে নবী ছিলেন এবং বংশ পরম্পর কতক নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তিনি যে হযরত হারূন ইব্‌ন ইমরানের বংশধর ছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। ইব্‌ন আসাকির বলেন, তাঁর পিতার নাম ছিল জারুহ্। আর কেউ বলেন সোরায়েক, অপর একদল বলেন সারুখা। আযরা পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর পিতার নাম ছিল খাল্‌কিয়াহ।

ইন্তিকাল ও কবর

আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র.) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌, কা'বুল আহ্‌বার ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (র) থেকে হযরত উযায়র (আ.) সম্পর্কে যে দীর্ঘ রিওয়ায়েত সংকলন করেছেন; তাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত উযায়র (আ.) বনী ইসরাঈলের জন্য তাওরাত নতুনভাবে রচনা করেন ইরাকের অন্তর্গত হাযকীল ইবাদত খানার ভিতরে এবং এ অঞ্চলেরই সায়েদাবাদ নামে একটি জনপদে তিনি ইন্তিকাল করেন। (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫)

অপর জায়গায় বলেন, কতক জীবনী গ্রন্থে আছে যে, দামেশ্‌কে তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে। (আদি ও অন্ত, পৃ. ৪৩)

শিক্ষণীয় বিষয়

হযরত উযায়রের ঘটনাসমূহকে যারা কিস্‌সা কাহিনীর পরিবর্তে ঐতিহাসিক বাস্তবতা বলে মনে করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁর জীবন কাহিনী থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল লাভ করতে পারবেন। নিম্নে সেসব উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে সন্নিবেশন করা হল ঃ

১. মানুষ উন্নতি-অগ্রগতির যত চরম শিখরেই উঠুক না কেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর যত নৈকট্যই সৃষ্টি হোক না কেন, সে আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাসই থাকে। আর সে যত উচ্চ মর্যাদার আসনেই পৌছাক, সে আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে না। কেননা মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র সত্তা, তাঁর কোন শরীক নেই এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে তিনি পবিত্র অবস্থানে। সুতরাং মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় গোমরাহী হল এই যে, যখন তারা কোন মনোনীত মনীষীর পক্ষ থেকে এমন কিছু ব্যাপার সংঘটিত হতে দেখে যা স্বাভাবিকভাবে যুক্তি বুদ্ধির কাছে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক মনে হয়, তখন তারা ভয়ভীতি অথবা আকীদা বিশ্বাসের আতিশয্যে বলে উঠে যে, এ সত্তা আল্লাহ্‌র অবতার অথবা তাঁর পুত্র। তারা চিন্তা করে দেখেনা যে, এসব ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে আল্লাহ্‌র শক্তির মাধ্যমে তাঁরই কুদ্‌রতী নিদর্শন স্বরূপ। এতদসত্ত্বেও তিনি না আল্লাহ্‌ হয়ে পড়েছেন, না আল্লাহ্‌র পুত্র। বরং তিনি আল্লাহ্‌র একজন নিকটতম বান্দা। আর তার হাত দিয়ে সংঘটিত ব্যাপারগুলো আল্লাহ্‌র বিশেষ আইনের অধীনে তাঁরই সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য বাস্তবায়িত হয়। নতুবা তিনিও আল্লাহ্‌র সামনে অন্যান্য মাখলূকের মতই বাধ্যানুগত। সুতরাং কুরআন শরীফ বিভিন্ন আয়াতে এ বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছে স্পষ্টভাবে, যাতে মানুষকে এ ধরনের পথভ্রষ্টতাপূর্ণ আকীদা বিশ্বাস থেকে কঠোরতার সাথে বিরত রাখতে পারে।

২. আল্লাহ্ সূরা বাকারার ঘটনাটিকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঐ ঘটনার সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন, যাতে উল্লেখ আছে যে, তিনিও একদা আল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর, তা আমাকে দেখাও। তখন আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে ইব্রাহীম! তুমি কি এটা বিশ্বাস কর না? হযরত ইব্রাহীম (আ.) উত্তরে বলেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি যে মৃতকে জীবিত কর এটা আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্তরের প্রশান্তি অর্জনের জন্যই প্রশ্ন করলাম। মহান আল্লাহ্ পূর্বোক্ত ঘটনাটি এ ঘটনার সাথে বর্ণনা করেছেন এ উদ্দেশ্যে যাতে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে যায় যে, নবীদের পক্ষ থেকে এসব প্রশ্ন এজন্যে আসে নাই যে, তাঁরা মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারটিকে সন্দেহ করেন এবং তা দূর করতে চান, বরং তাদের এ ব্যাখ্যা চাওয়ার উদ্দেশ্য হল, এ সম্পর্কে তাদের অন্তরে ইল্মুল ইয়াকীন বিদ্যমান, উক্ত ইয়াকীনকে আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীনের স্তরে পৌঁছানো। অর্থাৎ তারা অন্তরে যেমন বিশ্বাস করেন, চোখে দেখেও সেরূপ বিশ্বাস করতে চান। কেননা তাঁরা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হওয়ার দরুন যে দায়িত্ব বহন করছেন, তা পৌঁছানো ও অতি সুন্দর সহজভাবে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্য উক্ত ইয়াকীন অর্জন একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া ইয়াকীনের এমন কোন উন্নত স্তরই যেন বাকী না থাকে যা তাদের অর্জিত হয়নি।

৩. দুনিয়াটা হল কর্মক্ষেত্র আর পুরস্কার বা বিনিময়ের জন্য আরেকটি জগত রয়েছে, যাকে পরকাল বলা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র বিধান এরকম চালু যে, অত্যাচার ও অহংকার কর্মের ফল স্বরূপ দুনিয়াতেই যালিম অহংকারীকে অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বিশেষ করে এ দু'টি কুকর্ম যখন ব্যক্তির গণ্ডি পেরিয়ে সমাজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন তাদের উপর নেমে আসে চরম দুঃখ ও যাতনা। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ –

"হে নবী আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণতি অবলোকন কর।" (সূরা নাম্ল ঃ ৫৯)

কিন্তু একথাটাও মনে রাখতে হবে যে, জাতির সামাজিক জীবনের টিকে থাকা ও ধ্বংস হওয়া ব্যক্তি জীবনের চাইতে পৃথক হয়ে থাকে। এজন্যে তাদের কুকর্মের পরিণতি বিলম্বে আসলে অতি সাহসী ও স্বাধীন চেতা মানুষের কখনোই হতবুদ্ধি ও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা আল্লাহ্র তৈরি বিধান মতে কৃত কর্মের পরিণতি, তার নির্ধারিত সময় থেকে সরে যেতে পারে না।

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম

কুরআন শরীফে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর বর্ণনা

কুরআন শরীফের ৪টি সূরায় আলে ইমরান, আন'আম, মরিয়াম ও আম্বিয়াতে স্থান পেয়েছে।

নিম্নের ছকটিতে সে সব আয়াতের তালিকা প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	সূরা	আয়াত নাম্বার	মোট আয়াত সংখ্যা
১.	আলে ইমরান	৩৭-৪১	৫
২.	আন'আম	৮৫	১
৩.	মরিয়াম	২-১১	১০
৪.	আম্বিয়া	৮৯-৯০ ২	২
			সর্বমোট ১৮

তন্মধ্যে সূরা আন'আমে নবীদের তালিকাসূচীতে শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি সূরায় তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বংশ পরিচয়

তাওরাতের যাকারিয়া পুস্তিকায় যার কথা বর্ণিত আছে, কুরআন উল্লেখিত যাকারিয়া (আ.) কিন্তু তিনি নন। কেননা তাওরাতে যে যাকারিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, তিনি আবির্ভূত হন রাজা দারিউস বা দারার রাজত্বকালে। সুতরাং এ পর্যায়ে যাকারিয়া নবীর কিতাবে আছে, দারার রাজত্ব কালের দ্বিতীয় সালের অষ্টম মাসে সদাপ্রভুর বাণী যাকারিয়া ইব্ন বরখিয়া ইব্ন আদদের কাছে পৌছে (অধ্যায় ১, শ্লোক ১) আর রাজা দারা ইব্ন গাশ্তাসপের সময় কাল ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পাঁচশ বছর পূর্বে। কেননা কায়কোবাদ ইব্ন কায়খসরুব মৃত্যুর পর ৫২১ খৃ. পূর্বাব্দে দারা সিংহাসনে

আরোহন করেন। অথচ কুরআন শরীফে যে যাকারিয়া (আ.)-এর বিবরণ রয়েছে, তিনি তো হযরত ঈসা (আ.)-এর মা হযরত মরিয়াম আলাইহিস্ সালামকে লালনপালন করেছেন এবং তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর সমকালীন নবী। তাঁর মাঝে এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া ও ঈসা (আ.)-এর মাঝে আর কোন নবী আসেন নাই। আর তিনিই তো হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর পিতা। (ফাত্হুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫) হযরত যাকারিয়া (আ) পিতার নাম ছিল কিয়া। এ সম্পর্কে জীবনীকারদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। তাঁদের কোন একটি বক্তব্যকেই নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। সুতরাং ইব্ন হাজার আস্কালানী (র) ফাত্হুল বারীতে আর ইব্ন কাসীর তাঁর তাফসীর ও ইতিহাসে ইব্ন আসাকিরের সূত্রে সে সব বক্তব্য সংকলন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বংশতালিকা এরূপ যাকারিয়া পিতা উন (দান) অথবা শিবওয়া অথবা লাদূন অথবা বরখিয়া, পিতা-মুসলিম, পিতা-সাদুক, পিতা-জিস্তান, পিতা-দাঊদ, পিতা-সুলায়মান, পিতা-মুসলিম, পিতা-সিদ্দীক, পিতা-বরখিয়া, পিতা-বলআর্তা, পিতা-নাহোর, পিতা-শালুম, পিতা-বাহ্ফাশত, পিতা-ঈনামন, পিতা-রজআম, পিতা-সুলায়মান (আ) পিতা-দাঊদ (আ.)। তবে একথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, তিনি হযরত সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ.)-এর বংশের লোক ছিলেন। (তারীখ ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭)

তাঁর জীবন কাহিনী

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে তেমন কোন বিবরণ জানা যায় না। কিন্তু তবুও কুরআন শরীফ, জীবনীগ্রন্থ ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল। বিগত আলোচনায় একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বণী ইসরাঈলের মাঝে 'কাহিন' একটি মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় উপাধি ছিল। তাঁর দায়িত্ব ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের যাবতীয় রীতিনীতি ও পর্বানুষ্ঠান পরিচালনা করা। এ সেবাকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্র থেকে পৃথক পৃথক কাহিন নির্বাচিত হত এবং তাঁদের পাল অনুযায়ী উক্ত দায়িত্ব পালন করত। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন বণী ইসরাঈলের একজন সম্মানিত কাহিন এবং মর্যাদাবান পয়গম্বর। সুতরাং কুরআন শরীফে নবী রাসূলদের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করে ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ

"এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত"। (সূরা আন'আম ঃ ৮৫)

আর লুক বাইবেলে তাঁকে 'কাহিন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহূদী রাজা হিরোদীসের রাজত্বকালে আবিয়াহ গোত্রে যাকারিয়া নামে একজন কাহিন ছিলেন আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত হারূনের বংশধর। তাঁর নাম ছিল আলইশা। এরা উভয়েই আল্লাহ্ অভিমুখী, সরল জীবন যাপনকারী ছিলেন এবং সদাপ্রভুর সমস্ত নির্দেশ ও আইন কানূন নিখুঁতভাবে মেনে চলতেন। (অধ্যায় ১, শ্লোক ৫-৬) কিন্তু বারনাবাসের বাইবেলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহ্ মনোনীত নবী ছিলেন। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.) ইয়াহুদকে লক্ষ্য করে বলেন, সে সময় আসন্ন যখন তোমাদের উপর নবী-রাসূলদের হত্যার শাস্তি আপতিত হবে। তাদের তোমরা হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর সময় পর্যন্ত হত্যা করেছ, অতঃপর তোমরা হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের কুরবানীস্থলে হত্যা করেছ। (বারনাবাসের বাইবেলটি প্রসিদ্ধ ঘটনা থেকে ভিন্ন)

হযরত যাকারিয়া (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর অধঃস্তন বংশধর ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী মহিয়সী ঈশা কিংবা আলঈশা হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, তারীখ ইব্ন কাসীর)

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সমস্ত নবী রাসূলগণ চাই তারা বাদশাহ হোন কিংবা রাজত্বের অধিকারীই হোন, নিজের পরিশ্রম অর্থের মাধ্যমে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁরা কারো উপর বোঝা বা গলগ্রহ হয়ে থাকতেন না। এ জন্যেই প্রত্যেক নবী যখন তাঁদের উম্মাতকে সৎপথের হিদায়েত দিতেন তখন সাথে সাথে এ ঘোষণা ও দিতেন যে

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ

"আর এ জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনা। আমার বিনিময় দেবেন একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।" সুতরাং হযরত যাকারিয়া (আ.) জীবিকা নির্বাহের জন্য ছুতার গিরি করতেন। প্রসিদ্ধ সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ মুসলিম, ইব্ন মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا -

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যাকারিয়া (আ) ছুতার ছিলেন। (কিতাবুল আম্বিয়া) তাঁরই বংশে অর্থাৎ সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ.)-এর অধঃস্তন বংশে ইমরান ইব্ন নাশী ও তাঁর স্ত্রী হান্না বিনত ফাকূদ অত্যন্ত সৎকর্মশীল মানুষ ছিলেন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪)

তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র জীবন যাপন করতেন, কিন্তু তারা ছিলেন নিঃসন্তান। এ সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিবরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অবশেষে হান্নার দু'আ কবুল হওয়ার ফলে তাঁর ঘরে জন্মগ্রহণ করলো একটি কন্যা সন্তান, যাঁর নাম রাখা হল মরিয়াম। হান্না তাঁর মানত (প্রতিজ্ঞা) অনুযায়ী মরিয়াম (আ) কে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করলেন। প্রশ্ন দেখা দিল যে, তাঁর লালনপালন ও দেখাশোনার দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করা হবে? কাহিনদের মাঝে এ পবিত্র ও গৃহীত উপঢৌকন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। সবাই চাচ্ছিল আল্লাহ্‌র নযরকে তাঁরা লালন পালন করবে। অতঃপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, লটারীর মাধ্যমে তা স্থির করা হবে। লটারী করা হল, এতে হযরত যাকারিয়া (আ.) বিজয়ী হলেন এবং মরিয়ামের দায়িত্বশীল ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পরিগণিত হলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ

"আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। মরিয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করতেছিল তুমি তখন তাদের কাছে ছিলে না। এর তারা যখন বাদানুবাদ করতেছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭ ও ৪৪)

জীবনীকার ও ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) এমনিতেই মরিয়াম (আ.)-এর তত্ত্বাবধানের অধিকারী ছিলেন, কেননা বশীর ইব্ন ইসহাক 'আল-মুবতাদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত যাকারিয়া (আ.) স্ত্রী ঈশা এবং মরিয়ামের মা হান্না দু'জন সহোদরা বোন ছিলেন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪) খালা মার মতই স্নেহশীলা হয়ে থাকেন। যেরূপ নবী করীম (সা) নিজেই আম্মারা বিনত হামযা (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন, জা'ফরের স্ত্রী আম্মারাকে লালন পালন করবে। কেননা তিনি আম্মারার খালা وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ অর্থাৎ "খালা তো মায়ের মতই স্নেহশীলা' (বুখারী)

মরিয়ম (আ.) যখন বোধশক্তি সম্পন্না হয়ে উঠলেন, তখন হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের পাশে একটি কক্ষ নির্ধারিত করে দিলেন। সেখানে তিনি দিনের বেলায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং রাতের বেলায় খালার কাছে চলে যেতেন।

হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন মরিয়মের কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখন তার কাছে বে-মৌসুমের ফলমূল দেখতে পেতেন। একদা হযরত যাকারিয়া (আ.) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো তোমার কাছে কোত্থেকে এলো? মরিয়ম বললেন, এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ্ তো যাকে ইচ্ছে ধারণাতীত রিয্ক্ দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا -قَالَ يمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا- قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ - إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

"যখনই যাকারিয়া তার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে কক্ষে যেতেন, তখনই তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, হে মরিয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত, এগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)

মুজাহিদ, ইক্‌রাম, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, দাহ্‌হাক, কাতাদা ও ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ মুফাস্‌সির رِزْقًا শব্দের তাফসীর প্রসেঙ্গ বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) মরিয়ামের কাছে বে-মৌসুমী ফলমূল দেখতে পেতেন। (তাফ্‌সীর ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬)

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কোন সন্তান ছিলনা। তিনি সর্বদা একথা অনুভব করতেন যে, আমি সন্তানাদি থেকে বঞ্চিত। আমি এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত, কেননা আমার আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে কারো এমন যোগ্যতা নেই যে, আমার মৃত্যুর পর যে বনী ইসরাঈলকে সৎপথের সন্ধান দিতে পারবে। আল্লাহ্ যদি আমাকে একজন সুসন্তান দান করতেন, তবে আমি প্রশান্তি লাভ করতাম এই ভেবে যে, আমার পরে বনী ইসরাঈলকে সৎপথ দেখানোর মত যোগ্য ব্যক্তি আছেন। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪)

কিন্তু ইবন কাসীরের বক্তব্য অনুসারে তাঁর বয়স হয়েছিল তখন ৭৭ বছর, আর সা'লাবীর বক্তব্যানুযায়ী ৯০ কি, ৯২ অথবা ১২০ বছর, তদুপরি তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। কাজেই বাহ্যিক কারণের জন্য তিনি নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, এখন সন্তান হওয়ার মত কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু তিনি যখন মরিয়ামের কাছে বে-মৌসুমী ফলমূল দেখতে পেলেন এবং জানতে পারলেন যে, এটা মরিয়ামের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও পুরস্কার, তখনই তাঁর হৃদয়ে প্রেরণার ঢেউ জাগ্রত হল, যে পবিত্র সত্তা এমনিভাবে মরিয়মকে বে-মৌসুমী ফলমূল দান

করেছেন, তিনি কি আমাকে বর্তমান নিরাশাব্যঞ্জক অবস্থায় জীবনের ফল (ছেলে) দেবেন না? আমার হতাশা তো মারাত্মক ভুল। নিঃসন্দেহে যে পবিত্র মহান সত্তা মরিয়মের উপর তার নিয়ামত নাযিল করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার উপরও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। সুতরাং তিনি আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে দু'আ করে বলতে শুরু করলেন, হে আল্লাহ্! আমি তো একাকী, আর আমি উত্তরাধিকারীর মুখাপেক্ষী। এমনি তো তুমিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। হে প্রভু! তুমি আমাকে একজন সুসন্তান দান করো। আমি বিশ্বাস করি, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তুমি অভাবীদের দু'আ অবশ্যই কবূল করে থাক। তখনই নবীর দু'আ কবূল হয়ে যায়। কেননা এ দু'আ ছিল নবীর পক্ষ থেকে তাও আবার ব্যক্তিগত চাওয়া নয় বরং জাতির হিদায়েত ও পথ প্রদর্শনের খাতিরে সামষ্টিক দু'আ। অতঃপর হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে ইবাদতে মশগুল হন, তখন আল্লাহ্র ফিরিশ্তা এসে তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার ছেলে জন্মলাভ করবে। আপনি তাঁর নাম রাখবেন ইয়াহ্ইয়া। হযরত যাকারিয়া (আ.) এ সংবাদ শুনে আনন্দের আতিশয্যে ও অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, এ সুসংবাদ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে? অর্থাৎ আমাকে কি যৌবন প্রদান করা হবে, নাকি আমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব রোগ নিরাময় করা হবে ? ফিরিশ্তা উত্তরে বললেন, অবস্থা যাই হোক না কেন, তবে এতটুকুন বলতে পারি যে, আপনার অবশ্যই ছেলে হবে; কেননা আল্লাহ্র ফায়সালা অনড়। আপনার আল্লাহ্ তো বলছেন যে, এ কাজ আমার জন্য খুবই সহজ। আমি এর জন্য যে কোন পদ্ধতি চাই তো অবলম্বন করব। আমি কি তোমাকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনি নাই? তখন হযরত যাকরিয়া (আ.) আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ জানালেন, হে আল্লাহ্ আমার জন্য এমন কোন নিদর্শন প্রদান করুণ, যাতে আমি জানতে পারি যে, সুসংবাদটি বাস্তবরূপ লাভ করেছে। আল্লাহ্ বললেন, নিদর্শন হল যখন তুমি তিনদিন পর্যন্ত কথা বলতে পারবে না, শুধু ইশারা ইঙ্গিতে নিজের প্রয়োজন মেটাবে, তখন বুঝে নেবে যে, সুসংবাদটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। তবে সেদিনগুলোতে আল্লাহ্র তাসবীহ্-তাহ্লীল ও গুণগানে বেশী লিপ্ত থেকো। সুতরাং সে সময় যখন এসে গেল তখন হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহ্র স্মরণে অত্যধিক মশগুল হয়ে গেলেন এবং তাঁর উম্মাতকে ইংগিতের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বেশী বেশী আল্লাহ্র স্মরণে লিপ্ত থাকে। কেননা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদটি হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর জন্য যেরূপ শত সহস্র বার আনন্দোল্লাসের কারণ ছিল, ঠিক সেরূপ বনী ইসরাঈলের জন্যও কম আনন্দের ব্যাপার ছিলনা। কারণ এ সুসংবাদের মাধ্যমেই হযরত যাকারিয়া (আ.) একজন

সুযোগ্য প্রতিনিধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নবুওয়াতের একজন সত্যিকার উত্তরাধিকারী পৃথিবীতে শুভাগমন করেছেন।

এসব ঘটনা আমরা কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। আর এ বর্ণনাগুলোই নির্ভরযোগ্য। এছাড়া ইসরাঈলী রেওয়ায়েতগুলোর মধ্যে অধিকাংশই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। আর কতগুলো রিওয়ায়েত অগ্রহণযোগ্য। আর কতগুলো রেওয়ায়েত আছে, যেগুলো বর্ণনারীতি ও বোধগম্যতার দিক থেকে প্রমাণযোগ্যও নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়।

এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

كهيعص – ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا – اِذْنَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا – وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا – وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَائِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا – قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا – قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً – قَالَ اٰيَتُكَ اَنْ لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا – فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا.

"কাফ্-হা-য়া আইন-সা'দ, তা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তার প্রতিপালককে নিভৃতে আহবান করেছিল। সে বলেছিল, আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে, হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হই নাই। আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমরা কাছ থেকে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর। যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়া'কূবের বংশের এবং হে তোমার রব! তাকে তুমি সন্তোষভাজন করো। তিনি বললেন, হে যাকারিয়া। আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া; এ নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করি নাই। সে বলল, হে আমার রব! কেমন করে

তোমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। তিনি বললেন, এরূপেই হবে। তোমার রব বলেছেন, তা আমার পক্ষে সহজসাধ্য, আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। যাকারিয়া বলল, হে রব! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে তিনদিন বাক্যালাপ করবে না। অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদের সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল।" (সূরা মরিয়ম ঃ ২-১১)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَزَكَرِيَّا اِذْنَادٰى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا- وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং এর জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার কাছে অতি বিনয়ী।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৯-৯০)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً - اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ - فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ- اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ - قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً - قَالَ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا - وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ -

"সেখানেই যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করে বলল, হে আমার রব! আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান কর, তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পূণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। সে বলল, হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বললেন, এভাবেই। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। সে বলল, হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারেনা। আর তোমার রবকে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮-৪১)

তাফসীর ভিত্তিক কয়েকটি তথ্য পর্যালোচনা

সূরা আলে ইমরান ও সূরা মরিয়ামে বর্ণিত আছে যে, হযরত যাকারিয়া (আ.) কে যখন ইয়াহ্ইয়ার জন্মের সুসংবাদ শুনান হল তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, আমি তো বার্ধক্যের চরমসীমায় উপনীত আর আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা। সুতরাং এ অবস্থায় সুসংবাদ বাস্তবায়িত হবে কিভাবে? শাহ্ আবদুল কাদের (র)-এ সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম বক্তব্য পেশ করেছেন, "দুর্লভ বস্তু চাওয়ার সময় অবাক লাগেনি; কিন্তু যখন শুনতে পেলেন যে, তা লাভ করা যাবে তখন অবাক লেখেছে"। (মুযিহুল কুরআন ঃ সূরা মরিয়ম)

ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আলোচনা করা হয়েছে যে, নবী-রাসূলদের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন উঠার মানে এ নয় যে, তারা আল্লাহ্ কুদ্‌রতে কামেলার সন্দেহ পোষণ করেন; বরং তাদের উদ্দেশ্য হল, এ ধরনের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আল্লাহ্র অপার ক্ষমতার নিদর্শন বলে দেয়াই উত্তম। কিন্তু যেহেতু জিজ্ঞাসার বাহ্যিক দিক থেকে মনে হয় যেন তারা বিষয়টি বাস্তবে রূপ লাভ করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্থ ও সন্দিহান। তাই আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধান মোতাবেক প্রথমেই তাদের সতর্কতামূলক উত্তর প্রদান করা হয়, যদিও এক্ষেত্রে মানব সূলভ আচরণের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নটির জন্য পাকড়াও করা যায় না, তবু তাঁর উচু মর্যাদার তুলনায় কথাটি অতি নগন্য। তিনি তো আল্লাহ্র অতি কাছের মনোনীত নবী। তাঁর পক্ষে এসব ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা সম্মানের দৃষ্টিকোণ থেকে অসমীচীন। সুতরাং শাহ আবদুল কাদের (র) সংক্ষিপ্ত দু'টি বাক্যে এ সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু প্রশ্নের ভিতরে যে বাস্তব চেতনা রয়েছে, তার দিকে লক্ষ্য করে তার অন্তরের প্রশান্তির জন্য মূল উত্তর অবশ্যই প্রদান করা যায়। এ বাস্তবতার

দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ প্রথমেই যাকারিয়ার বিস্ময় অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন এবং তাঁর কুদ্‌রতে কামেলার অচল-অনড় বাস্তবায়নের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অতঃপর যাকারিয়ার প্রশ্নের মূল চেতনা অনুসারে উত্তর দিয়েছেন এই বলে, وَاَصْلَحْنَا زَوْجَهُ "আমি তার স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব রোগ নিরাময় করে সুস্থ করেছি।"

২. সূরা মরিয়মে বর্ণিত। হযরত যাকারিয়া (আ.) সন্তানের জন্য দু'আ করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে বলেছিলেন ঃ يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ "যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকূবের বংশের"। উক্ত আয়াতে উত্তরাধিকারিত্ব বলতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নবুওয়াতের উত্তরাধিকারিত্বকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তো অর্থটি আরো বেশী স্পষ্ট; কেননা হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন ধন সম্পদহীন, তিনি সুতারগিরি পেশার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর কাছে এমন সম্পদই কোথায় ছিল, যার জন্য উত্তরাধিকারীত্বের আকাঙক্ষা হত? অধিকন্তু এজন্যেও সম্পদের উত্তরাধিকারী বুঝনো যেতে পারে না, কারণ, হযরত যাকারিয়া (আ.) এর যদি তাই উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে তিনি শুধু বলতেন يَرِثُنِىْ যে আমার উত্তরাধিকারী হবে। অথচ এর সাথে- يَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ- "ইয়াকূব বংশের উত্তরাধিকারী হবে" এটা বলার অর্থ কি? ইয়াহ্ইয়া (আ.) একা সমস্ত ইয়াকূব বংশের সম্পদের উত্তরাধিকারী কিভাবে হতে পারেন ?

৩. সূরা আলে ইমরান ও সূরা মরিয়ামে উদ্ধৃত হয়েছে, اٰيَتُكَ اَنْ لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি একাধারে তিন দিন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না"। আমরা জমহুর আলিমদের মতানুযায়ী এ আয়াতের তাফসীর পেশ করেছি। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা ও অন্যান্য আলিমগণ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কোন রোগ-ব্যাধি ও ত্রুটি ছাড়াই তাঁর কথা তিন দিন বন্ধ ছিল। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, তাঁর বাকশক্তি কালা রোগ থেকে মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিন দিনের জন্য বন্ধ হয়েছিল এবং তাঁর মাঝে সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে ইশারা ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলার শক্তিই ছিল না। (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২)

তবে উক্ত আয়াতের বাক্যাংশ سَوِيًّا শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে দু'টি বক্তব্য বিদ্যমান। এক, سَوِىٌّ অর্থ-সুস্থ- সঠিক দুই, -سَوِىٌّ অর্থ-একেরপর এক অর্থাৎ

পরস্পর তিন দিন। প্রথম বক্তব্যটি জমহুর আলিমদের আর আউফী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে দ্বিতীয় বক্তব্যটি সংকলন করেছেন।

হাফিয ইমাদুদ্দীন জমহুর আলিমদের বক্তবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাফ্‌সীর ইব্‌ন কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২)

লুক বাইবেলেও যাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে জমহুর আলিমদের অভিমত এই যে, যাকারিয়া (আ.) ফিরিশ্‌তাদের বললেন, আমি কিভাবে তা জানতে পারব, আমি তো বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। ফিরিশ্‌তা উত্তরে বললেন, আমি জিব্‌রাঈল (আ.) সর্বদা আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়িয়ে থাকি। আমাকে তোমার সাথে কথা বলার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং তোমাকে এ সুসংবাদ দিতে বলা হয়েছে যে, যতদিন সুসংবাদের তথ্যটি বাস্তবায়িত না হবে, তুমি নির্বাক হয়ে থাকবে, কথা বলতে পারবে না। (লুক, অধ্যায় ১, শ্লোক ১৮-২০)

কিন্তু মাওলানা আযাদ তর্জমানুল কুরআনে জমহুর আলিমদের থেকে ভিন্ন অর্থ-লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হল- হযরত যাকারিয়া (আ.) কে বলা হল, তুমি বনী ইসরাঈলে প্রচলিত রোযার মতই তিন দিন পানাহার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি নির্বাকতা অবলম্বন করবে, তা হলেই প্রতিশ্রুত সুসংবাদের সময়কাল আরম্ভ হবে। সুতরাং তিনি লুক বাইবেলের উপরোল্লিখিত বরাত সংকলন করে বলেন, কুরআনে একথা বলা হয়নি যে, হযরত যাকারিয়া (আ.) কালা- বোকা হয়ে গেছেন। এটা সম্ভবত পরবর্তী যুগের ব্যাখ্যা, যা স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভব হয়ে গেছে। স্পষ্টভাবে একথা জানা যায় যে, হযরত যাকারিয়াকে রোযা রাখতে এবং ইবাদাতে লিপ্ত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর ইয়াহূদীদের কাছে চুপ থাকাটাও রোযার অন্যতম কর্তব্য ছিল। أَنْ لاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ আয়াতের তাফসীর যদিও আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে হতে পারত; কিন্তু সালফে সালিহীন যেহেতু এর বিপরীত তাফসীর সম্পর্কে একমত। সুতরাং আমাদের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বোবা-কালা হয়ে যাবার ব্যাপারটা সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এটা কারো অভিমত নয় যে, তিনি উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বরং জিহ্বাতে বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনদিনের জন্য কথা বলাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

৪. সূরা আলে ইমরানে وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে এ বক্তব্যটি সংকলিত হয়েছে যে, এখানে 'রিযক' এর অর্থ ইল্‌ম ও হিক্‌মতের পুস্তিকা। কিন্তু আমরা এ বক্তব্য মেনে নিতে পারি না। কেন না জমহুর আলিমদের পক্ষ থেকে যা উদ্ধৃত হয়েছে তাই স্পষ্ট ও প্রনিধাণযোগ্য।

যাকারিয়া (আ.)-এর মৃত্যু

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.)-এর শাহাদাতের ঘটনার আনুসঙ্গিক আলোচনায় হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে জীবনীকার ও ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি কি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, নাকি তাঁকে শহীদ করা হয়েছে। মজার কথা হল উক্ত প্রাসঙ্গিক মতভেদের মূল সূত্র ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সুতরাং ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত একটি বক্তব্যে আছে যে, ইয়াহূদীরা যখন হযরত ইয়াহ্‌ইয়াকে শহীদ করে অতঃপর হযরতও যাকারিয়া (আ.) কে ও হত্যা করার জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হয়। হযরত যাকারিয়া (আ.) এ অবস্থা দেখে পলায়ন করতে চেষ্টা করেন, যাতে তারা তাঁকে ধরতে না পারে। সামনেই ছিল একটি গাছে তিনি এর গহ্বরে ঢুকে পড়েন। ইয়াহূদীরা তো তার পশ্চাদ্বাবণ করছিল যখন তারা দেখল যে তিনি গাছের ছিদ্রের মাঝে ঢুকে পড়েছেন, তখন তারা তাঁকে বেরিয়ে আসার জন্য বাধ্য করার পরিবর্তে করাত চালিয়ে গাছ চিরতে শুরু করল। অতঃপর করাত যখন যাকারিয়া (আ.) পর্যন্ত প্রবেশ করল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী পাঠানো হল এবং তাকে বলা হল, তুমি যদি এতটুকুন উহ্-আহ্ করছ তাহলে আমি যমীনকে উলটপালট করে ধ্বংস্ করে দেব, আর যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাহলে আমিও ইয়াহূদীদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব নাযিল করব। সুতরাং যাকারিয়া (আ.) ধৈর্য অবলম্বন করে চুপ করে থাকলেন, এতটুকুন উহ্ পর্যন্ত করলে না। ইয়াহূদীরা গাছের সাথে তাকেও দু'টুকরা করে ফেলল। (তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২)

আর উক্ত ওয়াহাব ইব্‌ন মুহাব্বিহ্ (র) থেকে অন্য একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, গাছে করাত চালানোর যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা ছিল হযরত শু'আইব (আ.) সম্পর্কিত ব্যাপার। হযরত যাকারিয়া (আ.) শাহাদত বরণ করেন নাই বরং তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করেছেন। (তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২)

যাহোক প্রসিদ্ধ বক্তব্য হল যে, তাঁকে ও শহীদ করা হয়েছে। তবে কিভাবে এবং কোথায় শহীদ করা হয়েছে, এ প্রশ্নের জবাবে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, আল্লাহ্‌ই সঠিক ব্যাপার সম্পর্কে অধিক অবগত।

হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্ সালাম

কুরআন শরীফে হ্যরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) -এর বর্ণনা

কুরআন শরীফে যেসব সূরায় হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর আলোচনা আছে, সেগুলোতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আলে ইমরান, আন'আম, মারিয়াম ও আম্বিয়া এ চারটি সূরায় ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা বিদ্যমান।

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর পুত্র এবং তাঁর নবুওয়াতী দু'আর অর্জিত ফসল। তাঁর নামটিও আল্লাহর আদেশে রাখা হয়েছে এবং তাঁর পূর্বে বংশের মধ্যে আর কারো নাম ইয়াহ্ইয়া রাখা হয়নি। আল্লাহ্ তার নাম রেখেছেন এই বলে ঃ

يَازَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نِ اسْمُهُ يَحْىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

(তিনি বললেন) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া, এ নামে পূর্বে আমি কারো নামকরণ করি নাই।" (সূরা মারিয়াম ঃ ৭)

তাঁর জীবনী

মালিক ইব্ন আনাস (রা.) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ.) এবং ঈসা ইব্ন মারিয়াম (আ.) একই সময়ে মাতৃগর্ভে অবস্থান গ্রহণ করেন। সা'লাবী (র) বলেন, তিনি ঈসা (আ.)-র ছয় মাস পূর্বে গর্ভজাত হন। (ফাত্হুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৬৪)

লুক বাইবেলে আছে, যাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রী আলাঈশা যখন অন্তঃসত্ত্বা হবার পর ছয় মাস অতিবাহিত হয় তখন জিবরাঈল ফিরিশ্তা মরিয়ামের কাছে

আবির্ভূত হন এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করেন। "এবং তোমার আত্মীয়া আলঈ/শা'কে দেখ, তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন আর তাকে বন্ধ্যা বলা হত। অথচ গর্ভ থেকে ছেলে হবে। তিনি এখন ছয়মাসের গর্ভবতী। (লুক, অধ্যায় : ১, শ্লোক : ২৬)

এসব উদ্ধৃতির সারকথা হল- হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) হযরত ঈসা (আ.) থেকে ছয় মাসের বড় ছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন ইয়াহ্ইয়ার জন্মের জন্যে দু'আ করেন। তখন তিনি বলেছিলেন, যেন সে ذرية طيبة 'আদর্শ সন্তান' হয়। সুতরাং কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর দু'আ কবূল করেছেন। তাই ইয়াহ্ইয়া (আ.) ছিলেন সৎলোকদের নেতা এবং ধার্মিকতা, আল্লাহ্ভীরুতা ও সংসার বিমুখতার ক্ষেত্রে অতুলনীয়। তিনি না বিয়ে শাদী করেছেন, আর না তার অন্তরে কখনো পাপের আসক্তি সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর পিতার মতই তিনিও মনোনীত নবী ছিলেন। শৈশবকালেই আল্লাহ্ তাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইল্ম হিক্মতে পূর্ণতা দান করেছিলেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল হযরত ঈসা (আ.) এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করা এবং তার শুভাগমনের পূর্বেই হিদায়েতের জন্য যমীনকে সমতল বা উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ-

"যাকারিয়া যখন কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফিরিশ্তাগণ তাকে সম্বোধন করে বলল, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৯)

জীবনী গ্রন্থ সমূহে এ আয়াতে উল্লেখিত "سيد" শব্দটির বিভিন্ন অর্থ উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন এর অর্থ সহিষ্ণু, জ্ঞানী, ধর্ম শাস্ত্রীয় পণ্ডিত; দীন-দুনিয়ার নেতা, ভদ্র ও পরহেযগার; আল্লাহ্র কাছে পসন্দনীয় এবং মনোনীত ইত্যাদি। কিন্তু সর্বশেষ শব্দার্থটি যেহেতু উপরোল্লিখিত সবকটি অর্থের পরিবেষ্টনকারী বা পরিপূরক, তাই অনুবাদে এটিই ব্যবহার করা হয়েছে। (তাফ্সীর ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১)

অনুরূপভাবে حصور শব্দটির ও বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যেমন যে ব্যক্তি স্ত্রী লোকের কাছে কখনো যায়নি; যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত এবং যার অন্তর পাপের অনুভূতিরই উদ্রেক হয়না; যে তার আত্মা বা প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাশালী এবং প্রবৃত্তির কামনাকে দমন করতে সক্ষম ইত্যাদি। (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১)

আমাদের ধারণা মতে সবগুলো অর্থেই একটি তত্ত্বের বিভিন্নভাবে প্রকাশ মাত্র। কেননা حصر শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিবন্ধকতা বা বাধা প্রদান, আর حصور শব্দটি অধিক অর্থবোধক কর্তৃকারকের রূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হল, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য যে সব বিষয় থেকে বিরত থাকা দরকার, তা থেকে যিনি বিরত থাকেন, তাকেই "حصور" বলা হয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ.) যেহেতু সর্বগুণে গুণান্বিত, তাই উপরে বর্ণিত সবকয়টি অর্থই একই সময়ে তাঁর মাঝে প্রমাণিত হয়। কেউ কেউ উপরে বর্ণিত অর্থ থেকে পৃথক অর্থ করেছেন। তাঁরা বলেন حصور অর্থ-পুরুষত্ব থেকে বঞ্চিত; কিন্তু অর্থটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা এটার পুরুষের জন্য অপমানকর এবং দোষ-ত্রুটিযুক্ত অর্থ। কাজেই বিশেষজ্ঞগণ এ কারণেই উক্ত অর্থকে তাঁদের তাফসীরে গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কাযী আয়ায (র.) 'শিফা' নামক গ্রন্থে এবং খাফাজী-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নাসীমুর রিয়াদ' এ বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং জমহুরের কাছে এ বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন।

তবে পুরুষত্ব থাকা সত্ত্বেও এর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিদের মাঝে সর্বদা দু'টি মত বা পথ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথমত, নির্জন ও বিরাণ জীবন অবলম্বন করে সাধনা ও আরাধনার মাধ্যমে প্রবৃত্তির চাহিদাকে চূর্ণবিচূর্ণ করত পুরুষত্বকে নিস্তেজ করা উচিত। যাতে কামনা শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। হযরত ঈসা (আ.)-এর পবিত্র জীবনে এ দিকটাই প্রতিভাত হয়েছে বেশী আর ইয়াহ্‌ইয়া (আ.)-এর মাঝে স্বভাব প্রকৃতিতে এ গুণটি আল্লাহ্ এমনভাবে প্রদান করেছিলেন যে, সাধনা-প্রচেষ্টা ছাড়াই তিনি পুরুষত্বের কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয়ত, পুরুষত্বের কামনাকে এতটুকু নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত যাতে সে এক মুহূর্তের জন্যও কুপথে পরিচালিত হতে না পারে, এমনকি কুপথে পরিচালিত হবার আশঙকাও যেন না থাকে, কিন্তু মানব বংশধারাকে গতিশীল রাখার জন্য সঠিক পথে দাম্পত্য জীবন অবলম্বন করা উচিত।

প্রথম পথটি যদিও কোন কোন পরিস্থিতিতে প্রশংসিত হয়, কিন্তু মানবিক স্বভাব এবং সামাজিক জীবনধারার জন্য এটা অনুপযোগী। অতএব যে সব নবী রাসূল এ পথ অবলম্বন করেছেন, সেটা ছিল সময়ের চাহিদা এবং বিশেষ ক্ষেত্রের গুরুত্বের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। বিশেষত তাঁদের দীনের দাওয়াত যখন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মাঝে সীমিত ছিল। কিন্তু সামাজিক জীবনের জন্য স্বভাব প্রকৃতির মূল চাহিদা কেবলমাত্র দ্বিতীয় পথেই পূরণ হতে পারে। আর এজন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এ পথের বলিষ্ঠ সমর্থক। আর তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বের গোটা মানব কল্যাণের জন্য। সুতরাং তাঁর আনীত জীবন বিধান হল স্বভাব সুলভ প্রাকৃতিক জীবন বিধান বা দীনে ফিতরত। কাজেই এর মাঝে স্বভাবের প্রাধান্য থাকাই উচিত ছিল। অতএব তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন শাখায় এ বাস্তবতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, পার্থিব জীবন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পাহাড়-পর্বত, গিরি-গুহা ও অরণ্যে জীবন কাটানোর তুলনায় আল্লাহর কাছে সেই জীবন অধিক প্রিয় ও মর্যাদা সম্পন্ন, যে পার্থিব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও নাফরমানী করে না এবং পদে পদে তাঁর হুকুম ও নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكٰوةً - وَكَانَ تَقِيًّا - وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا- وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا -

"আমি বললাম, হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর, আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞান দান করেছিলাম। এবং আমার নিকট থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা প্রদান করেছিলাম, আর যে ছিল মুত্তাকী, পিতামাতার অনুগত এবং সে ছিলনা অবাধ্য উদ্ধত। তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম লাভ করে ও শান্তি থাকবে যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মরিয়াম ঃ ১২-১৫)

সৌভাগ্যময় জন্মের সুসংবাদ প্রদানের পর ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর বাল্যকালে বৃত্তান্ত সম্পর্কে কুরআন শরীফ উপেক্ষা করেছে। কেননা বৃত্তান্ত তুলে ধরা কুরআনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ইয়াহ্ইয়া (আ.) কে তাঁর বিধান তাওরাতকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরতে অর্থাৎ তাওরাতের বিধান মুতাবিক আমল করতে এবং এর আলোকে

মানুষকে হিদায়েত করতে নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন না এবং তিনি তাওরাত বিষয়ক শরী'আতের অনুসারী ছিলেন। এর সাথে সাথেই আল্লাহ্ বলছেন যে, আমি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের জীবনের তুলনায়, ভিন্নভাবে শৈশবেই তাঁকে জ্ঞান ও মর্যাদা দান করেছিলাম, যাতে সে অবিলম্বে নবুওয়াতের পদমর্যাদার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে। জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে যে, শৈশবকালে অন্যান্য শিশুরা যখন তাঁকে খেলার জন্য পীড়াপিড়ি করত, তখন তিনি তাদের বলতেন, আল্লাহ্ আমাকে হাসি তামাশা ও খেলাধূলার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫)

আরো বর্ণিত আছে যে, তিরিশ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁকে নবুওয়াতী মর্যাদা প্রদান করা হয়। (নাজ্জার রচিত কাসাসুল কুরআন, পৃ. ৪২০)

আলোচ্য আয়াতের اٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا বাক্যের অর্থও অনুরূপ; আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র.) মু'আম্মার (র) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করেছেন। (ইব্ন আসীর, ২য় খণ্ড) আর যে ব্যক্তি এ আয়াতের অর্থে বলেছেন যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) কে শৈশবেই নবী বানানো হয়েছিল। এটা বিশুদ্ধ নয়, কেননা নবুওয়াতের মর্যাদার মত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত পদটি শৈশবকালে কাউকে প্রদান করা কারো কাছেই যুক্তি সংগত ও নয় এবং দলীল দ্বারা প্রমাণিতও নয়, উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত ইয়াহ্ইয়াকে শান্তি প্রদানের যে দু'আ করা হয়েছে, তা তিনটি সময়ের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। বস্তুত এ তিনটি মুহূর্তই মানুষের জন্য অত্যন্ত কংকটাকীর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। ১. জন্মকাল-যখন মানুষ তাঁর মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্থিব জগতে পদার্পণ করে। ২. মৃত্যুকাল-যখন সে পার্থিব জগত থেকে বিদায় নিয়ে আলমে বারযাখে (অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবকাশ কাল) পৌঁছে। ৩. হাশ্র নশ্রের সময়-যখন সে আলমে বারযাখ বা কবর থেকে আখিরাতে কৃতকর্মের পুরস্কার কিংবা শাস্তি গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়। সুতরাং এ তিনটি সময়ের জন্য আল্লাহ্ যাকে শান্তি প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন, সে নিঃসন্দেহে উভয় জাহানের সৌভাগ্যের ভাণ্ডার লাভ করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ فَطُوْبٰى لَهُ وَحُسْنُ مَاٰبٍ 'তার জন্য কতই না শুভসংবাদ ও কল্যাণময় প্রত্যাবর্তন।"(আল-কুরআন)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ - فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ - اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ -

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী; অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৯-৯০)

দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ

মুসনাদে আহ্মাদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হারিস আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়াকে পাঁচটি বিষয় বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল; এগুলো তুমি নিজেও পালন করবে এবং বনী ইসরাঈলকেও শিক্ষা দেবে। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। তখন হযরত ঈসা (আ.) তাঁকে বলেন, হে আমার ভাই! তুমি যদি উপযুক্ত মনে কর তাহলে আমি বনী ইসরাঈলকে পাঁচটি বিষয়ের দীক্ষা দিতে পারি। তুমি তো ব্যাপারটি যথেষ্ট দেরী করে ফেলেছ। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) তখন বলেন, ভাই! আমি যদি নিজে তা পালন না করে তোমাকে প্রচারের অনুমতি দেই, তবে আমার আশংকা হচ্ছে যে, এর জন্য আমার উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হতে পারে অথবা আমাকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হতে পারে। কাজেই আমিই অগ্রসর হতে যাচ্ছি। সুতরাং তিনি বনী ইসরাঈলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত হতে আহবান করেন। যখন তাদের উপস্থিতিতে মসজিদ পূর্ণ হয়ে যায় তখন তিনি তাদের ওয়ায নসীহত করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ আমাকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমি নিজে তা পালন করি এবং তোমাদের ও শিক্ষা প্রদান করি।

১. প্রথম নির্দেশ

তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না, কাউকে তাঁর শরীক ও অংশীদার মনে করবে না। কেননা মুশরিকের দৃষ্টান্ত সেই দাসের মত, যাকে তার মুনিব নিজের অর্থ দিয়ে কিনেছেন; কিন্তু দাসটি অকৃতজ্ঞতার পথ বেছে নিয়েছে। সে যা কিছু উপার্জন করে, তা তার মুনিব ব্যতীত অন্য লোকদের দিয়ে দেয়। এখন তোমরা বল, তোমাদের মধ্যে কেউ কি চাইবে যে, তার দাস এরূপ হোক ? সুতরাং বুঝতে চেষ্টা করো যে, আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের রিয্ক দিচ্ছেন। অতএব তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং কাউকে তাঁর শরীক ও অংশীদার মনে করবে না।

২. দ্বিতীয় নির্দেশ

তোমরা বিনয় ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করে। কেননা যতক্ষণ তোমরা নামাযের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগী না হবে ততক্ষণ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও রহমতের সাথে মনোযোগী থাকবেন।

৩. তৃতীয় নির্দেশ

তোমরা সিয়াম বা রোযা পালন করো; কেননা রোযাদারের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে একটি দলের মাঝখানে মৃগনাভীর থলে নিয়ে বসে আছে। সে নিজেও মৃগনাভীর সুগন্ধ পাচ্ছে এবং তার দলভূক্ত সাথীদেরও সুগন্ধে মাতোয়ারা করছে। তোমরা রোযাদারের মুখের গন্ধ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা আল্লাহ্র কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ (খালিপেটের কারণে যে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে) মৃগনাভীর সুগন্ধির চাইতেও পবিত্র।

৪. চতুর্থ নির্দেশ

তোমাদের ধন-সম্পদ থেকে দান-সাদাকা করো, কেননা দান-সাদাকাকারীর দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত যাকে তার শত্রুরা হঠাৎ পাকড়াও করে ঘাড়ের সাথে হাত-বেঁধে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। এহেন হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে সে বলছে, আমি যদি তোমাদের অনেক ধন-সম্পদ দেই, তাহলে কি মুক্তি পাব? অতঃপর সে হ্যাঁ সূচক উত্তর পেয়ে প্রাণের বিনিময়ে তার সমস্ত ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে ফেলেছে।

৫. পঞ্চম নির্দেশ

তোমাদের দিনে রাতে বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকর করতে থাক। কেননা যিক্রকারীর দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার শত্রুর হাত থেকে বাচাঁর জন্য দ্রুত দৌড়ে পলায়ন করছে আর শত্রুও তার পিছুপিছু দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে। অবশেষে সে পালিয়ে গিয়ে একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে। নিঃসন্দেহে শয়তান হল মানুষের শত্রু। আল্লাহ্র যিক্র হল আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় একটি দূর্গ। অতঃপর নবী করীম (সা) সাহাবাদের লক্ষ্য করে বলেন। আমিও তোমাদের এমন পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সেগুলো হলো হল ঃ ১. দলবদ্ধ জীবন যাপন, ২. শ্রবণ, ৩. আনুগত্য ৪. হিজরত ও ৫. আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ।

সুতরাং যে, ব্যক্তি জামা'আতী বা দলবদ্ধ জীবন থেকে এক অর্ধহাত পরিমাণ বাইরে চলে যাবে, সে নিঃসন্দেহে তাঁর কাঁধ থেকে ইসলামের রজ্জুকে বের করে

দেবে। অতএব জামা'আতী জীবনকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের প্রতি মানুষকে আহবান করবে, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা তৈরী করে নেবে। হারিস আশ'আরী (রা.) বলেন, এসময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে যদি নামায-রোযা নিয়মিত আদায় করে তাহলেও কি জাহান্নামের হক্দার হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে নামায- রোযা নিয়মিত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে মুসলমান, তাহলেও সে জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৫২)

জীবনী রচয়িতাগণ ইসরাঈলী কাহিনী থেকে সংকলন করেছেন যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) তাঁর জীবনের বড় একটি অংশ মরুভূমিতে কাটিয়েছেন। তিনি গভীর অরণ্যে নির্জনে বসে থাকতেন এবং গাছের পাতা, ফড়িং ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। সেখানেই তাঁর উপর আল্লাহ্র বাণী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি জর্দান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার শুরু করেন এবং ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিতে থাকেন।

লুক বাইবেলে এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ঃ "সে সময় যাকারিয়ার পুত্র ইউহান্নার (ইয়াহ্ইয়ার) প্রতি গভীর অরণ্যে আল্লাহ্র বাণী অবতীর্ণ হয়। তিনি জর্দান নদীর এ পাশ-ওপাশ গিয়ে গোনাহ মাফের জন্য তাওবা করার প্রতি আহবান জানাতে শুরু করেন। (লুক বাইবেল, অধ্যায় ঃ ১ শ্লোক ঃ ১)

ইব্ন আসাকির (র) ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে কয়েকটি রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন। সেগুলোর সারকথা এই যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) আল্লাহ্কে এতই ভয় করতেন যে, তিনি অধিকাংশ সময় কাঁদতেই থাকতেন। যে কারণে তাঁর গালে অশ্রুর দাগ পড়ে গিয়েছিল। একদা তাঁর পিতা যাকারিয়া (আ.) তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে যখন জঙ্গলে পেয়ে গেলেন, তখন তাঁকে বললেন, বৎস! আমি তোমার স্মরণে ব্যাকুল অবস্থায় খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখি তুমি বিলাপরত, ব্যাপার কি ? ইয়াহ্ইয়া (আ.) উত্তরে বললেন, হে পিতা! আপনি তো আমাকে বলেছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি তৃণশূন্য মাঠ আছে, আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রু বিসর্জন ছাড়া সে মাঠ অতিক্রম করা যাবে না এবং জান্নাত ও পৌঁছা যাবে না। একথা শুনে যাকারিয়া (আ.) ও কান্না শুরু করেন। (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩)

শাহাদতের ঘটনা

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) যখন আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার শুরু করেন এবং লোকদের কাছে ঘোষণা করেন যে, আমার চেয়ে উত্তম আল্লাহ্র একজন নবী আসবেন। তখন ইহূদীরা তাঁর সাথে দুশমনী শুরু করে দেয়। তিনি যে একজন মনোনীত

নবী এবং আল্লাহ্র কাছে গৃহীত আর তাঁর আহবান কোন কিছুকেই তারা সহ্য করতে পারেনি। একদা তারা সমবেত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মাসীহ্ ঈসা? তিনি বললেন না। তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি সেই নবী? তিনি উত্তরে বললেন, না। তারা আবারো বলল, তুমি কি ঈলিয়া নবী। তিনি বললেন, না। তখন তারা জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি কে, যে এভাবে আমাদের আহবান জানাচ্ছ এবং দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছ? ইয়াহ্ইয়া (আ.) বললেন, আমি তো অরণ্যে আহবানকারীর একটি শব্দ মাত্র যাকে সত্যের জন্য সমুন্নত করা হয়েছে। একথা শুনে ইয়াহূদীরা প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠে। অতঃপর তাঁকে শহীদ করে ফেলে। (বাইবেল ইউহান্না, অধ্যায় ১, শ্লোক : ১৯-২৮)

ইব্ন আসাকির (র) 'আল-মুস্তাক্সা ফী ফাযাইলিল আক্সা' গ্রন্থে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 'কাসিম' থেকে একটি দীর্ঘ বর্ণনা সংকলন করেছেন। তাতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে নিম্নরূপ বর্ণনা বিদ্যমান। দামেশ্কের বাদশাহ হাদ্দাদ ইব্ন হাদার তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল। অতঃপর সে স্ত্রীকে ফিরে আনার ইচ্ছা করছিল। সে ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর কাছে ফাত্ওয়া চাইল। তিনি বললেন, এই স্ত্রী আপনার জন্য হারাম হয়ে গেছে। একথা শুনে রাণী অত্যন্ত অসুন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং হযরত ইয়াহ্ইয়াকে হত্যা করার পেছনে উঠে পড়ে লাগে। অতঃপর বাদশাহকে বাধ্য করে তাঁকে হত্যার করার অনুমতি গ্রহণ করে। তিনি যখন হিবরুন মসজিদে নামাযরত ছিলেন তখন তাঁকে হত্যা করানো হয়। অতঃপর চীনামাটির তৈরী বাসনে করে তাঁর মাথা আনতে বলা হয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও তাঁর খণ্ডির মাথা বলতেছিল যে, তোমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের কাছে বিয়ে না দেয়া হবে ততক্ষণ তুমি বাদশাহ্র জন্য হালাল হবেনা। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযাব এসে উক্ত নারীকে তাঁর মাথাসহ মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হয়।

এ রিওয়ায়েতে এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আছে, যার কারণে সম্পূর্ণ রিওয়ায়েতটি অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। তার হল হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) রক্ত ঝর্ণার মত শরীর থেকে অবিরাম বের হতে থাকে। অবশেষে বখত নসর যখন দামেস্ক জয় করে তখন সত্তর হাজার ইসরাঈলীকে হত্যা করে তাদের রক্ত প্রবাহিত করার পর আরমিয়া (আ.) এসে রক্তকে লক্ষ্য করে বলেন, হে রক্ত! তুমি কি এখন শান্ত হবে? আল্লাহ্র কত সৃষ্ট ধ্বংস হয়ে গেছে, কাজেই তুই এখন শান্ত হয়ে যা। তখনই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। (আদি ও অন্ত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫)

হাফিয ইব্ন হাজার (র.) এ কাহিনীটি সংকলন করে বলেন, এ ঘটনাটির মূল বক্তব্য হাকিমের মুস্তাদরাক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

বর্ণনার এ অংশটুকু যদি ইতিহাসের প্রাথমিক স্তরের কোন ছাত্রও শুনে তাহলে সেবি না দ্বিধায় একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে সাব্যস্ত করবে। কেননা এটা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বখতে নসরের সময় কাল ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর কয়েক শতাব্দী পূর্বে। অথচ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর জীবন কাহিনীকে বখত নস্রের দামেশ্ক তথ্য জুড়ে দেয়া কতটুকু বিশুদ্ধ হতে পারে? অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে বলতে হয় যে, হাফিয ইব্ন আসাকির এবং হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাসীরের মত বিদগ্ধ সমালোচকগণ উক্ত বর্ণনা সংকলন করেছেন এবং নীরবতা পালন করেছেন। অধিকন্তু এ রিওয়ায়েতে যে ধরনের রহস্যপূর্ণ অদ্ভুদ বস্তু নিয়ে স্থান পেয়েছে, তা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হবে। আর হাকিমের বর্ণনাটি সনদ ও বোধগম্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপেক্ষণীয়।

বধ্যভূমি বা নিহত হওয়ার স্থান

জীবনী লেখক ও ঐতিহাসিকদের মাঝে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর শাহাদতের বধ্যভূমি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একটি বক্তব্য হল যে, তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের ইবাদতখানা ও কুরবানীস্থলের মাঝখানে হত্যা করা হয়, যেখানে সত্তর হাজার নবীকে শহীদ করা হয়েছে। সুফিয়ান সাত্তরী (র) শামার ইব্ন আতিয়া থেকে একই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। (তারীখ ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫)

আবূ উবায়দা কাসিম ইব্ন সালাম হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে দামেশ্কে হত্যা করা হয়। আর তিনি এর সাথে বখত নসরের ঘটনাটিও উল্লেখ করেছেন। ইব্ন কাসীর (র.) বলেন, আতা ও হাসান (র) এর কথা যদি সমর্থন করা যায় যে, বখত নস্র হযরত ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন, তাহলে উক্ত ঘটনা ও বিশুদ্ধ হতে পারে। (তারীখ ইব্ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫)

আমরা প্রমাণ করেছি যে, নির্ভরযোগ্য ও সঠিক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণে উক্ত ঘটনাটিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে। কেননা বখত নসর (র) হযরত ঈসা (আ.)-এর কয়েক শতাব্দী পূর্বেই অতীত হয়ে গেছে। এমনকি স্বয়ং ইব্ন কাসীর বায়তুল মাকদেসের ধ্বংসলীলা ও উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উক্ত তথ্য মেনে নেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। উপরন্ত এ ভুল বক্তব্যটি মেনে নেয়ার পর এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মাঝখানের দীর্ঘ সময়কালটি নবী বিহীন (ফাতরা) যুগ নয়। বরং হযরত আরমিয়া, হযরত হাযকীল, হযরত উযায়ের, হযরত দানিয়াল (আ.) প্রমুখ বনী ইসরাঈলী নবী (যদি তা মেনে নেয়া হয়) বখত নসর এবং তার পরবর্তী রাজত্বকাল পর্যন্ত ব্যাবিলনে

বন্দী ছিলেন এবং তাঁদের সবাই হযরত ঈসা (আ.)-এর পর আবির্ভূত হন। অথচ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ ও ইসলামী রেওয়ায়েতের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে সবগুলো বক্তব্যই সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভুল।

তবে একটি কথা যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর বধ্যভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসে নয় বরং দামেশ্‌কে ছিল। হাফিয ইব্‌ন আসাকির এর বর্ণনাটি এ বক্তব্যের সমর্থক। তিনি তা ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিমের সূত্রে উদ্ধৃত করেন যে, হযরত যায়িদ ইব্‌ন ওয়াকিদ বলেন, দামেশ্‌কে বিখ্যাত স্তম্ভ সেকাসিকার নিচে একটি মসজিদ যখন পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছিল, তখন আমি নিজের চোখ দিয়ে দেখেছি, পূর্ব পার্শ্বের মিহরাবের কাছে একটি স্তম্ভ খননকালে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর মস্তক বেরিয়ে আসে এবং মুখমণ্ডল ও চুলে কোন পরিবর্তনই আসেনি। আর তা ছিল রক্তাক্ত এবং মনে হচ্ছিল যেন এখনই কর্তন করা হয়েছে। (তারীখ ইব্‌ন কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫)

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা যে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এর মাথা ছিল, অন্য কোন মু'মিন সৎলোকের ছিলনা তা কিভাবে জানা গেল? মূলত এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তমূলক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত নেই যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) কোন স্থানে শহীদ হন। তবে এটা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, ইয়াহূদীরা তাঁকে শহীদ করে দেয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) যখন তাঁর শাহাদতের তথ্য অবগত হন, তখন প্রকাশ্যে তিনি দাওয়াতে হকের কাজ করেন। কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় ইয়াহূদীদের বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ও অন্যায়-অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং তারা তাদের নবী-রাসূলদের ও হত্যা না করে ছাড়েনি। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ –

"যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখান করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, তুমি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২১)

ইব্‌ন আবূ হাতিম হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেন, বনী ইসরাঈলরা একদিনে ৪৩ জন নবী আর ১৭০ জন সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তাদের অপরাধ ছিল যে, তারা أمر بالمعروف অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করতেন। (তাফ্‌সীর ইব্‌ন কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫)

মি'রাজ রজনী ও ইয়াহ্ইয়া (আ.)

বুখারী শরীফে হযরত ইয়াহ্ইহা (আ) সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে শুধু নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে রজনীতে নবী করীম (সা) দ্বিতীয় আসমানে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছেন। মহানবী (সা) বলেন ঃ

فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا يَحْيٰ وَعِيْسٰى وَهُمَا ابْنَا خَالَةِ قَالَ هٰذَا يَحْيٰ وَعِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ -

"অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলাম, সেখানে গিয়ে হযরত ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ.) কে উপস্থিত পেলাম। তাঁরা দু'জন খালাতো ভাই। জিব্রাইল (আ) আমাকে বললেন; এরা দু'জন ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা, এঁদের সালাম প্রদান করুন। আমি তাঁদের সালাম দিলাম। তাঁরা উভয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, আমাদের নেকপরায়ণ ভাই, সৎকর্মশীল নবী, তোমাকে স্বাগতম, খোশ-আমদেদ।" (কিতাবুল আম্বিয়া, বুখারী শরীফ)

যাকারিয়া (আ.)-এর জীবন কাহিনীতে প্রমাণিত হয়েছে যে। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর মা ও ঈসা (আ.)-এর মা মারয়ামের (আ.) মা হান্না ছিলেন দুই সহোদরা বোন। আর মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা দু'জন খালাতো ভাই। এটা প্রচলিত রূপক পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বর্ণনায় এ ধরনের রূপক শব্দ ব্যবহার করা বহুল প্রচলিত। কেননা মায়ের খালাকে সন্তানরাও খালা বলে ডেকে থাকে।

ইয়াহইয়া (আ.) ও আহলে কিতাব

ইতিপূর্বে আমরা ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে লুক বাইবেল থেকে কিছু বরাত উদ্ধৃত করেছি। মূলকথা হল এই যে, ইয়াহূদীরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) কে অস্বীকার করে। কিন্তু খৃস্টানরা তাঁকে হযরত ঈসা (আ.)-এর একজন আহবায়ক হিসেবে সমর্থন করে। আর তাঁর পিতা যাকারিয়া (আ.) কে শুধু 'কাহিন' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আহলে কিতাবদের কাছে 'ইয়াহ্ইয়া' নামটি 'ইউহান্না' হিসেবে পরিচিত হতে পারে যে, হিবরু ভাষায় ইয়াহ্ইয়া শব্দের যে অর্থ 'ইউহান্না' শব্দেরও সেই অর্থ। অথবা এমনও হতে পারে, হিব্রু ভাষার 'ইউহান্না' শব্দটি আরবীতে ইয়াহ্ইয়া 'হিসেবে' উচ্চারিত হচ্ছে। লুক বাইবেলে কুরআন শরীফের বর্ণনার মতই স্পষ্টভাবে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, ইতিপূর্বে

তাঁদের বংশে কারো এ নাম রাখা হয়নি। কাজেই যখন বংশের লোকেরা এ নামের কথা শুনে তখন আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায়। জন্মের অষ্টম দিনে সবাই ছেলের খৎনা করার জন্য উপস্থিত হয়। এবং ছেলেটির পিতার নামানুসারে তাঁর নাম রাখতে চায় যাকারিয়া। তখন তার মা বলে যে, না বরং এর নাম রাখতে হবে ইউহান্না। তাঁরা তাকে বলে, এ বংশে তো কারো এ নাম নেই। অতঃপর তারা তাঁর পিতাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এর কি নাম রাখতে চান? তিনি একটি কাঠের ফালি আনতে ইঙ্গিত করেন। অতঃপর তাতে 'ইউহান্না' নামটি লিপিবদ্ধ করেন। উপস্থিত সবাই আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায়। ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর মুখ ও জিহ্বা খুলে যায় এবং তিনি কথা বলতে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে শুরু করেন। (লুক বাইবেল, অধ্যায়, ১, শ্লোক ঃ ৫৯-৬৫)

তাঁর সাধারণ বসবাস ও জীবন যাপন সম্পর্কে মথির বাইবেলে আছে, "ইউহান্না উটের লোম দ্বারা তৈরি পোশাক পরতেন এবং চামড়ার কোমর বন্ধনী সর্বদা কোমরে বেঁধে রাখতেন। তিনি ফড়িং ও বনের মধু খেয়ে জীবনধারণ করতেন"। (অধ্যায় ঃ ৩, শ্লোক ৪-৫)

ইউহান্না সম্পর্কিত বাইবেলে তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে লিখেছে, "ইউহান্নার সাক্ষ্য এই যে, ইয়াহূদীরা জেরুজালেম থেকে কাহিন ও লাদীকে তাঁর কাছে একথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠায় যে, তুমি কে? তখন তিনি স্বীকার করেন আমি মাসীহ্ ঈসা নই। জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তুমি কে? তুমি কি ঈলিয়া নবী? তিনি বলেন, না আমি তা নই। আবারো জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কি সেই প্রতিশ্রুত নবী মোহাম্মদ? তিনি উত্তরে বলেন, না, আমি সে নবীও নই। অতঃপর তারা প্রশ্ন করে যে, তাহলে বল তুমি কে, তোমার ব্যাপার তুমি কি বলতে চাও? আমরা যাতে তাদের কাছে একথা বলতে পারি, যারা আমাদের পাঠিয়েছে। তিনি বললেন, ইয়াহ্ইয়া নবী যেরূপ বলেছেন আমি ও সেরূপ অরণ্যে আহবানকারীর একটি শব্দ মাত্র। যাতে তোমরা সদাপ্রভূর সোজা রাস্তা অবলম্বন করতে পার।" (অধ্যায় ১, শ্লোক ১৯-২৩)

লুক বাইবেলেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে ঃ

"এ সময় যাকারিয়ার পুত্র ইউহান্নার উপর সে অরণ্যে আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর জর্দার নদীর আশে-পাশে গিয়ে গোনাহ মাফের জন্য তাওবা করার জন্য আহবান করতে শুরু করেন। ঠিক অনুরূপ ইয়াহ্ইয়া নবীর বক্তব্য পুস্তকে লিখা আছে, গভীর অরণ্যে আহবানকারীর ঐ শব্দ আসে যে, সাদপ্রভূর রাস্তা তৈরি কর এবং তার রাস্তা সোজা কর"। (লুক অধ্যায় ৩, আয়াত, ২-৫)

উক্ত বাইবেলে তাঁর বন্দীদশা সম্পর্কে বর্ণিত আছে ঃ

"অতঃপর তিনি (ইউহান্না) অনেক উপদেশপূর্ণ কথা বলে মানুষদের সুসংবাদ শুনাতে থাকেন। কিন্তু এক চতুর্থাংশ রাজত্বের গভর্নর হিরোদেস তাঁর ভাই ফিলিপসের স্ত্রী হিরোদায়াসের কারণে এবং হিরোদিয়াসের যাবতীয় অপকর্মের কারণে ইউহান্নার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। অত:পর তাঁকে বন্দী করে জেলে নিক্ষেপ করে"। (লুক, অধ্যায়: ৩, আয়াত: ১৮-১৯)

আরেকটু অগ্রসর হয়ে উক্ত বাইবেলে তাঁর শাহাদত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, "অতঃপর চতুর্থাংশে রাজত্বের গভর্নর হিরোদেশ সব বৃত্তান্ত শুনে ভয় পেয়ে যায়, কেননা কেউ কেউ বলতেছিল, ইউহান্না মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে এসেছে আর কতক বলছিল যে, ইলিয়া নবী আবির্ভূত হয়েছেন। আবার কেউ বলছিল, প্রাচীন নবীদের মধ্য থেকে কোন একজন জীবিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু হিরোদাস বলল, আমি তো ইউহান্নার মস্তক কর্তন করিয়ে দিয়েছি। এখন এ আবার কোন মাসীহ্, যার সম্পর্কে এসব কথা শুনতে পাচ্ছি?" (প্রাগুক্ত, অধ্যায় ৯, আয়াত : ৭-৯)

শিক্ষণীয় বিষয়

হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর ঘটনাবহুল জীবনী থেকে সূক্ষ্মদর্শী ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মনীষীগণ যদিও নিজেরাই ফলাফল ও শিক্ষণীয় বিষয় অর্জন করতে সক্ষম হন। তা সত্ত্বেও নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. দুনিয়াতে সে ব্যক্তির চাইতে হতভাগা আর কেউ হতে পারে না যে এমন পবিত্র মনীষীকে হত্যা করেছে, যিনি কোন দিন না তাঁকে অত্যাচার করেছেন আর না তাঁর ধন-সম্পদ হস্তগত করেছেন। বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত, কোন পারিশ্রমিক বিনিময় ছাড়াই তাঁর জীবন সংশোধনের জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং তাঁর চরিত্র, কর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এমন মহান শিক্ষা প্রদান করেছেন, যা তার দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানের সফলতা ও সৌভাগ্যের যিম্মাদার। এখানে উল্লেখ্য, একদা হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) নবী করীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন কোন ধরনের লোক সবচে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে? উপরোক্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

قَالَ : رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا اَوْ مَنْ أمَرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ–

"তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবীকে হত্যা করেছে অথবা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে যিনি সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। (সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।) (তাফসীর ইব্‌ন কাসীর, আবু হাতেম থেকে বর্ণিত হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫)

বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে এ দৃষ্টিতে ইয়াহূদীরাই সবচেয়ে হতভাগ্য জাতি। কেননা তারা ছিল এ কর্মে সিদ্ধহস্ত। তারা তাদের নবী-রাসূলদের সাথে চরম অপমানজনক আচরণ করেছে। এমনকি তাঁদের হত্যা করে নবীদের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন জাতির মাঝে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

২. বনী ইসরাঈল যেহেতু বিভিন্ন গোত্রে-উপগোত্রে বিভক্ত ছিল, যে কারণে তারা ছোট ছোট রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে বসবাস করত, কাজেই তাদের হিদায়েতের জন্য একই সময়ে একাধিক নবী-পয়গম্বর প্রেরিত হতেন। কিন্তু সবার জন্য শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের একমাত্র মানদণ্ড ও মৌলিক গ্রন্থ ছিল তাওরাত। হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নবীদের মর্যাদা এ উম্মাতের নবী করীম (সা.) ও তাঁর সঠিক উত্তরাধিকারী হক্কানী আলিমদের মর্যাদার অনুরূপ ছিল। যদিও হাদীসটি

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ

"আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলী নবীদের মতই"। শাব্দিক দিকে থেকে উপেক্ষণীয়, কিন্তু ভাবার্থ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য। কেননা নবী করীম (স.) হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর কাছে এসে নবুওয়াতের ধারা চরম শিখরে উন্নত হয় এবং পদমর্যাদার ধারা সমাপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত উম্মাতকে সংশোধন ও হিদায়েত দায়িত্ব পালন করবেন একমাত্র বিজ্ঞ আলিম সমাজ। সুতরাং নবুওয়াতের নির্ধারিত পদমর্যাদা ছাড়া সত্যপন্থী আলিমদের মর্যাদা হযরত মূসা (আ.)-এর আদর্শ প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত বনী ইসরাঈলী নবীদের অনুরূপ।

আমরা অবশ্য এখানে 'আলিম' শব্দের সাথে 'হক' শর্তটি আরোপিত করেছি। কারণ নবী করীম (সা.) উলামায়ে সূ' বা অসৎ আলিমদের নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। একথা সুস্পষ্ট যে, অসৎ আলিমদের আনুগত্য উম্মাতের পথভ্রষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর চাইতে ও বেশী লক্ষণীয় যে, দ্বীন ধ্বংসের সামগ্রীগুলো এমনভাবে প্রস্তুত হয় এবং অসৎ আলিমদের আড়াল করে সত্যপন্থী আলিমদের বিরুদ্ধে উম্মাতের মাঝে কুধারণার প্রসার ঘটায়, যার ফলে তাদের

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত মযবূত দ্বীনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চায়। তখন তারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে ফায়সালার মাপকাঠি বানানোর পরিবর্তে নিজেদের অভিমত, যুক্তি ও প্রবৃত্তির আনুগত্য কিংবা বিরোধিতাকে মাপকাঠি বানিয়ে নেয়।

অধিকন্তু নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক লোকের বিরোধিতার প্রেরণায় সাধারণভাবে দ্বীনী আলিমদের নিন্দা ও তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা এবং তাঁদের অপমান লাঞ্ছনা করা মূলত দ্বীনী হকের সুমহান আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করারই নামান্তর। আর বিগত পৃষ্ঠাসমূহে ইয়াহূদীদের শাস্তি লাঞ্ছনা সম্পর্কে যেসব আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, উক্ত বিরুদ্ধবাদীরাও সে শাস্তির অন্তর্ভূক্ত হবে।

৩. আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত থেকে নিরাশ হওয়া মানুষের উচিত নয়। যদিও কোন কোন পরিস্থিতিতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দু'আ করা সত্ত্বেও আরব্ধ বস্তুটি লাভ করা যায়না। তখন এর মানে কখনোই এমন হতে পারে না যে, আল্লাহর মেহেরবানীর দৃষ্টি দু'আকারীর উপর থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। বরং মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র সাধারণ কল্যাণময় ও পরিপূর্ণ মঙ্গলের দৃষ্টিতে কখনো কখনো মানুষের আরব্ধ বিষয়টি তার জন্য উপকারী না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। দু'আকারী লোকটি কিন্তু তা জানে না; কারণ তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আবার কখনো এমনও হয় যে, আরব্ধ বিষয়টি ব্যক্তিগত কল্যাণের উর্ধ্বে সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলের খাতিরে বিলম্বে হস্তগত হয় অথবা বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তার কুরবানী স্বীকার করতে হয়।

যাহোক, হতাশা ও নিরাশা শব্দ দু'টি আল্লাহ্‌র দরবারে অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অপসন্দনীয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَ تَيْـئَسُوْا مِنْ رَوْحِ اللهِ اِنَّهُ لاَ يَيْـئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَفِرُوْنَ

"তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কেবলমাত্র কাফির-নাস্তিক সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে"। (সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭)

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০২-২০০৩/অঃ সঃ/ ৪৩৫৪-৩২৫০